নব পর্যায়
৩য় খণ্ড

প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৫

ইতিহাস

সম্পাদক :
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

ইতিহাস

নব পর্যায় তৃতীয় বর্ষ ঃ বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৫

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্ণসুবর্ণ সুধীররঞ্জন দাস	২১১, ২৫৪
খৃষ্টপূর্ব ৩২০ সাল আন্দাজ চাউলের দর কত ছিল যতীন্দ্রমোহন দত্ত	২৫২
নিষিদ্ধ বই বেলা দত্তগুপ্ত	১৬৭
পয়সা দীনেশ চন্দ্র সরকার	৭০
পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪০
পুস্তক পরিচয়	২৮১
ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অবলেশ ত্রিপাঠী	১১
ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর চোখে ভারত অনুবাদক : অনিরুদ্ধ রায়	২৬৯
বিশপ্ স্টাব্স্ সুবোধ কুমার মজুমদার	১০৫
বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের অবদান অমলেন্দু দে	২৩১

ভারত-সন্ধানী উইলিয়ম এডাম ১২৩
চিত্তব্রত পালিত
লালা লাজপত রায়ের আত্মকথা ১৪১, ১৯০
অনুবাদক : কিরণ মৈত্র
সিবাস্টিয়ান মানরিকের চোখে বাংলাদেশ ১৭৪
সাত্যকি দত্ত
*স্মৃতিকথা ১, ৮১, ১৫১, ২২১
রমেশ চন্দ্র মজুমদার
সংবাদ ও মতামত ৭৩, ২৭৭
হিন্দু কলেজ : নব্যবঙ্গ : ঈশ্বর গুপ্ত ৫৫, ৮৭
ভবতোষ দত্ত

নব পর্যায় তৃতীয় খণ্ড ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

অমলেন্দু দে

শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিনবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ৩ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	১
ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অমলেশ ত্রিপাঠী	১১
পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪০
হিন্দু কলেজ : নবাবঙ্গ : ঈশ্বর গুপ্ত ভবতোষ দত্ত	৫৫
পয়সা দীনেশ চন্দ্র সরকার	৭০
সংবাদ ও মতামত	৭৩

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড | বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫ | ১ম সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯২১ সালের পয়লা জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। তার ১৩ মাস পূর্বেই ফিলিপ হার্টগকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, কারণ অধ্যাপক নিয়োগ, নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন এবং অন্যান্য অনেক ব্যবস্থা আগে থাকতে না করলে পয়লা জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্ভব হত না। হার্টগ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাডেমিক রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁকে মাসিক চার হাজার টাকা বেতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে নিয়োগ করা হল। পাঁচ বৎসর কার্য শেষে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয়। স্যার ফিলিপ হার্টগ অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমাবধিই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চিন্তা ও পরিশ্রম করতেন। তিনি যে সব নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তীকালে তারই ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক রকম উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। সাধারণতঃ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব দোষ ত্রুটি দেখা যায় তার অনেকগুলি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেনি তার জন্য হার্টগের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। এদেশে এসে প্রথমেই তিনি প্রফেসর বা অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। মোটামুটি প্রধান প্রধান কয়েকজন অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি মে মাসে তাঁদের ঢাকায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন-কানুন

তৈরী করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি কাঠামোটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট এবং তার সঙ্গে যে প্রথম স্ট্যাটিউট বিধিবদ্ধ হয় তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু ঐ এ্যাক্ট ও স্ট্যাটিউটেই নির্দ্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ের জন্য অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশন তৈরী করার ব্যবস্থা ছিল। হার্টগ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকদের নিয়ে এই সব তৈরী করার জন্যই মে মাসে ঢাকায় আমাদের আমন্ত্রণ করেন। পাঠ্যসূচী নির্ণয়, লেকচারার নিয়োগ, পরীক্ষার নিয়ম প্রণালী, বিদায় ও অবসর গ্রহণের নিয়ম, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি অনেক বিষয় এই কমিটিতে আলোচিত হয় এবং প্রথমে সেই অনুসারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। তারপর বহুবার নির্ধারিত প্রণালী অনুসারে এই অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

এই মিটিং শেষ করে আমি আবার কলকাতায় ফিরে আসি। তারপর জুন মাসের শেষে আবার ঢাকা যাত্রা করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই একসঙ্গে নতুন কর্মস্থলে যাত্রা করেন। আমাদের দলে সত্যেন বসু, নলিনী বসু, মহম্মদ শহীদুল্লা, হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন। আমাদের যাওয়ার কিছুদিন পরে জ্ঞান ঘোষ বিলেত থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পূর্বে ঢাকা শহরে ঢাকা কলেজ নামে একটি সরকারী কলেজ ছিল; সেখানে এম. এ. পর্যন্ত পড়ান হ'ত। আর একটি বেসরকারী কলেজ ছিল—জগন্নাথ কলেজ। সেখানে বি এ. পর্যন্ত পড়ান হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই দুই কলেজে মাত্র ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস রইল; বি. এ., এম. এ., ক্লাস উঠে গেল। কারণ একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দুই ক্লাসের শিক্ষা ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে ঐ দুই কলেজের শিক্ষকদের ব্যবস্থা করা নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দেয়। সরকারী কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হয়। তাদের বেতন ও চাকরীর অন্যান্য সুবিধা পূর্বের মতোই অব্যাহত থাকে। জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন শিক্ষককেও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের

মধ্যে দুইটি পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। একদল সরকারী চাকরে ; এঁদের মধ্যে দু'জন আই. ই. এস এবং বাকী কয়েকজন প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক। এঁরা ছাড়া আর সকল শিক্ষকই হলেন সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাঁদের বেতন, অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে হত। পুরনো ঢাকা কলেজের শিক্ষকরা নবাগতদের ভাল চোখে দেখতেন না ; বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় তাঁদের পদমর্য্যাদা অনেকটা কমে গেছে এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে এই দুই দলের মধ্যে কোনদিনই একেবারে সম্পূর্ণ মিলন হয়নি। তবে সরকারী শিক্ষকদের সংখ্যা ক্রমেই কমতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষকদের দল সংখ্যায় এত বেশী হয়ে পড়ে যে এই দুটি পৃথক শ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল সেটি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়।

ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে রমনার মাঠ নামে একটি বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গ বিভাগ এবং ঢাকা শহর পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী হওয়ায় এই রমনার মাঠে নতুন শহর পত্তন করে বড় বড় সরকারী দপ্তর এবং কর্মচারীদের বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর অনেক বাড়ী তৈরী হয়। প্রত্যেক বাড়ীতেই বড় বড় কম্পাউণ্ড. বাড়ীগুলিও ফাঁকা ফাঁকা ; প্রশস্ত এবং সুপরিকল্পিত রাস্তা। বঙ্গ বিভাগ রহিতের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহর আর রাজধানী রইল না। পরে নতুন তৈরী সেক্রেটারিয়েট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও আর্টস বিভাগ স্থাপিত হয় এবং সরকারী কর্মচারীদের বাসভবনের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বসবাসের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিলেন। অবশ্য জজ, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী রমনার পাঁচ সাতটি বাড়ী দখল করে রইলেন। তাঁদের ইচ্ছে ছিল বাকী বাড়ীগুলিতেও ইংরেজ অধ্যাপকরা থাকবেন। কিন্তু যে কয়েকজন ইংরেজ অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন, তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করার পরেও অনেক বাড়ী ফাঁকা পড়ে ছিল। কলকাতা থেকে গিয়ে আমরা সেগুলি থাকার জন্য দাবী করলাম এবং অনেক গোলমালের পর আমাদের মধ্যে কয়েকজনকে এ বাড়ী দেওয়া হয়। পূর্বেই বলেছি এই বাড়ীগুলি অতি চমৎকার ; রমনার অন্যান্য ব্যবস্থাও খুব ভাল।

সুতরাং কলকাতা থেকে ঢাকায় গিয়ে এরকম বাড়ীতে থাকায় যে খুবই আরাম এবং আনন্দ লাভ করেছি, বলা বাহুল্য। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কিছুদিন পরে গভর্নরের তিনজন এ্যাক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারের জন্য তিনটি বড় বাড়ী তৈরী হয়। সদস্যদের নামানুসারে এই বাড়ী তিনটির নাম ছিল বর্ধমান হাউস (বর্ধমানের মহারাজার থাকার জন্য); সামসুল হুদা হাউস এবং হুইলার হাউস। বর্ধমান হাউসের দোতলাটি আমাকে দেওয়া হয়। এর মধ্যে সাতটি ঘর—একটি তো প্রকাণ্ড হল ; বাকী ঘরগুলিও বেশ বড় বড়। বাড়ীতে বাগান, তরকারী লাগানর ব্যবস্থা ছিল। এ ধরনের বাড়ীতে থাকার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম।

প্রথমেই এক দুর্দৈব ঘটল। ১৯১৯ সনের নতুন আইন অনুসারে বাংলা দেশের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয় একজন এদেশীয় মন্ত্রীর উপর। প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হলেন প্রভাসচন্দ্র মিত্র। তিনি মন্ত্রী হয়েই আদেশ দিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যে বেতনে নিযুক্ত করা হয়েছে বাংলা সরকার তা বহন করতে অক্ষম। সুতরাং এ বেতন কমিয়ে দেওয়া হোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হওয়ার পর থেকে ভারত সরকার প্রতি বছর এর জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রাখতেন। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় দেখা গেল যে এর রিজার্ভ ফাণ্ডে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা জমেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেই টাকার দাবী করা হয়। বাংলা সরকার বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে যে-সব বাড়ী দেওয়া হয়েছে, সে ঐ পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার বিনিময়ে। হার্টগ সাহেব ভারত সরকারকে এ বিষয়ে জানালেন। কারণ ভারত সরকারের অনুমতি নিয়েই শিক্ষকদের বেতনের হার স্থির করা হয়েছিল। ভারত সরকার জানালেন যে, এ বিষয়ে তাঁরা নিরুপায়। নূতন শাসনবিধি অনুসারে বাংলা সরকারকে তাঁরা কোন রকম আদেশ দিতে পারেন না। এর পর বাংলা সরকার বললেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এবং তার মধ্যেই সব খরচ চালাতে হবে। এর ফলে শিক্ষকদের বেতনের হার কমিয়ে দিতে হল। অধ্যাপকদের (Professor) বেতন ছিল ১০০০৲—১৮০০৲। সেটি কমিয়ে করা হল ১০০০৲। এ ভাবে সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন অনেক কমে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাতে ইতিহাস বিভাগের জন্য দুজন অধ্যাপকের কথা ছিল—একজন ইউরোপের ইতিহাসের, অন্যজন ভারতীয় ইতিহাসের। আমি ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলাম। স্থির ছিল ইউরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপকই ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ হবেন। এই পদে একজন ইংরেজ নিযুক্ত হবেন এমন ধারণা ছিল। এ কারণে বিভাগীয় অধ্যক্ষের জন্য দু'শ পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত ভাতা নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপকের মাইনে কমে ১০০০৲ স্থির হওয়ায় ইংরেজ অধ্যাপক আসার আর কোন সম্ভাবনা রইল না। সুতরাং আমিই একমাত্র অধ্যাপক হওয়ায় ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ হলাম। তখন আমি অধ্যক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট অতিরিক্ত ভাতা দাবী করি। কিছুদিন গোলযোগের পর তা আমাকে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরে প্রত্যেক ফ্যাকাল্টির জন্য একজন 'ডীন' (Dean) নির্বাচনের কথা ওঠে। আর্টস বিভাগে দর্শন শাস্ত্রের একজন ইংরেজ অধ্যাপক এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— এঁদের দুজনের মধ্যে একজন ডীন হবেন এমন কথা উঠল। নবনিযুক্ত অধ্যাপকদের অনেকেরই বয়স খুব কম। ইংরেজ অধ্যাপককে এই পদে বসাতে তাঁরা রাজী নন। শাস্ত্রী মশায় অতি বৃদ্ধ। তিনি ইংরেজ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে পারবেন না, এই ভেবে এই তরুণ অধ্যাপকেরা আমাকে এই পদে মনোনীত করলেন। তিন জনেই প্রার্থী ; কাজেই শেষ পর্যন্ত ভোট নিতে হল। ভোটে জয়লাভ করে আমিই ডীন নির্বাচিত হলাম তখন আমার বয়স মাত্র তেত্রিশ। নির্বাচনের পর শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে দেখা করে বললাম তিনি যেন এই নির্বাচনকে তাঁর প্রতি আমার কোনরূপ অশ্রদ্ধা বলে না মনে করেন। আরও অনেকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু তিনি আমার উপর খুবই বিরূপ হয়েছিলেন। ইংরেজ অধ্যাপক ল্যাঙ্গলিও মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই নির্বাচনের অল্প দিন পরে আমি কলকাতায় আসি। সে-সময় কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জ্ঞান ঘোষ মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাকে দেখেই তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, "করেছ কি! তোমার

ডীন নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এদিকে তো হুলস্থুল।" আমি বললাম, "ব্যাপার কি? তার সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কি?" তিনি বললেন, "সিণ্ডিকেটের সভা কেবল আরম্ভ হয়েছে এমন সময় একজন এসে খবর দিল যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে হারিয়ে তুমি ডীন নির্বাচিত হয়েছ। শুনেই কর্তা (অর্থাৎ স্যার আশুতোষ) তো একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। খুব খুশী। সবাইকে বললেন শাস্ত্রী আমার সঙ্গে লাগতে আসে; আমার এক শিষ্যের কাছেই সে নিজে হেরে গেল। এ নিয়ে আরও অনেক কথা তিনি বলতে থাকেন। সেদিন সিণ্ডিকেটের সভা আর ভাল করে হলই না।"

স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে এই নির্বাচনে আমার জয়লাভের জন্য তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করে আমায় উপদেশ দিলেন যে, কখনও ভয় করবে না, যা উচিত মনে করবে তাই করবে। সব শেষে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ওখানে কোন গোলমাল হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা চিরদিনই আমার জন্য খোলা থাকবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন সেনেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল তেমনি কোর্ট; আর সিণ্ডিকেটের বদলে ছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। তবে সেনেটের চেয়ে কোর্টের ক্ষমতা ছিল অনেকটা কম এবং সেনেটের মতো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অতটা কোর্টের অধীন ছিল না। বছরে দু'বার কোর্টের অধিবেশন হত; সভ্যদের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন মুসলমান এবং অর্ধেক হিন্দু। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও কোর্টের সভ্য ছিলেন। বার লাইব্রেরীর অনেক উকিল রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এর সভ্য হয়েছিলেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যে হিন্দুরা ভাল চোখে দেখেননি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল বঙ্গ বিভাগ রহিত করায় মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে অনেকটা তা পূরণ করার জন্যই এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে হিন্দু শিক্ষকেরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন তথাপি কোর্টের হিন্দু সভ্যরা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রীতির চোখে দেখেননি। বাইরে এই বিষয়ে যে আলোচনা হত কোর্টের সভায় হিন্দু সভ্যদের বক্তৃতায় তা প্রতিধ্বনিত হত। রমনার যেসব বড় বড় বাড়ী দখল করে আমরা শিক্ষকেরা বাস করছিলাম এটাতেই

তাদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। একবার তাঁদের একজনকে বলেছিলাম যে আমরা না এলে এ বাড়ী তো আপনাদের দিত না। সুতরাং হিংসা করেন কেন? কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। কোর্টের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক প্রস্তাব ও বক্তৃতা হত। হার্টগ সাহেব সভাপতি থাকতেন। আমাদের কয়েক জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ সমর্থন করার জন্য বাক্‌যুদ্ধে নামতে হত। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই এ বিষয়ে তেমন দক্ষতা ছিল না। প্রধানতঃ তিন বিভাগের 'ডীনকে'ই—বিজ্ঞানের জেফিন্স সাহেব, আইনের ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আর্টসের আমি—কোর্টের অন্য সদস্যদের বক্তৃতার জবাব দিতে হত। অবশ্য ভোটের সময় জয়লাভের ব্যাপারে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কারণ মুসলমান সভ্যেরা আমাদের পক্ষেই থাকতেন। মুসলমান এবং শিক্ষক সদস্যরা একত্রে সংখ্যায় হিন্দু সভ্যদের চেয়ে অনেক বেশী ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে হয়তো একটি বিরোধ দেখা দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের হাতে। এর সভ্য ছিলেন উপাচার্য (সভাপতি), কোষাধ্যক্ষ, ডিভিশনাল কমিশনার, তিন জন ডীন, তিন জন প্রোভোস্ট এবং মনোনীত আরও ৮।১০ জন। কিন্তু এমন নিয়ম ছিল যে, উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ এবং কমিশনারকে বাদ দিয়ে বাকী সভ্যদের অর্ধেক হবেন হিন্দু এবং অর্ধেক মুসলমান। অর্থাৎ ডীন ও প্রোভোষ্টদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী হিন্দু হলে মুসলমান মনোনয়নের দ্বারা সংখ্যা সমান করা হবে। সমান সংখ্যক হলেও যে তিন জন ইংরেজ সভ্য ছিলেন তাঁরা মুসলমানদের পক্ষে হবেন এটাই সকলে ধরে নিতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মাত্র বিষয় ছাড়া এ রকম বিরোধ বড় একটা দেখা দেয় নি। এই বিরোধের বিষয়টি হল শিক্ষক নিয়োগ। অনেক সময় দেখা যেত যে, অধিকতর উপযুক্ত হিন্দু প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও মুসলমানকে নিযুক্ত করার জন্য মুসলমান সভ্যরা চেষ্টা করছেন এবং অনেক সময় তাঁরা সে কাজে সফলও হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি।

বলেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে উৎকর্ষ নির্ভর করে তার শিক্ষকমণ্ডলীর উপরে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ মুসলমান ছাত্রদের কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং যোগ্য শিক্ষক যদি নিযুক্ত না হয় তাহলে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষেই তা পরিণামে অনিষ্টের কারণ হবে। এর উত্তরে তাঁরা যা বলতেন সেটিও খুবই বিচার বিবেচনা করে দেখার মতো। তাঁদের মতে প্রধান প্রধান অধ্যাপক (Professor, Reader) নিয়োগের বেলায় সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্নই তোলা উচিত নয়। গুণানুসারে যাতে যোগ্যতম ব্যক্তিই নিযুক্ত হন তা তাঁরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেলায় কতকাংশে নিকৃষ্ট হলেও তাঁরা একমাত্র মুসলমানকেই নিযুক্ত করতে চান। তার কারণ এই যে, বাংলা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, মুসলমানদের অবনতির একটি প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অভাব। তাঁদের মধ্যে কিছু জমিদার আছেন; বাকী সবই কৃষক। হিন্দুদের মধ্যে যেমন শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যবিত্ত লোকেরাই সমাজের শীর্ষস্থানে রয়েছেন তাঁরাও তাই নিজেদের সমাজে করতে চান। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষক দিয়েই তা আরম্ভ করতে হবে। এ যুক্তি একেবারে অসার নয়। তবে এ কতটা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের মনোভাব এবং মতামত জানা প্রয়োজন বলেই এ-কথা লিখলাম।

শিক্ষক এবং কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা গেলেও অন্য কোন বিষয়ে তাঁরা কিন্তু কোন প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির অন্তরায় হতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরীক্ষার ব্যাপারটি উল্লেখ করা যায়। পরীক্ষার ব্যাপারে মুসলমান ছাত্রদের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাবার চেষ্টা তাঁরা করেননি। প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ঢাকার নবাব বংশের নাজিমুদ্দীনের ভ্রাতা সাহাবুদ্দিনের পুত্র ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল; অল্প কয়েক নম্বরের জন্য সে অনার্স পায়নি। তখন হিন্দু ও মুসলমান অনেক শিক্ষক এবং এমনকি বাইরের লোকও বলেছিলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপার অসম্ভব হত। বাস্তবিকই পরীক্ষার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই সুনাম ছিল এবং আমার বিশ্বাস

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আদর্শ এবং উচ্চমান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তা বিরল। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য বা নম্বর বাড়ানোর জন্য কেউ কোনদিন দরবার করেছে—এ দৃষ্টান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

পরীক্ষা বিষয়ে ঢাকায় হার্টগ সাহেবের নির্দেশে কয়েকটি নিয়ম চালু করা হয়। যেমন অনার্স ও এম. এ পরীক্ষার প্রত্যেক পেপার দু'জন পরীক্ষক দেখতেন। উত্তর পত্রে কোন নম্বর দেওয়া হত না। পরীক্ষকেরা উত্তর পত্রের প্রত্যেক প্রশ্নের নম্বর আলাদা কাগজে লিখে বিভাগীয় প্রধানের কাছে পাঠাতেন। দু'জন পরীক্ষকের দেওয়া নম্বরের মধ্যে শতকরা দশের বেশী পার্থক্য দেখা গেলে সেই উত্তরপত্রটি তৃতীয় আর একজন পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হত। তাছাড়া মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। যারা অল্প নম্বরের জন্য পাশ করতে পারেনি কিম্বা উচ্চতর বিভাগে যেতে পারেনি এই মৌখিক পরীক্ষার ফলের দ্বারা সেইসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা হত। এছাড়া সারা বছর টিউটোরিয়াল ক্লাস হত। মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার ফল চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণের সময় বাইরের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক উপস্থিত থাকতেন। এই সব কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রণালী ও আদর্শ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটা ভিন্ন ধরনের হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরাও পরীক্ষা সম্পর্কে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সততা সম্বন্ধে বরাবরই উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

পরীক্ষার ন্যায় পাঠ্যসূচী বিষয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু নূতন প্রণালী অনুসরণ করা হয়। প্রথমতঃ এম. এর পাঠ্যতালিকায় অতি আধুনিক অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের ইতিহাস বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি যখন এটি প্রথম প্রস্তাব করি তখন অনেকেই এর বিপক্ষে ছিলেন। তাঁদের মত ছিল এই যে, এত নিকটবর্তী কালের কোন ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আমি এর প্রতিবাদে বরাবর বলেছি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রাবস্থা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসের

১৮৭৮ সালের পরবর্তী ঘটনা ছাত্রেরা কিছু পড়েনি বা জানে না এবং আমেরিকার মতো এত বড় দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাদের নেই। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলে বর্তমান জগতে বাসের জন্য আমাদের জ্ঞানের পরিধি যতটা বিস্তৃত হওয়া নিতান্ত দরকার তার অন্ততঃ কিছু পরিমাণ শিক্ষা হবে। যতদূর জানি এর অনেক বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এর পাঠ্যসূচীতে এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই অবশ্য প্রথমে এর খুবই বিরোধী ছিলেন। ইতিহাস বিভাগে আর একটি নূতন নিয়ম প্রণালী আমি প্রবর্তন করি। যেসব ছাত্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ত তাদের কিছু কিছু প্রাচীন ভারতের মুদ্রা ও লিপির পরিচয় জানতে হত। এম. এর মৌখিক পরীক্ষার সময় এই ধরনের লিপি ও মুদ্রা পরীক্ষার্থীদের সামনে রেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করা হত। যতদূর মনে পড়ে এর জন্য কিছু নম্বরও নির্দিষ্ট ছিল।

(ক্রমশঃ)

———

ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

অমলেশ ত্রিপাঠী

(১)

কোনো কোনো জাতির ইতিহাসে এমন এক আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় উপস্থিত হয় যখন কয়েক মাস বা বছরের মধ্যে তার ঐতিহ্যলব্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মন্দীভূত স্রোতে প্রবল আলোড়ন জাগে, আবর্ত সৃষ্টি হয়, বন্যায় দুকূল ভেসে পুরাতন দিক দিশা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর ঘোলাজল সরে গেলে জাগে নূতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টির, পলিভূমি। ক্বচিৎ কখনো আবার সে আলোড়ন সেই জাতির প্রাক্তনকে প্লাবিত করেই ক্ষান্ত হয় না, সীমান্ত অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে দূর দূর দেশে, কোথাও দর্শনে, কোথাও কাব্যে, কোথাও জাতীয়, কোথাও বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তীব্র বা মৃদু ছন্দে তার আঘাত লাগে। হয়তো কখনই তার প্রেরণা অবসিত হয় না।

তেমনি এক বন্যা নেমেছিল ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে, তাকে আমরা ফরাসী বিপ্লব নাম দিয়েছি। এর আগেও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে এক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল ঐতিহাসিকরা তার নাম দিয়েছিলেন Puritan Revolution। অনেকেই তাকে Civil War বা গৃহযুদ্ধ আখ্যা দিতে চান। সামাজিক পরিবর্তনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চরম গণতন্ত্রী Levellerদের দমন করে ক্রমওয়েল যে ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান তার সঙ্গে প্রথাগত রাজতন্ত্র, আধা গণতন্ত্রী পার্লামেণ্টারী শাসন এবং সহসা জাগ্রত সমাজ-সাম্যের আশা কোনটাই খাপ খায় না। দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্তনের পিছনে প্রায় সব শ্রেণীর বিত্তবান ব্যক্তিরই সমর্থন ছিল। Leveller দলও গৃহভৃত্য এবং কারখানার শ্রমিকদের ভোট দিতে রাজী হয়নি।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন অধ্যাপক পামার (R. R. Palmer, The Age of the Democratic

Revolution, vol. I) ও গোদ্‌সোত (Godechot, France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century 1770—1779)। এঁদের মতে ১৭৬৩সালে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে যে গণতন্ত্রী বিপ্লবের ঢেউ জাগে তাই আটলান্টিক পেরিয়ে হল্যাণ্ড (১৭৮৩-৯৫) সুইজার-ল্যাণ্ড (১৭৯৮), আয়র্ল্যাণ্ড (১৭৯৮), ইতালী (১৭৯৬-৯৮), পোল্যাণ্ড (১৭৯৪), ইত্যাদি দেশে প্রসারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের কোন স্বকীয় মাহাত্ম্য বা তাৎপর্য্য নেই, তা এই বহুবিস্তৃত বিপ্লব নাট্যের একটা বিশেষ অঙ্কমাত্র। এই প্রসঙ্গে কব্যান (Cobban) ও ডেভিড টমসন "গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক" (Democratic International) কথাটিও ব্যবহার করেছেন। তবু পামার বা গোদ্‌সোতের কথা পুরো মেনে নেওয়া যায়না এবং ফরাসী বিপ্লবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেই হয়। পামারের উল্লিখিত পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে (History XLV, 1960) কব্যান নিজেই পামারের পদ্ধতি নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। পামার বিভিন্ন বিপ্লবের মিলগুলি বড় করে দেখেছেন, কিন্তু পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাননি। মার্সেল রাইনার্ড (Marcel Reinhard Annales-Economies, Societés, Civiliations, XIV, 1959) স্পষ্টই বলেছেন, 'ফরাসী বিপ্লব অ্যাংলো-স্যাক্সন ধাঁচের বিপ্লবই নয়, এটা বিশেষভাবে ফরাসী দেশের ব্যাপার। ফরাসী জাতির প্রকৃতির সঙ্গে এর যোগ অঙ্গাঙ্গী, ফরাসী অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো, জনমত বাদ দিলে একে বোঝা যাবে না।

তাছাড়া এ বিপ্লব একাধারে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। এবং এর রথচক্রে সমস্ত শ্রেণীর লোক কোন না কোন সময় হাত লাগিয়েছিল। এর সূচনা ১৭৮৭ সালের অভিজাত বিদ্রোহে (revolte nobilaire)। তার সঙ্গে পরে যোগ দিল বুর্জোয়া-শ্রেণী। ১৭৮৯ সালে রাজা ষ্টেটস্ জেনারেল (States General) ডাকতে বাধ্য হলেন। অভিজাত—বুর্জোয়া বিরোধের ফলে এষ্টেটস্ রূপান্তরিত হ'ল National Assembly বা জাতীয় সংসদে যা পরে শাসনতন্ত্র রচনা করতে বসে নাম নিল Constituent Assembly। কৃষক-বিপ্লব এর প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। রাজা অভিজাতের ষড়যন্ত্র থেকে তা সদ্যজাত জাতীয় সংসদকে বাঁচায়। কৃষকদের

সামন্ত-তন্ত্র বিরোধী দাবী মেনে নিয়ে প্রগতিশীল patriot দল আপাতরক্ষা পেল। তারপর দেখা দিল প্যারিসের সাঁসকুলোট (sansculotte) বিপ্লব। তার মধ্যে ছিল কারুজীবী, ছোট দোকানদার, শিক্ষক, শ্রমিক, বেকার। এদের সাহায্য ব্যতীত ১৭৮৯র জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রতিক্রিয়ার প্লাবন রোধ করা যেত না। গ্রামীন কৃষক ও সহরে সাঁসকুলোটদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এবং উভয় শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের স্বার্থবিরোধ অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইউরোপের রাজন্যবর্গের প্রথম জোট (First Coalition) তাদের ঐক্য দিল। ফ্রান্সের জাতীয় অস্তিত্ব এই ঐক্যের অভাবে বিপন্ন হ'ত। তুলনায় অন্যান্য দেশে এমন শ্রেণী সহযোগিতা দেখা দেয়নি। হাঙ্গেরীর কৃষককুল বিদ্রোহী Diet এর বিরুদ্ধে সম্রাট লিওপোল্ডকে সাহায্য করে ছিল। হল্যাণ্ডের বিপ্লব শুধু বুর্জিয়াশ্রেণী দ্বারা চালিত ছিল, সেখানে সহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত বা কারুজীবী সম্প্রদায় অরেঞ্জ রাজকেই সমর্থন জানায়। যখন ওলন্দাজ মধ্যবিত্ত ফরাসী বেওনেটের আওতায় সাধারণতন্ত্র স্থাপন করল তখনও কৃষকশ্রেণী তার থেকে দূরে থাকে। আমেরিকায় নিউ ইংল্যাণ্ডের কারুশিল্পী বা ভার্জিনিয়ার কৃষক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে নেতৃত্ব ছিল অ্যাডামস্ বা ওয়াশিংটন বা জেফার্সনের মত বিত্তবান ব্যক্তির হাতে। অনেক উপনিবেশেই টোরী সংখ্যাধিক্য ছিল। অধ্যাপক মরিসন শুধু ম্যাসাচুসেটস সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমেরিকার বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনে যথেষ্ট—"The Constitution of 1780 was a lawyers' and merchants' Constitution, directed toward something like quarter deck efficiency in government and the protection of property against democratic parties."। ১৭৯১ সালেই ফ্রান্সের বিপ্লব এ অবস্থা ছাড়িয়ে যায়! তাছাড়া আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বা আইনগত অধিকার নিয়ে অনেকখানি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষ্ণাঙ্গ দাস প্রথা লোপ করার কথা কেউ ভাবেনি। উপরন্তু ফ্রান্সের সাহায্য ছাড়া এ বিপ্লব সার্থক হ'ত কিনা সন্দেহ। তুলনায় ফরাসী বিপ্লব সম্পূর্ণ জাতীয় বিপ্লব। তাতে অন্য কোন দেশ মদত জোগায়নি। স্বকীয় মৃত্তিকা থেকে রস সঞ্চয় করেছিল বলে বহিরাক্রমণের প্রচণ্ড ঝড়েও

তা ভূপাতিত হয় নি। এই কারণেই ফ্রান্সে গভীরতর সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। শুধু ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি নিঃশেষ হয় নি, তা ছাড়িয়ে গিয়ে সমাজ সাম্য ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা এখানে রূপ নেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বভাব বিভিন্ন এবং দাবী বহুক্ষেত্রে বিরুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতি সংকটে পরস্পরের পরিপূরকের কাজ করেছে—তার ফলেই প্রাচীন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা (ancien regime) কে সবচেয়ে বেশী আঘাত করা সম্ভব হয়েছে।

এমন ঘটনাবহুল, শ্রেণী সংঘাত ও সহযোগিতা—সংকুল, বৈদেশিক শক্তি সংঘর্ষে জর্জর বিপ্লবের কারণ, প্রকৃতি, তাৎপর্য, নেতৃত্ব, পরিণাম প্রভৃতির বিশ্লেষণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। মতভেদের আরও একটা কারণ—বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক টানা পোড়েন। ১৭৮৯'র বিপ্লব তার প্রধান শত্রু—চার্চ, অভিজাত, উচ্চতর বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বড় জোতদার—কাউকেই একেবারে নির্মূল করতে পারেনি। ১৮৩০, ১৮৪৮ ও ১৮৭০ এর ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯-৯৪র অসম্পূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। এই সব পরবর্তী বিপ্লবে যে সব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত বা ব্যাহত হয়েছে তাদের মুখপাত্ররা ১৭৮৯-৯৪র বিপ্লবের অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যাখ্যা করেছেন। সেই আদি বিপ্লবের গতি, প্রকৃতি, লক্ষ্য, উপায়, সিদ্ধি ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তাঁরা এড়াতে পারেন নি, বরং তারমধ্যেই খুঁজেছেন সমসাময়িক বিপ্লবের নিমিত্ত বা উপাদান, কারণ, সিদ্ধির পরিমাণ বা ব্যর্থতার চাবিকাঠি।

তাই ১৭৮৯-৯৪ নিয়ে বিবাদ বিতর্ক কোন দিন শেষ হয়নি। বিপ্লব থেকে বিপ্লবান্তরে শিখা জ্বালিয়ে নিয়ে আজও তা অনির্বাণ। মার্ক্স, লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্টালিন, সাম্যবাদীবিপ্লবের নেতৃস্থানীয় সকলেই বিশেষ শিক্ষা নিয়েছেন এর থেকে। বিপ্লবীর সম্ভাব্য ভুল, প্রতিবিপ্লবের লক্ষণ, তার সঙ্গে যুদ্ধ করার কলা কৌশল (strategy and tactics), বোনাপার্টি বাদের অভ্যুদয়, উগ্রবাম (enrag'e) পন্থার বিপদ—এসব নিয়ে রুশদেশে গবেষণার শেষ নেই। রোবসপিয়েরের ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror একটা বহু বিতর্কিত সমস্যা। কি এর স্বরূপ, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা, বৈদেশিক আক্রমণ এরজন্য কতখানি দায়ী, কতখানি দায়ী শ্রেণী সমাজের অন্তর্বিরোধ এবং অর্থনৈতিক সংকট, বিপ্লবের

মহান আদর্শের পক্ষে একি চোরাবালি না পলিমাটি, এ সব প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠেছে। আদর্শবাদী ও বস্তুবাদীর পক্ষে ফরাসী বিপ্লবের মত রণক্ষেত্র বিরল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও রুশোর মতবাদ (রুশোর মধ্যে গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী দুটো দিক ছিল একথা আবার অনেকে বলেছেন) বিপ্লবের জন্য দায়ী কিনা কিংবা কতখানি দায়ী, নাকি বিপ্লবের সংঘটনে ও বিবর্তনে ভাবধারার কোন দাম নেই, আছে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসূত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের খেলা—এটাও বিষম বিতর্কের বিষয়। কেউ বা আবার যান্ত্রিক জড়বাদ বর্জন করে উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চাইছেন। সব সময় যে রাজনৈতিক বা শ্রেণীস্বার্থ মতামতের জন্য দায়ী তাও নয়। যাঁরা দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিক তাঁদের মধ্যে কেউ প্রশংসা করছেন ষোড়শ লুইকে, কেউ পলাতক অভিজাতদের. কেউ নেপোলিয়নকে। যাঁরা সাধারণতন্ত্রী তাঁরা কেউ ত্রাসের রাজত্বের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। যাঁরা সমাজতন্ত্রী তাঁরা কেউ সমর্থন করছেন রোবসপিয়েরকে, কেউ বা হেবার্টকে। এমনকি বুর্জোয়াদের সম্বন্ধেও তাঁরা একমত নন। হিংসার পথ ঠিক কিনা এই বিষয়ে একই রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। আবার দেশপ্রেম বহু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরও ঐক্য দিয়েছে। রেভারেণ্ড ম্যাকমানার্সের ভাষায় "The history of history, like history itself, must be a debate without end"। ওলন্দাজ ঐতিহাসিক পিয়েতর হাইল (Geyl) ত আগেই এ কথা বলেছেন।

এছাড়াও আছে নানা দিকের বিশেষজ্ঞের আলোচনা। কেউ এর রাজনৈতিক দিকে, কেউ বৈদেশিক নীতির দিকে; কেউ বা চার্চ্চনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কেউ কৃষকশ্রেণী, কেউ সাঁসকুলোট, কেউ বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী, কেউ মূল্য ও মুদ্রামানের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত। নিত্য নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হচ্ছে। Cahiers বা Convention এর বিতর্ক (debates) আজ শেষ কথা নয়। ল্যাফভ্র (Lefebvre) তুলে ধরেছেন স্থানীয় মহাফেজে রক্ষিত জন্মমৃত্যুর হিসাব, জমি হস্তান্তরের নিরিখ; কব (Cobb) বিপ্লবী বাহিনীতে যোগদানের বা খাদ্যশস্য চলাচলের ফিরিস্তি করছেন; সবুল (Soboul) প্যারিসের প্রতিটি Section এর সভাসমিতি বিতর্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যাতে সাঁসকুলোটদের কীর্তিকাহিনী সঠিক

বোঝা যায়: লাব্রুস (Labrousse) মূল্যমানের রেখাঙ্কন দ্বারা বিপ্লবের গতি প্রকৃতি নিরূপন করছেন।—বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লব নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে আর কোন বিপ্লবের উপর ততটা নয়। এতে শুধু ফরাসী বিপ্লবের নূতন নূতন তাৎপর্যাই ধরা পড়েনি, ঐতিহাসিকদের দেশ কাল সমাজ শ্রেণীর রূপও ধরা পড়ছে। মাত্র কয়েকটি বছরের মুকুরে যুগের পর যুগ যেন আপন প্রতিবিম্ব দেখছে।

এর কারণ ফরাসী বিপ্লব নূতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের স্রোত আবাহন করে এনেছে। জাতীয় রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি, শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও তার ওপর রাষ্ট্রের আপৎকালীন অধিকার, উদারনৈতিক লেসে ফেয়ার ও সাম্যবাদী নিয়ন্ত্রণ নীতি, ক্লাসিক আন্তর্জাতিকতা বা রোমানটিক দেশপ্রেম, ক্যাথলিক গোঁড়ামি, নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান প্রভাবিত Deism, নাস্তিক্য, আজ পর্য্যন্ত যে সব আদর্শ নানা ভাবে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ নব-স্বাধীন অনগ্রসর দেশগুলিতে—ক্রিয়াশীল, ফরাসী বিপ্লব তার গঙ্গোত্রী।

(২)

বিপ্লবের সমকালেই তার কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ফ্রান্সের মধ্যে রাজতন্ত্রীদল এবং বাইরে পলাতক অভিজাত বর্গ ষড়যন্ত্রবাদ (conspiracy theory) প্রচার করতে থাকে। এই প্রচারের প্রভাব এডমণ্ড বার্কের ১৭৯০ সালে প্রকাশিত Reflections on the French Revolution এ প্রতিফলিত হয়েছে। বার্কের মতে প্রাচীন রাজতন্ত্র (ancien regime) নির্দোষ ছিল, এমনকি তাকে সংস্কারকামী আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। ভলতেয়ার রুশো প্রমুখ চার্চ্চ—বিরোধী দার্শনিক এবং ক্রমবর্দ্ধমান ধনিক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ফলেই বিপ্লবের সূত্রপাত। অর্থাৎ বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ওপর থেকে চাপানো হয়। বার্ক রাজা, রানী ও রাজ পারিষদগণের অক্ষমতা, অনভিজ্ঞতা, দুর্নীতি, দুর্বলতার প্রতি আদৌ নজর দেননি। সুযোগসুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর প্রকৃতি বিশ্লেষণে তাঁর

আগ্রহ নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যসংকট, মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধির অসাম্য, করভার এবং কৃষক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার কোন আভাস তার ভাবনায় স্থান পায়নি। অথচ বহুযুগের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে গড়ে ওঠা ব্যবস্থা নিয়ে রোমান্টিক বাগাড়ম্বর তিনি অজস্র করেছেন। রাণীর দুর্দৈবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর শিভ্যালরি। টম পেইন তাই পরিহাস করে বলেছিলেন, "He cities the plumage but forgets the dying bird।"

অথচ একই সময় আরেকজন ইংরেজ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি আর্থার ইয়ং। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্স ভ্রমণের সুযোগ তাঁর হয়েছিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তিনি জনগণের দুর্দশা, বেগার প্রথার অত্যাচার, সামন্ততান্ত্রিক ও রাজকীয় করের চাপ, খাদ্যের অভাব ও অতিমূল্য, ব্যাপক বেকার সমস্যার উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনায় আমরা দেখি পার্লামেন্ট (parlement) রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, বুর্জোয়ারা সহরে মজুর বেকারদের মধ্যে প্রচার ও অর্থ ছড়িয়ে তাদের শান্তিভঙ্গে প্রণোদিত করছে।

নেপোলিয়নের পতনের পর যখন বুর্বোঁ বংশ আবার রাজত্ব ফিরে পেল তখন উদারপন্থী নেতা বা সাংবাদিকরা আপনাদের দাবীর স্বপক্ষে বিপ্লবের নূতন ব্যাখ্যা সুরু করলেন। এ ব্যাখ্যা এল গিজো (Guizot) তিয়ের্স (Thiers) ও মিগ্নে (Mignet)র কাছ থেকে। গিজো বললেন রাজা, চার্চ ও অভিজাতদের স্বৈরাচার বিপ্লবে অনিবার্য করে তুলেছিল! মধ্যযুগের পরাভূত গল-সত্তা যেন এভাবে বিজয়ী ফ্রাঙ্ক-সত্তার ওপর প্রতিশোধ নিল। তিয়ের্স বললেন, বিপ্লবের প্রধান কারণ হ'ল তৃতীয় এষ্টেটের, বিশেষতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর, অভ্যুদয়। রাজা ষোড়শ লুই যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা বিষয়ে সামান্য সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং বুর্জোয়াদের উচ্চপদে নিয়োগ করতেন তাহলে বিপ্লব প্রথম পর্বেই সমাপ্ত হ'ত। দুজনেই মিরাব্যোর ভাবধারার প্রশংসা করলেন, লাফায়েতকে নায়ক বানালেন, জিরোঁদিনদের মহত্ব বর্ণনা করলেন। মিগ্নে দেখালেন অভিজাতদের সবচেয়ে বড় ভুল তৃতীয় এষ্টেটের গুরুত্ব বুঝতে না পারা।—বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের ফল ভালই হয়েছিল। 'রাজার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার স্থান নিল আইন, উচ্চ

শ্রেণীর একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার স্থান নিল সামাজিক সাম্য, মানুষ মুক্তি পেল শ্রেণী স্বার্থের কবল থেকে, ভূমি আন্তঃ প্রাদেশিক গণ্ডী থেকে, বাণিজ্য মধ্যযুগীয় গিল্ডের শৃঙ্খল থেকে, কৃষি সামন্ততন্ত্রের অনুশাসন থেকে এবং টাইথের শোষণ থেকে। একজাতি এক রাষ্ট্র ও এক বিধানের জন্ম হ'ল।" অভিজাতগণ দেশত্যাগী না হ'লে এবং চার্চের নয়া ব্যবস্থা স্থাপিত না হ'লে সাধারণতন্ত্রের কথা কেউ ভাবতো না, ত্রাসের রাজত্ব আসতো না। ১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্টের পরবর্তী ঘটনা এঁরা পছন্দ করেন নি। এ সময় থেকে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব চলে গেল, আরম্ভ হ'ল ঘৃণিত জনসাধারণের ('vile populace') স্বেচ্ছাচার। রাজতন্ত্রী বলে এঁরা ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের নিন্দা করলেন। সাঁসকুলোটদের অতিবাম পন্থা এবং জন নিরাপত্তা পরিষদের (Committee of Public Safety) কঠোর শাসন এঁদের নীতির বিরোধী ছিল। মাদাম দ্য স্তাল বিশেষ করে প্রশংসা করলেন ফরাসী সৈন্যবাহিনীর: "আভ্যন্তরীন বাদবিসম্বাদে যারা মারাত্মক কিন্তু বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে অপরাজেয়।"

তিয়ের্স ও মিগ্নে যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চেয়েছিলেন তা ১৮৩০ সালে এল কিন্তু "বুর্জোয়া রাজতন্ত্র" কাউকে খুশী করতে পারল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্লাইল ও মিশেলের কণ্ঠে আমরা দুই বিপরীত সুর শুনলাম। কার্লাইলের The French Revolution প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ খৃঃ অঃ, মিশেলের সাতখণ্ডে সমাপ্ত Histoire de revolution francaise, ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৩ খৃঃ অঃ এর মধ্যে। কার্লাইল ছিলেন ক্যালভিনপন্থী ইংরেজ। তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের গতি পূর্ব-নিরূপিত, তার উপজীব্য সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব। রোমান্টিক ভাবধারার প্রভাবে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীকে অধঃপতনের অধ্যায় মনে করতেন। ইতিহাসের গতি উচ্চাবচ, তার তালে তালে নাচে সৃষ্টি ও সঙ্কট, তার পালে কখনো লাগে মৃদু মন্দ দক্ষিণা বাতাস, কখনো বা কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া। ১৭৮৯-৯৪ খৃঃঅঃ কাল বৈশাখীর ধ্বংসলীলাই প্রত্যক্ষ করেছিল। বিপ্লবের পূর্ববর্ত্তী ফ্রান্স ছিল লোভ কামনা হিংসা মিথ্যাচারের গলিত স্তূপ—"a mouldering mass of sensuality and falsehood"। দেউলে কোষাগার ও ভ্রান্ত যুক্তিবাদ দুয়ে মিলে বিপ্লবকে

জন্ম দেয়। ঘুণধরা রাজতন্ত্রকে ধরে রেখেছিল "গিল্টিকরা পিচবোর্ডের থাম—অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণী।" অধিক বিলাসব্যসনের ব্যয় জোগাতে রাষ্ট্র হ'ল ফতুর (সমসাময়িক স্মৃতিকথা জাতীয় পুস্তিকা থেকে বহু রসাল উপাদান গ্রহণ করেছেন কার্লাইল)। তাকে নৈরাজ্যের পথে ঠেলে দিল লক-রুশোর সামাজিক চুক্তি। ফরাসী বিপ্লব, কার্লাইলের মতে, "the open violent Rebellion, and victory of disimprisoned Anarchy againstc orrupt worn-out authority"। ইতিহাস অসংখ্য জীবনের সমাহার কার্লাইল একথা বিশ্বাস করতেন। তাই বিপ্লবের অভিব্যক্তিতে অগণিত নরনারীর নিরুপায় চেষ্টাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ভবিতব্যের ক্রীড়নক এরা—তাঁর কাছে কৃপার পাত্র ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতির কুফল স্পষ্ট। আলাদা করে গাছ গুনতে গিয়ে তিনি সমগ্র অরণ্যকে হারিয়েছেন মেরী আঁতোয়ানেতের মুক্তামালার কেচ্ছা তারিয়ে তারিয়ে বলতে গিয়ে ফ্রান্স দেউলে হবার আসল কারণের দিকে দৃষ্টি দেননি। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়ে ফ্রান্স দেউলে হতে বসেছিল এবং অবৈজ্ঞানিক করব্যবস্থার জন্য কোনদিন স্বয়ম্ভর হতে পারেনি—এমন ইঙ্গিত তাঁর ইতিহাসে কোথাও নেই।

ঠিক এর বিপরীত জুল মিশেলে (Jules Michelet). তাঁর পৃথুল ইতিহাসের নায়ক হল জনগণ – le peuple. "আমার হ'ল প্রথম সাধারণতন্ত্রী ইতিহাস যা সব প্রতিমা ও দেবতাকে ধ্বংস করেছে, প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত এর একমাত্র নায়ক—জনগণ,"। ভিকো (Vico)র শিষ্য ছিলেন তিনি, কিন্তু ভিকোর চক্রাকার গতির ইতিহাসদর্শন তিনি মানতেন না। প্রগতিতে ছিল তাঁর অচল আস্থা। কার্লাইল যেখানে দেখেছেন ধ্বংসের বেসুরা তাণ্ডব, মিশেলে সেখানে দেখলেন নূতন সৃষ্টির গর্ভযন্ত্রণা। বিপ্লবকে তিনি ধর্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন—ন্যায় (Justice) এর ধর্ম। এখানেও ভালমন্দের দ্বন্দ্ব চলেছে, তবে ভালোর অন্তিম জয় সম্বন্ধে মিশেলে নিঃসন্দেহ। একদিকে দুর্নীতি ও অত্যাচার, অন্যদিকে স্বাধীনতা ও ন্যায়—ইতিহাসের মানদণ্ড সেদিন উভয়মেরুর মধ্যে দোদুল্যমান। অভিজাতবর্গ আপনাপন manor ছেড়ে রাজধানীর প্রমোদস্রোতে গা ভাসিয়েছেন, ধর্মযাজক ছেড়েছে ভজন সাধন

দান ধ্যান, চতুর্দশ লুই যুদ্ধে উড়িয়েছেন শতাব্দীসঞ্চিত ঐশ্বর্য, পঞ্চদশ লুই স্বৈরিণী রমণীর পায়ে ঢেলেছেন সাম্রাজ্যের রাজস্ব, আর ইচ্ছাশক্তিহীন ষোড়শ লুই অক্ষম দর্শকের ভূমিকায়। এর মধ্যে কৃষক শ্রেণী বাইবেলের জোবের মত সর্বংসহ—"it is Job sitting among the nations. O meekness ! O Patience" ! ক্রমঃক্ষীয়মাণ উৎপাদিকা, ক্রমবর্দ্ধমান কর ভার, অর্দ্ধভুক্ত কৃষক ও ক্ষেত মজুর, অফলা ধরিত্রী, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, আর ন্যায়নীতিমানবতাহীন সমাজের তলায় তলায় মঁতেস্কু, ভলতেয়ার, রুশোর প্রলয়গর্ভ চিন্তার গুরুগুরু ধ্বনি। বিপ্লব এল যেন মহাবিচারের দিনের মত—বাস্তিল দুর্গ জনগণের কাছে মাথা নোয়াল। "তার বিবেক বড় পীড়া দিচ্ছিল।" এ বিপ্লবরথের রথী যেই হোন না কেন এর সারথি ছিল জনগণ। নেতারা ছিলেন তাদের হাতের পুতুল—L' acteur principal est le peuple. মিশেলে ছিলেন বালজাক ও উগ্যোর সমসাময়িক, রোমান্টিক ভাবালুতা তখন প্রতিক্রিয়ার পথ ছেড়ে বাঁদিকে মোড় নিয়েছে। তার প্রভাবে মিশেলে "জনগণ" অভিহিত এক myth সৃষ্ট করলেন। এর পিছনে উঁকি মারছিল রুশোবর্ণিত সামূহিক স্বাধীনতা (collective liberty) র ভাবনা, হয়তো বা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের জন্য গর্ব। "My glorious motherland is···the pilot of humanity"। এ ধরণের ইতিহাস বিশ্লেষণ নয়, সমন্বয় নয়, আত্মিক পুনরুজ্জীবন—integral resurrection। দেকার্তের কঠিন শীতল যুক্তিবাদ ত্যাগ করে মিশেলে বোধির পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই তিনিই প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি ও সেক্সান গুলির দলিল দস্তাবেজ দেখেন—যার পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল প্যারিসের বিপ্লবী জনতার কীর্তিকলাপ। তার সাহায্যে মিশেলে দেখালেন ১৭৮৯ সালে জনগণ অনেক আশা করেছিল, ১৭৯২ সালে তারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। হেবার্ট ও এঁরাজে (enrages)—অর্থাৎ উগ্রবামপন্থীদের সম্বন্ধে তিনি সহানুভূতিশীল। তবু কতটা তিনি এদের বুঝেছেন? অধ্যাপক সবুলের মতে "জনগণ" শব্দটি অতিব্যাপক বলেই অর্থহীন। কত বিচিত্র ধরণের লোক, বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ এই একটি শব্দ দিয়ে

আবৃত। মিশেলে সে দুরবগাহ জটিলতা এড়িয়ে গিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমজীবী ও উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রী শ্রমজীবী কি একই শ্রেণী? বিপ্লবকে ধর্মের স্থান দিয়ে তিনি চার্চের ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করেছেন। ১৭৮৯-৯২ ও ১৭৯২ এর পরবর্তী ঘটনাকে পৃথক করে তিনি প্রথম পর্বের নাম দিয়েছিলেন—l'epoque sainte বা পবিত্র কর্মের যুগ এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছিলেন l'epoque des actes sanguinaires বা শোণিত-লিপ্ত কর্মের যুগ। এই পর্বভাগের মধ্যে কি সহিংস জনগণের প্রতি তাঁর অবচেতন বিরাগই প্রকটিত হয়নি? সর্বোপরি, অতীতের শিকড়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল না, ছিল ভবিষ্যতের ফলের দিকে, তাই তাঁর ইতিহাস দর্শন অনেকাংশে বিকৃত।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে আবার বিপ্লবের ঢেউ লাগল। এই প্রসঙ্গে লামার্তিন, লুই ব্লাঁক ও আলেক্সি দ্য তোক্‌বিলের ব্যাখ্যা স্মরণীয়। লুই ব্লাঁকের চোখেও বিপ্লব ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। তবে যে দ্বন্দ্ব প্রথমে আদর্শের রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে পরে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। চিন্তার রাজ্যে যা প্রথাগত রাজতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও মৈত্রী (fraternity), অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। তিনি রোবসপিয়ের ঐতিহ্যের বানপন্থী ছিলেন এবং বুর্জোয়া স্বাতন্ত্রবাদকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু প্রকাশ্য শ্রেণী সংগ্রামেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি: "আতিশয্যের জন্যই ত্রাসের রাজত্ব চিরকালের মত অসম্ভব হয়েছে।" এই আতিশয্যের বিরুদ্ধে লামার্তিন লিখেছিলেন জিরোঁদিনের ইতিহাস (Histoire des Girondines). উভয়ের মোটামুটি বক্তব্য ছিল—সামাজিক গণতন্ত্র নিশ্চয়ই আসুক কিন্তু তা যেন সন্ত্রাস ও হিংসার মুখোস পরে না আসে।

দর্শন থেকে ভাবধর্মী সামান্যকরনের (idealistic generalization) প্রত্যয় নিয়ে মিশেলে লিখতে বসেছিলেন বিপ্লবের ইতিহাস; তোক্‌বিল একই ইতিহাস লিখতে বসেছিলেন গণতন্ত্রের বাস্তবধর্মী সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর। তাই মিশেলের কাব্যগন্ধী বর্ণনা তোক্‌বিলে অনুপস্থিত। L'Ancien Regime et la révolution এর প্রথম বিশেষত্ব হ'ল সামাজিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জাগ্রত চৈতন্য। তাঁর মতে বিপ্লবের পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে একটা প্রবহমান ধারা রয়েছে. কোথাও আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ঘটেনি। ১৭৮৯ সালের পূর্বে যে স্বৈরতন্ত্র ছিল, বিপ্লব তার স্থানে নতুন ধরনের এক স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেছে মাত্র। রাজকীয় কাউন্সিল, ইনটেনড্যান্ট প্রভৃতির মাধ্যমে ষোড়শ লুই এর সময় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে এবং রাষ্ট্রের শক্তি কেন্দ্রীভূত হতে সুরু হয়েছিল। বিপ্লব সে প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করল। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র ও দুর্দশা বিপ্লবের অন্যতম কারণ— মিশেলের এবম্বিধ মতবাদকে তোকবিল উড়িয়ে দিলেন। উল্টে বল্লেন, কৃষকদের ক্রমবর্দ্ধমান সম্পদই বিপ্লবের কারণ। সম্পদ বাড়ছিল বলেই সমাজতন্ত্রের অবশিষ্ট চিহ্নগুলি এত অসহ্য লাগছিল। বস্তুতঃ ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের সংখ্যা নগন্যই ছিল। রুশ ঐতিহাসিক লুচিস্কি পরে দেখিয়েছিলেন ফরাসী কৃষকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ কাল ধরে জমি কিনেছে। কিন্তু যে সব কৃষক না খেয়ে টাকা জমিয়ে আরো জমি কিনতে বা পত্তনি নিতে চাইছিল তাদের কাছে সামান্য প্রতিবন্ধকই দুর্লঙ্ঘ্য বলে প্রতীয়মান হ'ত। এই প্রসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া (feudal reaction)-র কথাও উঠেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্রুত উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে আয় কমে যাওয়ায় শঙ্কিত হয়ে সামন্তপ্রভুরা বহুদিনের অচলিত কর ও শ্রমদেয় (dues and services) পুনঃ প্রবর্তন করার চেষ্টা পায়। অনেক সময়, কব্যান বলেছেন, তারা সে সব কর (seigneurial dues) বুর্জোয়াদের কাছে বেচে দেয় এবং বুর্জোয়ারা কঠোর হস্তে তা আদায় করতে থাকে। যাই হোক, একদিকে যেমন সামন্তপ্রভু ও কৃষককুলের মধ্যে নানা কারণে বাদবিসম্বাদ বাড়ে অন্যদিকে তেমনি সামন্ত-প্রভুরা রাজতন্ত্রকে আপন স্বার্থে বিপদে ফেলতে চায়। এর ফলে ১৭৮৭ সালের সামন্ত বিদ্রোহ, বিপ্লবের নান্দীমুখ বলে মাতিয়ে (Mathiez) যার উল্লেখ করেছেন। তৃতীয়তঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষোভের কারণ ছিল যথেষ্ট। সামন্তশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল না। তাদের বিত্ত ও যোগ্যতা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছিল, অথচ তখনও তারা নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছিল। বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা (liberty)র চেয়েও বেশী চেয়েছে সাম্য (equality) এবং নেপোলিয়ন পরিস্কার ভাবে এ সত্য বুঝেছিলেন বলে

অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। তোক্‌বিল বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রের উত্তমর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। ১৭৮৯ সালে প্রধানতঃ এদের কাছেই রাষ্ট্রের ধারের পরিমান ষাট কোটি লিভর (livres)র মতো দাঁড়িয়ে ছিল। বলা বাহুল্য উত্তমর্ণের প্রতিভূ রূপে থার্ড এষ্টেট রাষ্ট্রের ওপর আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছিল।

তোক্‌বিল বারংবার শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও শ্রেণী স্বার্থের সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন। Je parle des classes – এ উক্তি বিখ্যাত। হয়তো ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ও মার্ক্সের চিন্তাধারার প্রভাব এর উপর পড়েছে। ল্যাফব্র তাঁর এক প্রবন্ধ—Apropos de Tooqueville এ (Annales, 1956) সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। দার্শনিকদের প্রভাবকে তোক্‌বিল বিশেষ আমল দেননি। তারা প্রশাসনিক সংস্কারের বেশী কিছু চায়নি। "দুর্বল সরকারের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক মুহূর্ত হল তখন যখন তা সংস্কার প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়।" মিশেলের মত "জনগণ" নিয়ে তিনি কোন myth সৃষ্টি করেননি। বস্তুতঃ বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। অধ্যাপক কব্বান তাঁর রচনায় নেপোলিয়নের ছায়া দেখেছেন—Across the whole of de Tocqueville's analysis lies the shadow of Bonapartism."

নৈরাশ্যবাদ তোক্‌বিলকে দিয়েছিল নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি আর তেইনকে অসুস্থ উগ্রতা। তেইন (Hippolyte Taine) এর L'Ancien Regime প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে—জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয় ও প্যারিস কম্যুনের অব্যবহিত পরে। ডারউইনের মতবাদের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি ও দেশের ভাগ্য জাতি (race), প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা নিরূপিত হয়। কোঁৎ এর প্রভাবে তিনি ইতিহাসে সমাজতাত্ত্বিক বিধানের সন্ধানও করেছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি এক কঠোর নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ বিচারে তিনি রাজতন্ত্র, বিপ্লব, সাম্রাজ্য কাউকেই রেহাই দেননি। এক নিরুপায় হতাশার পটে তিনি শত সহস্র খুঁটিনাটি তথ্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন—ঠিক তদানীন্তন বাস্তববাদী সাহিত্যিক ফ্লোবের, জোলা বা মোপাশাঁর মত।

তিনি শেষ পর্য্যন্ত যে বিধানে (law) উপনীত হয়েছিলেন তা হ'ল—ত্রাসের রাজত্ব বিপ্লবের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ রাজত্বের সুরু ১৭৮৯ সালের ৬ই অক্টোবর রাজার প্যারিস প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে। প্রথম থেকেই এক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সংখ্যালঘু দল (জ্যাকোবিন) বিপ্লবের পরিচালনা ভার নেয়। এরা বৈজ্ঞানিক (empirical) দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। এরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে নিছক বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত নিরবয়ব (abstract) এক প্রকল্প (hypothesis) অবলম্বন করে, তা'হল রুশোর popular sovereignty। "এভাবে কয়েক হাজার চিন্তাবিদ কয়েক লক্ষ অসভ্য বুনোকে (savage) এক প্রলয়ঙ্কর কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করে"। কৃষকদের অবস্থা অবশ্য খারাপই ছিল এবং সবচেয়ে অসহ্য ছিল রাজকীয় করের ভার। কিন্তু একথা যদি সত্য হয় তবে কৃষকদের অসভ্য বুনো বলা অনুচিত। সাঁসকুলোটরা ছিল ডাকাত, ভবঘুরে; জ্যাকোবিনরা ভদ্রসমাজে বেখাপ্পা (mislits), তারা পচা সমাজের গোবর গাদায় গজানো ব্যাঙের ছাতা—"ils naissent dans la de'composition sociale, ainsi que des champignons dans un terreau qui fermente"। রুশোর দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পারিবারিক পবিত্রতা, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সব কিছু পুরোনো মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিল এবং সমাজের নিম্নতম স্তরের দৈহিক ও মানসিক রোগগ্রস্ত লোকদের সাহায্য নিয়ে বিপ্লব বাধিয়েছিল। তেইন বারংবার এদের পাশব প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছেন।

রেভরেণ্ড ম্যাকম্যানার্স এ ধরনের ইতিহাসদর্শনকে monomaniacal আখ্যা দিয়ে অন্যায় করেননি। কি তথ্যের জোরে তেইন বল্লেন যে প্রথম থেকেই জ্যাকোবিন বলে একটা সংখ্যালঘু দল ছিল? এবং তাদের মনে বিপ্লবের একটা পরিষ্কার ছক ছিল? তারা শুধু ক্ষমতালোভী নেতা না কোন সামাজিক শক্তির মুখপাত্র? অষ্টাদশ শতকে কি শুধু রুশোর মতবাদই গড়ে উঠেছিল? ভলতেয়ার, মতেস্কু, এনসাইকোপেদিস্তরা কোথায় গেলেন? তাছাড়া বাস্তব পরিবেশের, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার, কি কোন অবদান নেই? নিরক্ষর কৃষক ও সাঁসকুলোট এমন বিদগ্ধ রচনা পড়ল কখন, বুঝল কি করে? শুধু ত্রাসের জন্য কি জনগণই দায়ী? বাস্তিল পতন প্রসঙ্গে তেইন সৈন্য

সমাবেশের উল্লেখ করেননি। ২০শে জুন ও ১০ই আগষ্ট (১৭৯২) এর হত্যাকাণ্ড কি বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া বোঝা যায়? সত্যিকারের ঐতিহাসিক যাঁরা —লাফভ্র বা মার্ক ব্লক—সব সময়ই collective psychology-র ওপর জোর দিয়েছেন যাতে rumour বা fear কি ভাবে বিপ্লবকে প্রভাবিত করে বোঝা যায়। শেষে, তেইন নিজেই কি নিরবয়ব সামান্যীকরনের (abstract generalization) বলি নন? আলার্দ দেখিয়েছেন দলিল ব্যবহারে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ, কালক্রম সম্বন্ধে অনবহিত। অগণিত আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবই প্রকট হয়েছে।

(৩)

এতদিন বিপ্লবের ইতিহাস সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক কর্মের অঙ্গ ছিল। অলার্দের (Alphonse Aulard) সঙ্গে তা অধ্যাপকীয় গবেষণার বিষয় বস্তু হ'ল। র‍্যাঙ্কে-প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ঢেউ তখন ফ্রান্সে লেগেছে। ১৮৮৬ সালে সর্বোনে বিপ্লবের ইতিহাস পড়ানোর জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হ'ল এবং অলার্দ তার প্রথম অধ্যাপক রূপে বৃত হলেন। পরবর্তী ছত্রিশ বছরে বহু গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও তিনি বিপ্লব বিষয়ক দলিল দস্তাবেজের ত্রিশখণ্ড প্রকাশ করলেন। "বিপ্লবের ইতিহাসে এ যেন শিল্প-বিপ্লব।"

সব দিক দিয়ে অলার্দ ছিলেন তৃতীয় রিপাবলিকের সন্তান। ১৭৮৯-৯৪'র ইতিহাসে তিনি আপন যুগের বীজসন্ধি আবিস্কার করেছেন। "আমি বিপ্লবের শ্রদ্ধাবান ও কৃতজ্ঞ উত্তরাধিকারী. যে বিপ্লব মানবধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়েছে।" ১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর Histoire Politique de la révolution francaise (ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক ইতিহাস) তেইনের জবাব। এতে তৃতীয় সাধারনতন্ত্রের র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিষ্ট পার্টির বুর্জোয়া, চার্চ্চ-বিরোধী, সাধারণতন্ত্রী আদর্শই প্রচারিত হয়েছে।

অলার্দের মতে ১৭৭৮ সালে সামন্ততান্ত্রিক কর ও শ্রম তার যতটা দুর্বহ ছিল ১৭৮৯ সালে তা ছিল না। Cens প্রভৃতি কিছু কিছু কর, বেগার (corvee), প্রভুর ভাটিখানায় মদ তৈরী বা রুটি তৈরীর কারখানায় রুটি

তৈরী ইত্যাদি দায় (banalities) ছিল। তবু cens এর ভারও কমে যাচ্ছিল। কৃষকরা জমি কিনছিল—যদিও অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে টাকা জমিয়ে এবং কিনেই এই সব করের সম্মুখীন হচ্ছিল। তারা আর পূর্বেকার মত সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলনা। "Perhaps it was actually no heavier, but the peasant was simply less resigned to it."

ভাবনার দিক থেকে অলার্দ ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছেন। বিপ্লবের মূল কথা হ'ল মানবাধিকার ঘোষণা (Declaration of the Rights of Man)। পর্বেপর্বে সে ঘোষণা কার্য্যকর করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথাগত ক্যাথলিক ধর্ম্মের স্থানে বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছে মানব ধর্ম্ম যা ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ সকল শ্রেণীর জন্য মুক্ত করে দিয়েছে।

জিরোঁদিনদের দলগত অপদার্থতার অভিযোগ মেনে নিয়েছেন অলার্দ, বিশেষ করে তাদের federalism এর নীতির ব্যর্থতা। যুদ্ধের সময় তা বিপজ্জনক। তবু তিনি তাদের নেতাদের মধ্যে দেখেছেন "যা কিছু শ্রেষ্ঠ, নিঃস্বার্থ ও মানবিক।" অলার্দের আসল নায়ক দাঁত। তিনি রোবস্‌পিয়েরের মত গোঁড়া নন। কোন মতবাদকে অন্ধভাবে ধরে না রেখে বা জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে তিনি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন (pragmatic)। শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে তিনি প্রগতির পথ খুঁজেছিলেন। শান্তি তাঁর কাম্য ছিল—অথচ সাধারণতন্ত্রের দ্বিতীয় বৎসরে (১৭৯৩-৯৪) তিনিই ছিলেন জ্বলন্ত দেশপ্রেমের বাণীমূর্তি, প্রতিরোধের অতন্দ্র প্রহরী। দাঁত অর্থগৃধ্নু ছিলেন কিনা বা সেপ্টেম্বর (১৭৯২) হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে অলার্দ বহু আলোচনা করেছেন। তাঁর দাঁত চরিত্রে যেন গ্যামবেটার (Gambetta) ছায়া পড়েছে। তুলনায় তিনি দেখিয়েছেন রোবস্‌পিয়ের হীন, ভণ্ড, উত্তেজক বাকচাতুর্য্যের যাদুতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য দায়ী।

অলার্দ পড়লে মনে হয় বিপ্লব যেন শুধু বুর্জোয়াদেরই খেলা। 'জনগণের' অবদান বিশেষ কিছু নেই। ধোঁয়াটে কোন ধারণার প্রশ্রয় তাঁর মত র‍্যাডিক্যাল-পন্থী ঐতিহাসিক দিতে পারেন না—তাই হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী না হয় সৈন্যবাহিনী এমন কোন সংগঠনের অঙ্গ হিসেবেই তিনি জনগণকে দেখতে

চেয়েছেন। কিন্তু এগুলি ত কোন সামাজিক দল বা শ্রেণী নয়। মৃত্তিকার সঙ্গে যোগহীন কৃষককে শুধু সৈনিকরূপে তিনি কিভাবে বুঝছেন? শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব বা একই শ্রেণীর আভ্যন্তরীন সংঘাত ও তিনি বোঝেন নি। তারাই যে ভোট দিয়ে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ডেকে আনল এবং বুর্জোয়া সাধারণ-তন্ত্রের অবসান ঘটাল—অলার্দ সে অপরাধ ক্ষমা করেন নি।

অলার্দের দক্ষিণে গেলেন মাদলাঁ (L. Madelin) ও বামে জ্যারেজ (J. Jaures) এবং মাতিয়ে (M. Mathiez)। ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, রাষ্ট্রশক্তির যুক্তি সম্মত পুনর্বিন্যাসই বিপ্লবের আসল কারণ, বললেন মাদলাঁ। রাজতন্ত্র অত্যাচারী ছিল না, ছিল দুর্বল এবং অপব্যয়ী (prodigal anarchy); অভিজাতগণ—অপদার্থ ও মূলহীন; চার্চ—মাঝারি (average) বিদ্যাবুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন; বুর্জোয়াশ্রেণী করভারপ্রপীড়িত জনগণের ক্ষোভ নিরঙ্কুশ-ভাবে আপন স্বার্থে নিয়োগ করেছে। অষ্টাদশ শতকীয় দর্শনের কুপ্রভাবকে আবার বড়ো করে দেখালেন মাদলাঁ এবং বস্তুতঃ আধুনিক উদারতন্ত্রের মূলনীতিগুলিকে নিন্দাই করলেন। ১৭৮৯ সালের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতারা অনাবশ্যক ভাবে রক্তস্রোত বইয়েছেন; ১৮-১৯ ব্রুমেয়ারে নেপোলিয়ান এসে সে আত্মঘাতী নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছেন। নেপোলিয়ানের ভূমিকা-রূপে বিপ্লবের মূল্য। তা ছাড়া নেই।

জ্যারেজ ছিলেন ফরাসী সমাজতন্ত্রের পুরোধা। ১৯০১ সালে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন Histoire Socialiste (1789-1900) বা সমাজতন্ত্রের ইতিহাস মার্ক্স, মিশেলে ও প্লুটার্কের প্রেরণায়। মার্ক্স থেকে তিনি নেন শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রাথমিক গুরুত্বের সূত্র; মিশেলে থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ এবং প্লুটার্ক থেকে ইতিহাসের নৈতিক উদ্দেশ্য। জ্যারেজের মতে ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব ব্যতীত আর কিছু নয়। এর প্রধানতম কারণ হ'ল নূতন এক শ্রেণীর অভ্যুদয়। মার্ক্সীয় প্রথায় তিনি বুর্জোয়া বলতে বুঝলেন ধনিক ও ব্যাঙ্কার, আর তাদের উপগ্রহ স্বরূপ রাঁতিয়ার (rentier), যারা রাষ্ট্রীয় ঋণ খাতে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল। বহু প্রমাণ সহ তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে ফরাসী শিল্প, বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বিস্ময়কর প্রসারের ফলে এই শ্রেণী অষ্টাদশ শতকে প্রাধান্য লাভ করল।

তখনও ঠিক বিজ্ঞানসম্মত অর্থ নৈতিক ইতিহাস রচনা শুরু হয়নি। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উদাহরণ গুলি ভ্রান্ত। যাই হোক, এই বুর্জোয়া শ্রেণী বিদ্রোহ করল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা, করভার, বেগার, আদালত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা তিনি করেছেন। কিন্তু অবশেষে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে যে সামন্ততন্ত্রের শাঁস চলে গিয়েছিল, পড়েছিল শুধু খোসা এবং ৪ঠা আগষ্ট (১৭৮৯) এর রাত্রে তাও রদ হয়ে যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর আসল লক্ষ্য এ নয়। অভিজাত ও বিশপরা মিলে রাষ্ট্রীয় শক্তির নানাভাবে অপব্যবহার করছিল, তাতে জনসাধারণের ক্ষতি হচ্ছিল, রাষ্ট্রও ক্রমশঃ দরিদ্র এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বুর্জোয়া বিপ্লব এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। জারেজের উপসংহার খুব অভিনব নয়। তবে সাঁকুলোটদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের পথ দেখিয়ে তিনি যে ডাক দেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। আঁরি সে (Henri Sée), মাতিয়ে (Albert Mathiez) ও লাফভ্র (Lefebvre) সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। সরকারী আনুকূল্যে অলার্দের সাহায্যে বিপ্লবের অর্থনীতি সংক্রান্ত দলিলগুলি প্রকাশিত হতে থাকে।

সে (Sée)র পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার (La France économique et sociale au xviii e siécle, 1925) ফলে ধরা পড়ল যে সমগ্র ফ্রান্সের হিসাব ধরলে চার্চের হাতে শতকরা ছ ভাগের বেশী জমি ছিল না; বিভিন্ন প্রদেশে চাষী মালিকানার হার আলাদা ছিল - নর্মাদিতে কৃষকরা ১/৫ অংশ ভূমির মালিক ছিল, ল্যাংডকে ১/২ অংশের। তিনিই প্রথম বল্লেন যে মার্ক্সিষ্টরা শ্রেণী বলতে যে homgeneous unit মনে করেন তার বাস্তব ভিত্তি নেই—প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী উপশ্রেণী বিদ্যমান। পরে লাফভ্র এই সূত্র ধরে তাঁর অনুপম Quatrevingtneuf বা ১৭৮৯ লিখেছিলেন।

মাতিয়ে ছিলেন অলার্দের যোগ্যতম শিষ্য তথা কঠোরতম প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯২২-২৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর La révolution francaise. বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ১৯০২ ও ১৯০৬ সালের মধ্যবর্তীকালে র‍্যাডিক্যাল সরকার যে সব দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছিল, ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রাথমিক

পরাজয়ের পেছনে যে সব অব্যবস্থা কাজ করছিল তারই প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে মাতিয়ের ইতিহাস দর্শনে। দাঁতঁকে নায়কের আসন দিয়েছিলেন অলার্দ, তাঁকে সুবিধাবাদী, অর্থগৃধ্নু, পরাজয়কামী রূপে আঁকলেন মাতিয়ে। মহাযুদ্ধ-কালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য তদানীন্তন সরকার নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করেছিল, সেই আলোকে ১৭৯৩-৯৪'র রোবসপিয়েরীয় নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি। জিরোঁদিনদের সঙ্গে সংগ্রামে উগ্রবাম enragé দের সাহায্য চেয়ে ছিল জ্যাকোবিন দল। সে সহযোগিতার জন্য দাম দিতে হ'ল—খাদ্যমূল্যের উর্দ্ধতম হার (maximum) নির্ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে মাতিয়ের La vie chère et le movement social sous la Terreur (১৯২৭) দ্রষ্টব্য।

বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল স্বীকার করলেন মাতিয়ে, তৎসঙ্গে সাধারণ ভাবে কৃষকদের অবস্থাও। তবে তিনি ভূমিহীন কৃষক এবং সহরে সাঁসকুলোটদের মধ্যে আর্থিক সংকটজনিত বিক্ষোভের ওপর জোর দিয়েছেন। 'সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া'র মতবাদ তিনি মেনে নেন এবং সর্ব প্রথম পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেন যে ফরাসী বিপ্লব কতকগুলি ভিন্নধর্মী বিপ্লবের পারম্পর্য: (ক) অভিজাত বিপ্লব (১৭৮৭-৮৮), (খ) বুর্জোয়া বিপ্লব (১৭৮৯-৯১), (গ) গণতান্ত্রিক বা সাধারণতন্ত্রী বিপ্লব (১০ আগষ্ট ১৭৯২-২ জুন ১৭৯৩) এবং (ঘ) সামাজিক বিপ্লব (জুন ১৭৯৩-জুলাই ১৭৯৪), থার্মি-ডোরেই বিপ্লবের সমাপ্তি।

রোবসপিয়ের ছিলেন মাতিয়ের নায়ক। কার্লাইল তাঁকে 'the acrid, implacable-impotent, dull-drawling, barren as the Harmatten wind" বলেছেন; অ্যাক্টন, "the most hateful character···since Machiavelli", অলার্দ, পাকা ভণ্ড। মাতিয়ে উত্তর দিলেন, "we love him for the teaching of his life and for the symbol of his death"। তাঁর চরিত্র অকলঙ্ক, দৃঢ়তা অনমনীয়, নীতি বিচক্ষণ, ত্রাসের রাজত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন যোগ্য—তাঁর "লাল চুল্লীতে ভবিষ্যত গণতন্ত্র পেটাই হচ্ছিল।" গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকটার ওপর জোর দিয়েছে বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র-বিলাসীর দল ও ভুয়ো আদর্শ-বাদী জিরোঁদিন, তার সামাজিক দিকটা সার্থক করার দায়িত্ব নিল জ্যাকোবিন।

এখানে মাতিয়ে জাতীয় বুর্জোয়া-কল্পিত স্বাধীনতা ও সাঁকুলোট-স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন, যেন শেষেরটার মধ্যে নিহিত ছিল প্রগতির পথ। কিন্তু থার্মিডোরে জয়ী হ'ল জমি ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ফাটকাবাজিতে বড়লোক বুর্জোয়া।

প্রথম থেকেই তাঁর রচনা একদেশদর্শী। আগে থেকেই মাতিয়ে বিপ্লবের একটা আদর্শ পথ ছকেছেন এবং তার থেকে সামান্যতম চ্যুতিও ক্ষমা করেননি। সুসিয়ে ফাভ্র তাঁকে "a Fouquier-Tinville of melodrama" বলে হয়ত অন্যায় করেছেন কিন্তু ম্যাকমানার্স "Taine of the Left" বলে ঠিকই করেছেন।

জ্যরেজ ও মাতিয়ে বিপ্লবকে "তলা থেকে দেখা"র পত্তন করে যান। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতী হলেন জর্জ্জ ল্যাফব্র (Georges Lefebvre)। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের কৃষককুলের অবস্থা নিয়ে তাঁর বিপ্লব বিষয়ক গবেষণা শুরু হয় কিন্তু তার মোটামুটি আদ্‌লা পাওয়া যায় তাঁর Quatre-vingt-neuf (1939) ও La Revolution francaise (1951) নামক পুস্তকে। প্রথমটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক পামার (The Coming of the French Revolution, 1947) এবং দ্বিতীয়টির দুইখণ্ড অনুবাদ করিয়েছেন রুটলেজ কোম্পানী। ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যেক ছাত্রের এটি অবশ্য পাঠ্য।

ল্যাফব্র সাধারণ মার্ক্সবাদীর মত বিপ্লবকে নিছক বুর্জোয়া বিপ্লব আখ্যা দেননি। তাঁর বিশ্লেষণে গ্রামাঞ্চল ও কৃষকের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। কৃষকশ্রেণী শুধু বুর্জোয়াদের অন্ধ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেনি, তারও একটা নিজস্ব দাবী এবং কর্মপদ্ধতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী রূপে শুধু অভিজাত, বুর্জোয়া ও 'জনগণ' অবিহিত অনির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তিনি ক্ষান্ত হলেন না, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন বহু উপশ্রেণী – যাদের মধ্যে স্বার্থগত ঐক্য ও বিরোধ সমান পরিস্ফুট। কৃষক শ্রেণীও কোনো অখণ্ড অবিভাজ্য শ্রেণী নয়। তাদের অন্তর্ভুক্ত এক শাখা— bourgeois rurale এর প্রতি ল্যাফব্র আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। যে সব অঞ্চলে মাঝারি বা ছোট জোতে চাষ হ'ত এরা ছিল সে সব অঞ্চলের সম্পন্ন গৃহস্থ। এদের অধীনে কাজ করত বহু ভূমিহীন এবং

দরিদ্র চাষী। তৃতীয়তঃ বিপ্লবের নেতৃত্ব যে ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়ী শিল্পপতি গোষ্ঠীর হাতে ছিল না, ছিল রাজকর্মচারী (officiers), ইজারাদার (fermiers), ব্যবহারজীবী, বৃত্তিজীবী শ্রেণীর হাতে সে কথা তিনি স্বীকার করলেন। এখানে তিনি মার্ক্সবাদকে শোধন করলেন। তবে দ্বিতীয় দলটি যে প্রথমের স্বার্থরক্ষা করে এবং পরিণামে বিপ্লব ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ খুলে দেয় সে কথা তিনি মেনে নেন [এই প্রসঙ্গে ল্যাফভ্রের Le mythe de la Revolution francaise দ্রষ্টব্য)।

বিপ্লবের নেতৃত্ব officiers, fermiers ও আইনজীবীদের হাতে ছিল এ বিষয়ে কব্যান ল্যাফভ্রের সঙ্গে একমত কিন্তু পরিণামে যে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছিল সে বিষয়ে তাঁর আপত্তি। অনেক মার্ক্সবাদীও স্বীকার করেন যে অধিকাংশ ফরাসীর জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি. (Samuel Bernstein, Science and Socciety, 1965)। জর্জ রুদে (G. Rude) এমনও বলেছেন যে বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কাপলো বলেন, শিল্পপতি গোষ্ঠী বিপ্লবের ফলে জন্ম নেয়, বিপ্লবের পূর্বে নয় (J. Kaplow. ed., New Perspectives on the French Revolution)। কব্যান আরও কয়েকটি নূতন প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর Wiles বক্তৃতাবলীতে। বুর্জোয়াশ্রেণী ৪ঠা ১১ আগস্ট, ১৭৮৯-তে কি সত্যই সর্বপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক করভারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল ? বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের মতে সর্বপ্রকার করই 'সামন্ততান্ত্রিক" পদবাচ্য নয়। শুধু যেগুলি ব্যক্তিগত দাসত্ব থেকে উদ্ভূত তাদেরই feudal dues আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ; যেগুলি তা নয়, তাদের feudal dues বলা চলে না। দ্বিতীয় ধরণের করভারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা কোন আপত্তি তোলে নি ; কারণ বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই তারা এধরণের কর আদায় করবার অধিকার কিনে নিতে থাকে। এগুলি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং রক্ষণীয় অথবা ক্ষতি পূরণের দাবীদার। দ্বিতীয়তঃ 'অভিজাত', 'বুর্জোয়া' ইত্যাদি অভিধার কোন গোঁড়া ব্যাখ্যা গবেষণা লব্ধ নূতন তথ্যের পরিপন্থী। ল্যাফভ্র নিজেই তা দেখিয়েছেন। অথচ তিনিই নূতন এক শ্রেণীর কথা তুলেছেন rural bourgeoisie বা গ্রামীন বুর্জোয়া। অধ্যাপক গুডউইনের মতে কব্যানের আপত্তি অসঙ্গত, কারণ বস্তুতঃ এরকম এক শ্রেণীর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কিন্তু সত্যই কি এই শ্রেণী বড় বড় জমিদারের নায়েব (grands fermiers), পত্তনিদার (fermiers), কৃষক ভূম্যধিকারী (labourieurs) ইত্যাদির সমাহার নয়? এদের মধ্যে কি সৌহার্দ্য বা শ্রেণী স্বার্থের ঐক্য বর্তমান ছিল? চার্চের যে জমি রাষ্ট্র নিয়ে নিল এবং পরে বিক্রী করল, তার অধিকার নিয়ে এদের মধ্যে কি কম মন কষাকষি হয়েছে? অবশেষে কবান জোর দিচ্ছেন—শক্তির জন্য লড়াইএর ওপর, আদর্শ নিয়ে সংঘাত শুধু এর ওপর সূক্ষ্ম এক আবরণ টেনে দিয়েছিল: "Primarily a political revolution, a struggle for the possession of power and over the conditions in which power was to be exercised. Essentially the revolution was the overthrow of the old political system of the monarchy and the creation of a new one in the shape of the Napoleonic State" (Cobban, The Social Interpretation of the French Revolution; The French Revolution, Orthodox and Unorthodox: A Revie of Reviews', History, June 1967)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লাব্রুস (La crise del'economie francaise a la fin l' Ancien Regime et au de´but de la Re´volution, 2 vols 1943), তার ফলে মিশেলে—তোক্‌বিলের পুরোনো বিতণ্ডার অবসান হয়েছে। মিশেলের মতে জনগণের দুর্দশাই বিপ্লবের কারণ, তোক্‌বিলের মতে ক্রমবর্দ্ধমান বিত্ত। লাব্রুসের সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনা উভয় মতকে একটা সামঞ্জস্য দান করেছে। তাঁর মতে ১৭৭৮ পর্যন্ত ফ্রান্সের জনগণের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হচ্ছিল। তখনই কৃষকরা জমি কিনতে থাকে, শিল্প গড়ে ওঠে, মজুরীর হার দ্রব্যমূল্যের সমানুপাতে চলে। কিন্তু ১৭৭৮ সালের পর এক মন্দা দেখা দিল। তার ফলে ছোট ছোট কৃষক ভূম্যধিকারী, মাঝারি ছোট পত্তনিদার, ভাগচাষী ও মজুর ব্যবসায়ীগণ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের এর বাণিজ্যচুক্তি হয় ১৭৮৬ সালে। ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী পণ্যের সঙ্গে

প্রতিযোগিতার ফলে ফ্রান্সের শিল্প মার খায়। প্যারিসে ও অন্যান্য বস্ত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্রে দেখা দেয় বেকার সমস্যা। ১৭৮৭-৮৯ সালের মধ্যে পর পর অজন্মার ফলে খাদ্যের মূল্য দারুণ বেড়ে যায়। যে সব শ্রমিকের তখনও কাজ ছিল, তারা মজুরীর অধিকাংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়। আর বেকার শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক ও ছোট জোতের মালিক (যারা বছরের অধিকাংশকাল খোলা বাজারে গম কিনত) সকলের কষ্ট চরমে ওঠে। আশ্চর্য্য নয় এই পরিস্থিতিতে অনেকেই জমিদার, বড় পত্তনিদার, তহশীলদার, খাদ্যপণ্য ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ, মজুতদার, টাইদ আদায়কারী ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি শোষক পরগাছাশ্রেণীর লোকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে এদের অবস্থা ভাল হচ্ছিল, শেষের দিকে খারাপ সুতরাং আশাভঙ্গ বিপ্লবী মনোভাবের জন্ম দেয়।

সহরের শ্রমিক, বেকার, ছোট দোকানদার, ইস্কুল মাস্টার, মদ-বিক্রেতাদের ওপর প্রতিক্রিয়া নিয়ে পৃথক আলোচনা করেছেন সবুল, কপে, কব ও টনেসন—এঁরা সবাই ছিলেন ল্যাফভ্রের শিষ্য। আলবার্ট সবুলের ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ Les Sans-culottes Parisiens en l' An II এবং ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত দুইখণ্ড ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস বিপ্লবকে "তলা থেকে দেখার" সার্থক প্রচেষ্টা। ১৯৬৩ সালের Science and Society পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় তিনি Classes and class struggle during the French Revolution নামক প্রবন্ধ লেখেন, তাও নব্য মার্ক্সীয় দৃষ্টীভঙ্গীতে বিপ্লব-ব্যাখ্যার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্সেও অভিজাত শ্রেণী এবং উচ্চতর বুর্জোয়া শ্রেণীর মৈত্রী সম্ভব হ'ত যদি রাজা ষোড়শ লুই বুদ্ধিমানের মত সে বিষয়ে অবহিত হ'তেন এবং অভিজাত ও উচ্চতর যাজক শ্রেণীর কিছুটা রাজনৈতিক বাস্তব জ্ঞান থাকত। ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্যসমস্যার ফলে যতই এখানে ওখানে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটতে লাগল এবং আগষ্ট মাসের বিধানের ফলে সামন্ততান্ত্রিক প্রাপ্যের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গিয়ে যতই অভিজাতরা কৃষকশ্রেণীর বিরোধিতার সম্মুখীন হ'ল ততই সমঝোতা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। উচ্চতর বুর্জোয়াদের মনেও ভয় জাগল। তাই তারা নাগরিকদের মধ্যে active ও passive দু'ভাগ করে দেয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে ভোটাধিকার এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেবার

অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এজন্যই ১৭৯১ সালের LeChapelier আইন পাশ হয়, যাতে শ্রমিকসংহতি ব্যাহত ও ধর্মঘট করার অধিকার নিষিদ্ধ হ'ল।

রাজার পলায়ন প্রচেষ্টা (২১ জুন, ১৭৯১) মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব এনে দিল। এদের মধ্যে ছিল সংস্কৃতিবান ব্যবহারজীবী ও সাংবাদিক এবং বাণিজ্যজীবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। এদের নেতা ছিলেন ব্রিসোৎ. (Brissot) ; যাঁর সহ ও অনুগামীদের জিরোদিন অভিধা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসার সর্বনাশ ঠেকাতে গেলে মুদ্রা (assignats) মান রক্ষা করতে হবে ; যুদ্ধ ও এ দের খুব অপছন্দ নয় কারণ অনেক কণ্ট্রাক্ট মিলবে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ এরা সঙ্গে সঙ্গে করেনি, কারণ নৌ যুদ্ধের ফলে ফরাসী সহরগুলির অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় দেখা দিতে পারে, উপনিবেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। ইউরোপে সীমাবদ্ধ যুদ্ধই এরা চেয়েছিল। তাতে অভিজাত দলন ও ইউরোপের অন্যত্র রাজতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা এক সঙ্গেই সম্ভব হবে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। ১৭৯১ সালের বসন্তে ফ্রান্সের একাধিক শোচনীয় পরাজয় ঘটল। প্রয়োজন হ'ল জনসাধারণের সমর্থন। প্রতিদানে যখন সাঁসকুলোটরা দ্রব্যমূল্যের দাম বেঁধে দিতে বললে, জিরোঁদিনরা তাতে রাজী হ'ল না। কারণ তা হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী। জ্যাকোবিন মধ্যবিত্ত ও সাঁসকুলোটদের আঘাতে রাজতন্ত্রে ফাটল ধরল (১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট)। এই আন্দোলনে জিরোঁদিনদের কোন স্থান ছিল না।

জ্যাকোবিন নেতৃত্বে জনসাধারণ ততদিন বুঝেছে যে জিরোঁদিন নেতৃত্বে যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। তারা উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তির চেষ্টা করছে। ৩১শে মে থেকে ২রা জুন (১৭৯৩) যে অভ্যুত্থান হয় তাতে জ্যাকোবিন মধ্য ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়ার পাশে দাঁড়াল সাঁসকুলোট। যুদ্ধে জেতার জন্য জ্যাকোবিন নেতৃত্ব হাত মেলাল সাঁসকুলোটদের সঙ্গে। ফল—জ্যাকোবিন স্বৈরতন্ত্র বা ত্রাসের রাজত্ব। এব্যাপারে যিনি নেতৃত্ব দিলেন তিনি রোবসপিয়ের। শ্রেণী বিরোধ কিন্তু শেষ হ'ল না। অনিবার্য্য ভাবে জ্যাকোবিন বুর্জোয়ার সঙ্গে বিরোধ বাধল

সাঁসকুলোট স্বার্থের। অন্তর্নিহিত বিরোধের পরিণতি হ'ল জ্যাকোবিনদের সর্বনাশে।

সবুল দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের ইতিহাসে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই থেকেই সাঁসকুলোটরা বারংবার একটা স্বাধীন অংশ গ্রহণ করেছে। তার বীজ নিহিত ছিল ১৭৮৯ এর পূর্বে দোকানদার, কারুশিল্পী ও মজুরদের অবস্থার দ্রুত অবনতিতে। তাদের প্রতিষ্ঠানভূমি ছিল আলাদা, সংগঠন ছিল আলাদা, সংগ্রাম পদ্ধতি ছিল আলাদা। জ্যাকোবিন ক্লাব ছিল জ্যাকোবিন বুর্জোয়াদের পাদপীঠ, আর প্যারিসের সেক্সান এবং পিপলস সোসাইটি ছিল সাঁসকুলোটদের পাদপীঠ। ১৭৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে হেবার্টের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল তা প্রধানতঃ সাঁসকুলোটদের নিজস্ব অভ্যুত্থান। বুর্জোয়া বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হ'লেও তার একটা নিজস্ব মূল্য রয়েছে। জ্যাকোবিন বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে, দায়ে পড়ে, খাদ্যমূল্যের নির্দিষ্ট বেঁধে দিয়েছে বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করেছে, স্বেচ্ছায় নয়। সাঁসকুলোটদের মনোভাব প্রাক্-ধনতান্ত্রিক মনোভাব, তাতে বুর্জোয়াকথিত অবাধ বাণিজ্য ও স্বাধীন উদ্যোগের কোন সমর্থন নেই। বুর্জোয়ারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে প্রকৃতিদত্ত অধিকার মনে করত, তাতে কোন সীমারেখা টানা যায় না, তা কারও কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। অন্য পক্ষে সাঁসকুলোটরা সব সময়ই সম্পত্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে চেয়েছে, সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছে। ১৭৯৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারা সম্পত্তির উর্দ্ধতম সীমা বেঁধে দেওয়ার দাবী জানিয়েছিল ; চেয়েছিল যে কোন ব্যক্তি যেন একটা কারখানা বা দোকানের বেশী না রাখতে পারে। এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। থার্মিডোরের প্রতিক্রিয়ায় জ্যাকোবিন-সাঁসকুলোট জোট ভেঙে গেল।

তাহলে কি বুর্জোয়াবিপ্লবের মধ্যে সর্বহারা বিপ্লবেরও সম্ভাবনা নিহিত ছিল ? গেরিন (Guerin) এর এই "ট্রটস্কিপন্থী" মতবাদের বিরোধিতা করেছেন সবুল। তাঁর মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাঁসকুলোটদের বিংশ শতাব্দীর শ্রমিকের বিকল্প মনে করা ভুল হবে। "This is to make a proletrian advance guard of what was nothing but a rear guard defending the positions of traditional

economy।" সবুল আরো স্বীকার করেছেন যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দরিদ্র চাষীদের প্রতিরোধের ফলে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ জয় লাভ করতে পারে নি। গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়ারা জয়ী হয়েছিল কিন্তু প্রাক্তন গ্রামসমাজ বিনষ্ট হয় নি। তবে বড় বড় পত্তনিদার ও ভূম্যধিকারী কৃষকের এবং দরিদ্র কৃষকের মধ্যেকার বিরোধ আরো জোরদার হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সর্বহারা দিন মজুরে পরিণত হয়। এই বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটে ১৮৪৮ সালে।

সবুলের মত জর্জ রুদে ও সাঁসকুলোটদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, "The crowd in the French Revolution গ্রন্থে (১৯৫৯)। বাস্তিল আক্রমণের সময় থেকে বিপ্লবের প্রতি পর্বে বহুশার জনসাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামায় (journées) লিপ্ত হয়েছে। বার্ক তাদের "নিষ্ঠুর গুণ্ডা ও নরহন্তা" আখ্যা দিয়েছেন ; কার্লাইলের ভাষায় তারা "সর্বগ্রাসী চিতাগ্নি", "বিজয়ী নৈরাজ্য" তেইন তাদের বলেছেন "contre—bandiers, foux souniers···vagabonds···"এরা আসলে কারা ? এদের খবর আছে পুলিশের দপ্তরে বা Committee of General Security-র দপ্তরে। রুদে তার থেকে এদের সংগঠন প্রণালী, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম সম্বন্ধে একটা আদরা প্রস্তুত করেছেন। সবুলের Sans-culottes সম্বন্ধে কাজের পরিপূরক এই গ্রন্থ। বিশেষ করে রুদে জোর দিয়েছেন রুটির দামের হ্রাস বৃদ্ধির ওপর। বেকার সমস্যা সে অগ্নিতে ইন্ধন জোগায়! মনে রাখতে হবে বাস্তিলের পতনের পূর্বে ৪ পাউণ্ড রুটির দাম ১৪॥০ সুতে দাঁড়িয়েছিল এবং এবং কার্য্যরত শ্রমিকদের আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী রুটি কিনতে ব্যয়িত হ'ত। বাস্তিল যারা দখল করেছিল (Vainqueurs de la Bastille) তাদের তালিকা থেকে রুদে দেখিয়েছেন কয়েকজন শিল্পপতি বণিক ও সেনাপতি ছাড়া অধিকাংশই ছোট ব্যবসায়ী ও কারু শিল্পী। মজুরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এদের ভবঘুরে বলা ভুল হবে। এদের অনেকেই প্যারিসীয় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভের্সাই অভিযানের পেছনে রুদে দেখিয়েছেন বেকার সমস্যা এবং মজুরীর হার বৃদ্ধি বা কারখানা-দোকানের খাটুনির সময় নিয়ে নানা অসন্তোষ। চটি, পরচুলা, জুতো, ওষুধ, যারা তৈরী করত, দর্জি এবং বাড়ীর চাকর, ঝি সবাই ছিল এর মধ্যে।

রুটির দোকানদাররা গম পাচ্ছিল না। তাদের দোকান বারংবার আক্রান্ত হচ্ছিল। বাকীরা রুটি পাচ্ছিল না। এদের উস্কে দেয় দেশমুলিনস্, দাঁত, ইত্যাদি।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৭৯২ সালের জুলাই ও আগষ্টে যারা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায় তাদের নেতৃত্ব দেয় ফবুর্গ সাঁ। আঁতোয়ানের গরীব প্যারিসীয় নাগরিক। ১০ই আগষ্ট যারা তুইলারীস প্রাসাদ আক্রমণ করে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বাড়ীর চাকর, পোর্টের শ্রমিক, গাড়োয়ান, কাঁচশিল্পের মজুর, জার্মিনেন, মাষ্টার ক্রাফটস্‌মেন, দোকানদার।

কিন্তু এই আগষ্ট বিপ্লবে ভোট ছাড়া কিছুই পেলনা সাঁসকুলোটরা। তারা কনভেনশ্যানের কাছে দাবী করল কাজ দিতে হবে, রুটি দিতে হবে। ১৭৯৩ সালে আবার বাড়ছিল রুটির দাম, চিনির দাম, মোমবাতির দাম, সাবানের দাম। সব গুলি প্যারিসীয় সেকশানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জিরোদিন, জ্যাকোবিন, বুর্জোয়া ও জনসাধারণের মধ্যকার ফাটল আরো বাড়ে। ফেব্রুয়ারী মাসে দোকানে দোকানে হামলা হয়—জোর করে জিনিষের দাম কমান হয়। চিনির দাম ৪৭-৬০ স্থ থেকে নামানো হয় ১৮—২৫ স্থতে, সাবানের দাম ২৩-২৮ স্থ থেকে ১০-১২ স্থতে। অবশ্য অসামাজিক লুটেরার দল যে এদের মধ্যে একেবারে ছিল না তাও নয়। এরা আক্রমণ করেছিল বড় বড় ব্যবসায়ীর মজুতদারের গোলা, যারা জিনিষপত্র গোপন করে কালোবাজারে বেচছিল। বলাবাহুল্য হাঙ্গামার ফলে কিছু ছোট দোকানদারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কনভেনশ্যান এর নিন্দা করে এবং এর পিছনে প্রতিক্রিয়ার হাত লক্ষ্য করে, অঁরাজে-খ্যাত জ্যাক রোক্স (Roux) কে দায়ী করা হয়। মারাট এই সময় থেকে অসন্তুষ্ট সাঁসকুলোটদের প্রতিভূ হন। উত্তেজিত জনতার শোভাযাত্রা ও মহিলাদের আক্রমণে বাধ্য হয়ে কনভেনশন ময়দা ও রুটির মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ পাশ করে (First law of the Maximum)। অঁরাজে দল এতেও সন্তুষ্ট হয় না।

এবার এদের কাজে লাগালো জ্যাকোবিন দল জিরোঁদিনদের গদীচ্যুত করতে। তবে সাবধানে। জ্যাকোবিন নেতৃত্ব জনসাধারণকে অঁরাজে বা হেবার্ট কারুর হাতে ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। ৩১ মে-জুন (১৭৯৩)

এদেরই ক্ষেপিয়ে দিয়ে জ্যাকোবিনরা জিরোদিন নেতাদের জব্দ করল। কিন্তু খাদ্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ও মুদ্রামানের নিম্নগতি অব্যাহত রইল। সেপ্টেম্বরে এদের চাপে প্রতি সেক্শানের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সাঁকুলোটরা ৪০ স্যু করে পাবার ব্যবস্থা হ'ল এবং বিহু বিঘোষিত বৈপ্লবিক বাহিনীর (armée revolutionnaire) পত্তন হ'ল। এই বাহিনী জ্যাকোবিন রাজত্বের যন্ত্র হিসেবে গ্রামাঞ্চল থেকে গম, মাংস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্যারিসে নিয়ে আসতে লাগল। ২৯শে সেপ্টেম্বর কনভেনশ্যন Maximum General এর আইন পাশ করতে বাধ্য হ'ল যা বহু দ্রব্যের উর্দ্ধতম মূল্য বেধে দিল, মজুরীর হারও। ১লা নভেম্বর এর খানিকটা অদলবদল হয় জ্যাকোবিন—সাঁকুলোটদের সম্মিলিত শক্তির ওপর দ্বিতীয় বৎসরের বৈপ্লবিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সবুল দেখিয়েছেন যে এই প্রথম সেকশানের সভায়, রেভল্যুশনারি কমিটি ও কম্যুনের সভায় সাঁকুলোটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল।

কিন্তু সরকার বেশীদিন মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে পারল না। মফস্বলের উৎপাদক ও মধ্যস্থরা কালোবাজারে বেচবার আশায় মাল লুকিয়ে ফেলতে লাগল কিংবা পাইকারী ব্যবসাদারদের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা করতে লাগল। এর একমাত্র ফল—প্যারিসের ক্রেতাদের বেশী দাম দিতে হল, শুধু মাংসের জন্যই বেঁধে দেওয়া দামের ২৫-৫০ স্যু বেশী। মাখনের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল পাউণ্ড প্রতি ২২ স্যু, কালোবাজারে তা বিক্রী হ'ল ৩৬-৪৪ স্যু'তে। দুটো পথ খোলা ছিল সরকারের হাতে (১) ত্রাসের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া, (২) গ্রামাঞ্চলের চাষী ও উৎপাদকদের সঙ্গে একটা সমঝোতা, অর্থাৎ আইনের কঠোরতা কমিয়ে তাদের লাভাংশ বাড়িয়ে দেওয়া। শেষেরটা করা হ'ল। উগ্রপন্থী হেবার্টের দলকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হ'ল। রেভল্যুশনারি আর্মিকে এপ্রিল (১৭৯৪) মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। গ্রামাঞ্চলে মজুতদার-কালোবাজারীদের ধর'র জন্য যে সব সমিতি করা হয়েছিল তারাও লুপ্ত হ'ল। মার্চের শেষে সরকার দ্রব্যের উর্দ্ধতমমূল্য পুনর্নিধারণ করল উৎপাদকের লাভের প্রতি নজর রেখে। শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের বিধান জোর করে চালু করা হ'ল, ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের বন্দী করা হতে

লাগল এবং তাদের সংহতি শ্যাপেলিয়ারের বিধান প্রয়োগে ব্যাহত করা হ'ল। জুন জুলাই (১৭৯৪) মাসে রাজমিস্ত্রী, কুমোর, অস্ত্র কারখানার শ্রমিক মজুরী বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। উত্তরে প্যারিস কম্যুন যে নূতন হার maximum des salaires ঘোষণা করে তাতে মজুরীর হার প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

রোব্‌সপিয়ের সরকারের বিরোধী প্লেনের (Plain) এর সভ্যরা এ সুযোগ নিল। ফ্লুরাসের জয়ের পর প্লেন ত্রাসের কোন প্রয়োজন আছে মনে করত না। তদুপরি আরম্ভ হয়েছিল পাবলিক সেফটি ও জেনারেল সিকুইরিটি এই দুই কমিটির অন্তর্বিবাদ। ৯ই থার্মিডর রোব্‌সপিয়ের ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল এবং রোব্‌সাপিয়ের তাঁর পশ্চাতে সাঁসকুলোট বাহিনীকে দেখতে পেলেন না।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধেও বিপ্লব-বিষয়ক গবেষণার সকল দিকের ওপর আলোক-পাত করা গেল না। একটা মোটামুটি ধারণা বোধহয় দেওয়া গেছে। ঐতি-হাসিকগণ যে কোন একটা বিশেষ মতবাদ আঁকড়ে বসে নেই, প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন এটা আশার কথা। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে মতভেদ থাকা শুধু স্বাভাবিক নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে। সত্য সিদ্ধান্তে কোনদিন পৌঁছানো যাবে কিনা জানি না কিন্তু রহস্যময়ী বলেই ত ইতিহাসের দেবী ক্লিওর আকর্ষণ এত বেশী।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সংস্কৃতি-চর্চা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ব্যবসাদারির আওতার মধ্যে পড়ে না। বরং অনেক সময় দেখা যায় এই অনুশীলন আর ব্যবসাদারিতে প্রায় সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এই কারণেই একটা বিদেশী কোম্পানী এখানে ব্যবসা করতে এসে যখন দেশ শাসন করতে শুরু করেছিল তখন বহুকাল এদেশের শুধু ধনভাণ্ডারের উপরেই নিবদ্ধ ছিল তার লুব্ধ দৃষ্টি, জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে সে ফিরেও তাকায় নি। তাকালে হয়তো ঐহিক লাভের ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে ভেবে এদেশে মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক সময় শুধু ঘোরতর আপত্তিই জানায় নি, প্রবল বাধাও দিয়েছিল। ১৭৮৩ সালের পার্লামেণ্টের আইন অনুযায়ী যে-কোনো ইংরেজকে ভারতের মাটিতে পা দিতে হলে ছাড়পত্র নিতে হত। বিনা ছাড়পত্রে ভারতে এলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, ফিরতি জাহাজেই ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। উইলিয়াম কেরীকেও এদেশে আসার ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। অনেক ফন্দি করে ডেনমার্কের একটা জাহাজে চড়ে তিনি এখানে আসেন। আসার পর বেশ কিছু কাল তাঁকে চরম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্য পরে কোম্পানীর মত বদলায়। তখন মিশনারীরা যেমন বিনা বাধায় ধর্মপ্রচার শুরু করেন তেমনি কয়েকজন য়ুরোপীয় যথার্থ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করেন এ দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। তাঁদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের সামনে প্রাচ্য বিদ্যার রত্ন ভাণ্ডারের দ্বার খুলে যায়। কিন্তু এক সময় ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচ্যবিদ্যার গৌরবের কথা আমরা নিজেরাই ভুলতে বসেছিলুম। পাশ্চাত্য সভ্যতার জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে উন্মত্ত হয়েছিলুম পরকীয়া প্রেমের রসোল্লাসে। 'পর কৈনু আপন, আপন

কৈসু পর'—নীতিকে নির্বোধের মতো প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলুম ব্যবহারিক লেন-দেনের জগতে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির আকর্ষণকে কলকাতার ঠাকুর-পরিবারও তুচ্ছ করতে পারেন নি। তুচ্ছ করার মতো নির্বুদ্ধিতাও তাঁদের ছিল না। বরং ও-দেশের চিন্তা ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরে গিয়ে সেগুলিকে এমন সার্থকভাবে যাচিয়ে নিতে বোধ হয় এ দেশের আর কোনো পরিবারই পারেন নি। কিন্তু সেই জন্যে আপনাকে পর করতে হয় নি। আপন-পরের আশ্চিক মিলন সাধনের মধ্যেই ঠাকুর পরিবারের মহান কর্মসিদ্ধি।

ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে পঞ্চানন কুশারীই প্রথম পঞ্চানন ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন। যশোর ছেড়ে এসে গোবিন্দপুরে তিনি বেশ কিছুকাল বসবাস করেন। এবং সেখানে বিষয়-সম্পত্তিও কিছু করেছিলেন। নতুন কেল্লা তৈরির প্রয়োজনে কোম্পানী গোবিন্দপুরে অবস্থিত পঞ্চাননের বসতবাটী ও মন্দির দখল করে নেন। তার বদলে পঞ্চাননের পরিবারকে অন্য জমি দেওয়া হয়। বর্তমান ধর্মতলা অঞ্চলে ও কেল্লার কাছে পঞ্চানন-পুত্র জয়রামের কিছু ভূ সম্পত্তি ছিল ১। কেউ কেউ মনে করেন জয়রামই প্রথম পাথুরিয়াঘাটায় গঙ্গার কাছে জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি করেন এবং তাঁর সময় থেকেই পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর পরিবারের বসবাস শুরু হয়। কিন্তু এ তথ্য নির্ভুল নয়। অনেকে মনে করেন জয়রামের পুত্রদের সময় থেকেই এই বসবাসের আরম্ভ। তাঁর চার পুত্র—আনন্দী রাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম।২ এঁদের মধ্যে গোবিন্দরাম নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

নীলমণি ইংরেজ সরকারের অধীনে সেরেস্তাদারের কাজ করতেন। তবে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। দর্পনারায়ণ ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে অন্যতম। ঐশ্বর্যের অনেকটাই তাঁর স্বোপার্জিত। নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্যও করেছেন, চন্দননগরে ফরাসী সরকারের অধীনে কাজও করেছেন। ইংরেজ ও ফরাসী উভয় সরকারের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর অপরিসীম আস্থা নিয়ে কাজ করতেন বলেই বোধ হয় প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হতে পেরেছিলেন।

নীলমণির সঙ্গে দর্পনারায়ণের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে একটা বিরোধ দেখা দেয়; এবং শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় এসে দুই ভাই আলাদা হয়ে যান। দর্পনারায়ণ পাথুরিয়াঘাটাতেই থাকেন এবং নীলমণি জোড়াসাঁকোয় নতুন বাড়ী তৈরী করে উঠে যান। শোনা যায়, জোড়াসাঁকোর জায়গাটা নাকি তিনি পেয়েছিলেন বৈষ্ণবদাস শেঠের কাছ থেকে।

যা হোক, এই সময় থেকেই ঠাকুর-পরিবার দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল। কারো কারো মতে চোরবাগানের ঠাকুর পরিবারের ধারাও একই বংশোদ্ভূত।৩ কিন্তু পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ধারা দুটিই জগদ্বিখ্যাত। দুটি ধারাই এক সঙ্গে এগিয়েছে। দুটি ধারার মধ্যেই পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান মনীষীর অবির্ভাব ঘটেছে। অথচ মনে হয় একটি যেন অতীত, অপরটি বর্তমান; একটির কথা ভুলতে বসেছি, অপরটির কথা আমাদের স্মৃতিলোকে ঝলমল করছে। জোড়াসাঁকোর বংশধারার বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্তিতে পাথুরিয়াঘাটার বংশধারার প্রতিভা ম্লান হয়ে গেছে। তা ছাড়া জোড়াসাঁকোর বংশধারায় যে বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ দেখা গেছে পাথুরিয়াঘাটার বংশধারায় তা ছিল না। এমন কি সে মনোভাবের প্রতি সমর্থনও বিশেষ প্রকাশ পায় নি। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল্যকে উপলব্ধি করলেও এবং তার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ থাকলেও এই ধারা ছিল কিছুটা রক্ষণশীল। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগত বিধি-নিষেধের প্রতি এই ধারার আনুগত্য ছিল অটুট। তবু এই ধারার মধ্যে যে-কজন বিশিষ্ট প্রতিভাবান মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের কথা মনে রাখা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কারণ বাংলার, তথা ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও যথেষ্ট।

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের দুই পত্নী—প্রথমা তারিণী বা তারাসুন্দরী এবং দ্বিতীয়া বদনমণি। দু'জনেই যশোরের মেয়ে। যশোরের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের বৈবাহিক যোগসূত্র পুরুষানুক্রমিক। এবং এই যোগসূত্র উভয় ধারাতেই সমান প্রবল ছিল। যশোরের চাঙ্গুটিয়া, দক্ষিণডিহি প্রভৃতি অঞ্চলের কন্যারা ঠাকুর-পরিবারে বধূ হয়ে আসতেন। এটা তাঁদের পারিবারিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা হোক, দর্পনারায়ণের দুই পত্নীর

গর্ভে সাত পুত্র ও দুই কন্যা জন্মেছিলেন। প্রথমার গর্ভে - রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও পিয়ারীমোহন ; এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে — লাড্‌লীমোহন, মোহিনীমোহন, রাই মণি ও নিমাই মণি। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য হলেন গোপীমোহন (১৭৬১-১৮১৮)। তিনি ছিলেন সেকালের একজন সুশিক্ষিত রুচিবান পুরুষ যাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে এবং স্বজাতির উন্নতি মূলক বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টায় এই ধারার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকালের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। লোকে নাকি বলতো. তিনি কখনো এক লক্ষ টাকা পাশে না নিয়ে বসতেন না। ফারেল্ সাহেব মন্তব্য করেছেন, তাঁর মণিমুক্তা খচিত গড়গড়া ও পানদানের দামই বোধ হয় এক লক্ষ টাকা ছিল। গোপীমোহন যদি শুধুই ধনকুবের হতেন তাহলে তাঁর কথা আমরা বিনা দ্বিধায় বিস্মৃতির গর্ভে ফেলে দিতে পারতাম। কিন্তু তাঁকে আমরা দেখেছি অন্ধ-সংস্কার মুক্ত গুণী কর্মী হিসাবে, দেশ যাঁকে পেয়ে কম লাভবান হয় নি। সুগভীর পাণ্ডিত্য তাঁর না থাকলেও ছ'টি ভাষায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন—সংস্কৃত, উর্দু, পারসী, পর্তুগীজ. ফরাসী ও ইংরেজী। তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবে প্রতি বছর ভারতীয় ও অভারতীয় বহু ধনী ও গুণীসমাবেশ ঘটত। এমন কি, চিৎপুরের নবাবও আমন্ত্রিত হতেন। মূলাজোড়ে বারটি শিবমন্দির সমেত কালীমন্দিরটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু গোপীমোহনকে আমরা বিশেষভাবে মনে রাখব দুটি কারণে—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর দান ও সক্রিয় সাহায্যের জন্যে এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রয়াসের জন্যে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। তাঁর নামে একটি বৃত্তিও দেওয়া হত।

গোপীমোহন ছিলেন একজন প্রকৃত সঙ্গীত-প্রেমী। কলকাতার অনেক ধনী পরিবারেই সেকালে সঙ্গীতের প্রতি একটা মোহ, একটা বিলাস জন্মেছিল। কিন্তু ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গীত-চর্চা সঙ্গীত বিলাস ছিল না। কোনো মোহের আক্রমণে এ বিষয়ে তাঁদের নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যায় নি। গোপীমোহনের বাড়িতে সঙ্গীতের আসর বসত প্রায়ই। সেকালের ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বাড়িতে আসতেন। গোপীমোহন তাঁদের সসম্ভ্রম অভিনন্দনে

আপ্যায়ন করতেন। সেকালের দুজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী—সজ্জু খাঁ ও লালা কেওয়াল কিষণ তাঁর কাছ থেকে মাসিক বৃত্তি পেতেন। শুধু সঙ্গীতজ্ঞ নয়, কবি-সাহিত্যিকদেরও তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। কবি কালিদাস মুখোপাধ্যায় ('মির্জা' নামে পরিচিত) ও কবি লক্ষ্মীকান্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

গোপীমোহনের ছয় পুত্র—সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার (ইনি গোপীমোহনের পরে হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক হয়েছিলেন), নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার এবং প্রসন্নকুমার। এঁদের মধ্যে হরকুমার (১৭৯৮–১৮৫৮) ও প্রসন্নকুমারের (১৮০১-৬৮) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুজনেই চিৎপুরের সের্‌বোর্ণ সাহেবের স্কুল থেকে প্রাথমিক ইংরেজী শিক্ষা করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও এখানেই পড়তেন। এখানকার পাঠ শেষ করে তাঁরা ভর্তি হন হিন্দু কলেজে, এবং প্রগতিশীল পাশ্চাত্য ভাব-চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হন। কিন্তু পরিণত জীবনে দুজনের প্রকৃতি, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে উঠে। একজনের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে ভাব-কল্পনা আর একজনের মধ্যে অসাধারণ কর্মপ্রবণতা। হরকুমার রইলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতের জগতে আর প্রসন্নকুমারের অসাধারণ বিচক্ষণতা ফুটে উঠল আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে। বিশেষ করে এই দুটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান প্রসন্নকুমারকে কর্মজগতে দুর্লভ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদের তিনিই প্রথম ভারতীয় সভ্য। মনে হয় তাঁর মতো পসার সেকালে আর কোনো আইনজীবীর ছিল না। যখনই তাঁর সহকর্মীরা আইন-সংক্রান্ত কোনো জটিলতার সম্মুখীন হতেন, প্রসন্নকুমার ছিলেন যেন সচল গ্রন্থাগার। প্রকৃতই আইন শাস্ত্রে, বিশেষ করে হিন্দু আইনে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এবিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও তিনি লিখে-ছিলেন। সেগুলির মধ্যে ইংরেজী **'Table of Succession according to the Hindu Law of Bengal'** এবং বাংলা 'নিয়ম-পত্র' গ্রন্থদুটি ও বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদ-চিন্তামণি'-র অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁরই টাকার পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে **Tagore Law Professor** পদটি তৈরী হয়।

হিন্দু কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের বংশগত দায়িত্ব ছিল। এই পরিবারের একজন কলেজের অন্যতম পরিচালক হিসেবে মনোনীত হতেন এবং গোপীমোহন ঠাকুরের সময় থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছিল। লর্ড ডালহৌসির আমলে যখন কলেজটির আভ্যন্তরীণ কিছু কিছু পরিবর্তন ও নামান্তর সাধিত হয়—হিন্দু কলেজ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ — সে সময় প্রসন্নকুমার সানন্দে সরকারের হাতে তাঁদের বংশগত দায়িত্বভার তুলে দেন। দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্যে প্রসন্নকুমার নানা ভাবে চেষ্টা করেন। স্কুল-কলেজে শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় নিয়মকানুন রচনার ব্যাপারে ১৮৪১ সালে 'জেনারেল কমিটি অব্ পাব্লিক্ ইনস্ট্রাক্শন্'-এর পক্ষ থেকে এক প্রচেষ্টা দেখা দেয়। প্রসন্নকুমার তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্যের বিশুদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধিকে ভারতবাসী যদি তার মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তবেই তা সার্থক হবে। এই জন্যেই তিনি মনে করতেন, ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতেও মাতৃভাষা-চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে তাঁর প্রচুর অর্থদানের কথা অনেকেই জানেন। এ ছাড়া অন্যান্য জনহিতকর কাজেও তাঁর উদার প্রশংসনীয় মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল।

সে সময় বাংলা দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। এই বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে সেদিন তিনটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, চিরাগত সামাজিক অভ্যাস ও সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা; দুই, পাশ্চাত্যের চিন্তাবুদ্ধির আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অথচ প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা এবং তিন, সমাজের জীর্ণ কাঠামোর উপরে নতুন করে রং-মাটি না চাপিয়ে নতুন কাঠামোয় সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা। প্রাচীন-পন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় চিরাগত ধর্মীয় সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরে রাখতে চাইলেন, আর তাঁদের এই অন্ধ মোহকে দূর করে সমাজকে নতুন রূপ দিতে চাইলেন রামমোহন। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগীদের মধ্যে দ্বারকানাথ, তারাচাঁদ প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের নামও আমরা স্মরণ করতে পারি। বয়সে যদিও প্রসন্ন কুমার রামমোহনের চেয়ে প্রায় সাতাশ বছরের ছোট,[৪] কিন্তু রামমোহনের সংস্কার

আন্দোলনের সময় তিনি যুবক। এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। প্রসন্নকুমার ও হরকুমার ছাড়া পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের মধ্যে আর কেউ সেদিন রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে আবার প্রসন্নকুমারের ওপর রামমোহনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। এ সম্পর্কে ফারেল সাহেব মন্তব্য করেছেন—

"At an early age Prasanna Coomar came under the influence of Ram Mohun Roy; and as in the case of Dwaraka Nath Tagore, the consequence was a radical change in the religious views in which he had been brought up."৬ বংশগত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের গণ্ডীকে অনায়াসে অতিক্রম করে নব ধর্ম-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন প্রসন্নকুমারের নতুনত্ব বিলাসী মনোভাবের পরিচয় নয়। একেশ্বরবাদে যথার্থ বিশ্বাস নিয়েই তিনি এগিয়ে ছিলেন, এবং ব্রহ্মবাদীদের মতো 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর তত্ত্ব দেশবাসীকে বোঝাতেও চেয়েছিলেন; 'An appeal to his countrymen, by Prosunna Coomar Tagore'—পুস্তিকাটিই তার প্রমাণ।

সংস্কার পন্থীদের মধ্যেও দু ধরণের মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেও একদল সংস্কার-পন্থী হিন্দুত্বের গোঁড়ামীকে বা হিন্দুশাস্ত্রের তথাকথিত বিধিনিষেধগুলিকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারলেন না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবার, শোভাবাজারের দেব-পরিবার প্রভৃতি কয়েকটি পরিবার এই দলভুক্ত, আর একদল সংস্কার পন্থী হিন্দুত্বকেই সংস্কার করতে চাইলেন—অর্থহীন গোঁড়ামী ও নির্মম বিধি-নিষেধেগুলির হাত থেকে হিন্দুদের মুক্তি দিতে চাইলেন। রামমোহন রায়ের অনুগামীরা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি এই দলভুক্ত। আসলে এই দলটি সেকালের তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী। প্রসন্নকুমার প্রথম দলের সংস্কার-পন্থী হলেও তার মনোভাবের সযোগ ছিল দ্বিতীয় দলের সঙ্গে; এবং এ ব্যাপারটা তাঁর উপর রামমোহনের সাক্ষাৎ প্রভাবের ফল।

যা হোক, সংস্কার-পন্থীদের কাজের শুরু থেকেই দেশে একদল নবীন-পন্থীর আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষা

ও ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কলেজেরই একদল প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র সে দিন সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা ছিলেন ভেঙ্গে গড়ার পক্ষপাতী। তাই তাঁদের শাণিত যুক্তি—চিন্তার আঘাতে প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তি পর্যন্ত সে দিন নড়ে উঠেছিল। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে আজ আমরা সেই আঘাতের মূল্য বিচার করতে পারি বটে, কিন্তু সেদিন এর ফলে সংস্কার পন্থীরাও বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৩১ সালের গোড়ার দিকে রমানাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় প্রসন্নকুমার 'রিফর্মার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই বছরেই মে মাসে নবীন-পন্থীদের মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'এনকোয়ারার' পত্রিকা প্রকাশ করে 'রিফরমার'-এর সঙ্গে রীতিমতো লড়াই শুরু করে দেন।[৮] কিন্তু 'রিফর্মার' তখন সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা। এতে শুধু সামাজিক সমালোচনাই থাকত না, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনাও স্থান পেত। সে যুগের রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রসন্নকুমার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৪১ সালে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রকৃতই—"Like Dwarika Nath Tagore he was essentially a man of action."[৯]

কিন্তু হরকুমার ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বাইরের কর্ম জগতের সঙ্গে তিনি কোন দিন ঘনিষ্ঠ হন নি। সে ইচ্ছাও বোধ হয় তাঁর ছিল না। সাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চা নিয়েই তিনি থাকতেন। আর পিতা গোপীমোহনের মতো তাঁর শুধু মনেই সুর ছিল না, কণ্ঠেও ছিল। সেকালের প্রখ্যাত সঙ্গীত কলাবিদ্ হাসুখাঁর কাছে নিয়মিত তালিম নিয়ে তিনি রীতিমতো গায়ক হয়ে ওঠেন। তা ছাড়া সেতারেও তাঁর ভালো হাত ছিল। পিতার সঙ্গীত-প্রীতি পুত্রের মধ্যে সঙ্গীত সাধনায় পূর্ণতা লাভ করে।

সেকালের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবেও হরকুমারের বিশেষ সুনাম ছিল। ইংরাজী ছাড়া সংস্কৃত ও ফার্শী ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। এই দুটি ভাষাতেই তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। ইংরাজী ভাষা-সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবেই বিখ্যাত হন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন বিখ্যাত অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি

ছিলেন তাঁর সংস্কৃতের শিক্ষাগুরু। সে সময় বেদান্তদর্শন-চর্চাকে অনেক গোঁড়া হিন্দু বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা মনে করতেন এই চর্চার ফলেই একদল লোক হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে নতুন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন শুরু করেছেন। অথচ হরকুমারের বেদান্তদর্শন-চর্চাতেই আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। এ ব্যাপারে আত্মীয়দের কাছ থেকে গঞ্জনাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। একটি ঘটনা বলছি। হরকুমারের খুড়তুতো ভাই উমানন্দন ঠাকুরের বাড়িতে একদিন তিনি বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। উমানন্দন তাঁর বেদান্ত-চর্চার খবর আগেই পেয়েছিলেন। তিনি হরকুমারকে বললেন, 'দেখ হে, তোমার বেদান্তচর্চার খবর পেয়ে আমি কিন্তু খুবই দুঃখ পেয়েছি।' হরকুমার জানতে চাইলেন, বেদান্তচর্চা দুঃখের কারণ হয় কী করে। উমানন্দন বললেন, 'আমরা তোমাকে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলেই জানি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এই জ্ঞান-চর্চা তোমাকে নির্ঘাত নাস্তিক করে তুলবে।' (নাস্তিক বলতে বোধহয় ব্রাহ্ম হওয়ার কথাই উমানন্দন বোঝাতে চেয়েছিলেন)। হরকুমার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, 'কিন্তু ভুলে যেও না ভাই, ব্যাসদেব—যিনি বেদান্তদর্শনের জনক তিনি পুরাণও রচনা করেছিলেন; তাহলে তোমার মত অনুযায়ী তিনি তাঁর সময়ের সব চেয়ে বড় বিধর্মী।'[৮]

যা হোক, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে প্রসন্নকুমারের মতো ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সমর্থন হরকুমারের কাজকর্মে প্রকাশ না পেলেও এই ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল।

হরকুমারের দুই পুত্র—মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন (১৮৩১-১৯০৮) এবং রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন (১৮৪০-১৯১৪)। বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় দু জনেরই অবদান যথেষ্ট। আজ দেশের চারিদিকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-চর্চার প্রশংসনীয় আয়োজন দেখা যাচ্ছে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, বহু সঙ্গীত সম্মিলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমন কি আমাদের জাতীয় সরকারও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অথচ আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে এদেশের শিক্ষিত-সাধারণের মন থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞাকে দূর করবার জন্যে, সমস্ত বিশ্বের

সামনে আমাদের এই সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যিনি প্রথম ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিয়েছিলেন সেই শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মানের দিক থেকে যতীন্দ্র-মোহন ও শৌরীন্দ্র মোহন তাঁদের পিতৃপিতামহকে অনেক ছাড়িয়ে গেছেন। পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবকে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণকে সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে। তাই দেখা যায় ইংরাজী শিক্ষা, রাজপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা রাজকীয় সম্মান তাঁদের স্বাজাত্য বোধকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। হরকুমারের এই দুই পুত্রের সম্বন্ধে লোকনাথ ঘোষের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

"The most creditable trait in the character of both is that neither their high mental culture nor their free unrestrained intercourse in the highest circle of European society has shakened or even weakened their orthodoxy in thier national faith nor tempted them to swerve from a strict adherence to national habits and customs". ৯

হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে তাঁরা দুজনেই ইংরাজী ভাষা সাহিত্যে সুন্দর জ্ঞান অর্জন করেন। এই কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডি. এল. রিচার্ডসন্ ছিলেন যতীন্দ্র মোহনের গৃহশিক্ষক। কিন্তু ইংরাজী-চর্চার সঙ্গে সংস্কৃত-চর্চাও চলেছিল সমান তালে। আর সেই সঙ্গে ছিল বাংলা সাহিত্যানুশীলনের নতুন প্রেরণা ও উদ্যম। সে সময়টা বাংলা নাটকের আদিযুগ। ইংরাজী আদর্শ সামনে রেখে বাংলা নাটক লেখা ও তার অভিনয়ের ব্যাপারে কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত পরিবারে সে সময় যে প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তার আলোচনা এখানে অবান্তর হলেও একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে পাথুরিয়া-ঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের দুটি ধারার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলার নাট্য আন্দোলন সে দিন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"পাইকপাড়ার

রাজাদের পর বাংলা নাট্যাভিনয়ে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন ঠাকুর পরিবারের দুই তরফ -- পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার অনুজ সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং জোড়াসাঁকোর গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদনুজ গুণেন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুর এবং ইহাদের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" ১০

সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে যতীন্দ্রমোহন অনুজের মতো পৃথিবীবিখ্যাত ছিলেন না বটে তবু সঙ্গীতে তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। শুধু হিন্দু সঙ্গীতে নয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও। বাংলা গানের সঙ্গে অর্গান অথবা হারমনিয়ামের ব্যবহার তিনিই প্রথম শুরু করেন। ঐকতান বাদ্যের সাহায্যে অভিনয়ের সময় আবহ সঙ্গীতের যে নতুন পরিকল্পনা তিনি রচনা করেন অল্পকালের মধ্যেই তার ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়।

যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্য-চর্চা তাঁকে উঁচু দরের প্রতিষ্ঠা দেয় নি এ কথা ঠিক, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁর আন্তরিক অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। গানও কিছু লিখেছেন। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের কয়েকটি গান তাঁরই লেখা। ১১ আর লিখেছেন বিদ্যাসুন্দর নাটক। তাঁর এই একটি নাটকই তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহনের চেয়ে সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষক যতীন্দ্রমোহনই বেশি প্রশংসার দাবি করতে পারেন। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক প্রীতিবন্ধনের কথা আমরা জানি। সে বন্ধুত্ব শুধু পারস্পরিক কুশল আদান-প্রদানের মধ্যেই আড়ষ্ট হয়ে থাকে নি—যুগস্রষ্টা কবির কাছে মহৎ সৃষ্টির প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কৃষ্ণকুমারী নাটক ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য মুদ্রণের ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহনই বহন করেছিলেন। তিলোত্তমা সম্ভব রচনার সময় কবির সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের ছন্দবিষয়ক মতভেদের কথা সকলেরই জানা আছে। কাব্যটি রচনার সময় প্রতিটি সর্গ তিনি মতামতের জন্যে যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠাতেন। এই কাব্যটি যতীন্দ্রমোহনকে উৎসর্গ করে এবং এর পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে উপহার দিয়ে কবি তাঁর সঙ্গে প্রীতিবন্ধনের পরম পরিচয় রেখে গেছেন।

সে যুগের রাজনীতি এবং বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের সঙ্গেও যতীন্দ্রমোহন সক্রিয় যোগ রক্ষা করে চলতেন। হিন্দু মেলা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আমরা জানি। এবং জানি না তাঁর এমন কোনো কাজের কথা যার মধ্যে তিনি রাজভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন দেশভক্তিকে ছোট করে। আর জানি না বলেই 'ভার্নাকুলার প্রেস্ অ্যাক্ট্'-এর প্রতি তাঁর সমর্থন আমাদের বিস্মিত করে। ১৮৭৮ সালে আফগানিস্তানের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের যুদ্ধের সময় ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। অথচ দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ সরকার যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ব্যয় করেন। এই সরকারী দুর্নীতির বিরুদ্ধে তখন এদেশের অনেকগুলি পত্রিকা দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলে তাদের কণ্ঠরোধের জন্যে ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামক নাগপাশ তৈরি করেন। মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতায় কোন রকম সরকারী হস্তক্ষেপ যতীন্দ্রমোহন সমর্থন করতেন না, এ কথা তিনি নিজেই প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন। তবু এই আইন প্রবর্তনের সপক্ষে মত দিয়ে তিনি কেন যে সে দিন দেশবাসীর গঞ্জনা কুড়িয়ে ছিলেন বলা কঠিন। অবশ্য তাঁর মতের মধ্যেও বিলের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ পায় নি! ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন এ সম্পর্কে তখন পার্লামেণ্টে মন্তব্য করেছিলেন—

"...This is the opinion of the only native member of the Council, given in support of the Bill, but not of the matter of the Bill." ১২

যতীন্দ্রমোহনের অনুজ শৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীত কলাবিদ হিসাবেই প্রসিদ্ধ। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে মুষ্টিমেয় সঙ্গীত-সাধক নতুন শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন শৌরীন্দ্রমোহনই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সঙ্গীত গুরু ছিলেন বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। ভারতীয় সঙ্গতের বৈশিষ্ট ও স্বরূপকে, তার গৌরবময় বিরাট ঐতিহ্যকে তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গীত রসিক সমাজের সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। কারণ পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর। বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃতি-ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় তিনি সর্ব সমেত ছাব্বিশখানি

সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে 'জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭০), চারখানি বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ (১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে রচিত), 'Hindu Music' (1875),১৩ 'Short Notices of Hindu Musical Instruments' (1877), 'The Musical Scales of the Hindus' (1884) এবং 'Universal History of Music' (1896) গ্রন্থগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহী সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে সঙ্গীতচর্চা প্রসারলাভ করে সেই উদ্দেশ্যে তিনি দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন — 'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল' (১৮৭১) ও 'বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক' (১৮৮১)। তা ছাড়া 'সঙ্গীত-সমালোচনী' নামে (প্রকাশ আশ্বিন, ১২৭৯) একটি পত্রিকাও তিনি চালাতেন। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বোধ এর আগে আর প্রকাশিত হয় নি। সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনার ব্যাপারেও তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছিল।

বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে শৌরীন্দ্রমোহনের অবদান যে অসামান্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বের বহু দেশ নানা উপাধি দিয়ে তাঁর সাঙ্গীতিক বৈদগ্ধকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি একজন বিশ্ববন্দিত কলাবিদ্ এমন সব বই লিখেছেন সঙ্গীতের সঙ্গে যেগুলির বিষয় বস্তুগত লেশমাত্র মিল নেই। 'Manimala' (1879), 'The Caste System of the Hindus' (1884), 'History of Bakhargung' (1892), 'Dhatumala' (1903) প্রভৃতি গ্রন্থে বিচিত্র বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এই বইগুলি হয়তো সমস্তই শৌরীন্দ্রমোহনের রচনা নাও হতে পারে। কিন্তু এ ধারণার সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। এ ছাড়া, কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারলেও, দু একখানি বাংলা নাটকও তিনি লিখেছিলেন এবং একখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। নাটক লেখায় হাত না থাকলেও নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় শৌরীন্দ্রমোহনের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থই ইংরাজী। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'The Hindu Drama' (1st. part 1880 and 2nd part 1888)

RÁGINÍ BÁGÍSVARÍ.

रागिणी बागीश्वरी।

TÁLA ÁRÁCHAUTÁLA.

ताल आड़ा चौताल।

Fifth Strain.

पञ्चम अन्तरा।

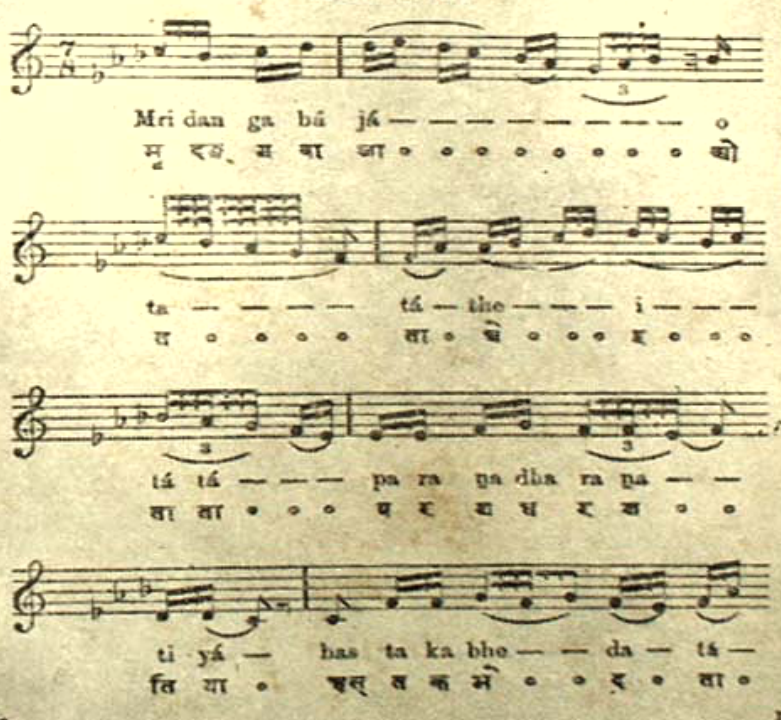

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি

এবং The Dramatic Sentiments of the Aryas' (1881)।

শৌরীন্দ্রমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের একজনের মধ্যেও প্রকৃত সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশ পায় নি। কিন্তু জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এই পরিবারের কয়েকজন যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় রেখে গেছেন উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাংলার মানসগঠনের ব্যাপারে তার মূল্যও বিশেষ কম নয়।

পাদটীকা

১। গোবিন্দপুর ও বর্তমান ধর্মতলা অঞ্চলে জয়রামের যে বাড়ি ও বাগান-বাড়ী ছিল সে কথা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থের ব্রাহ্মণ কাণ্ডে পিরালী-ব্রাহ্মণ বিবরণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। প্রমাণ-স্বরূপ তিনি রাধা বল্লভ ঠাকুরের একটি খোকদ্দমার নালিশী আরজী থেকে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন —

"Joyram's house was at Dhannosayer, now called Dhurrmtollah and had a garden house where Fort William is now built and a Baitakkhana near his house and lands at Dhurrmtollah."

২। দর্পনারায়ণ ও নীলমণির মধ্যে কে বড় ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। ফারেল্ সাহেব তাঁর Tagore Family নামক গ্রন্থে দর্পণারায়ণকেই বড় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থে (ব্রাহ্মণ কাণ্ড ৩য় ভাগ) এই মত ভুল বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে নীলমণি ঠাকুরই বড় ছিলেন। এবং এই লেখায় নগেন্দ্রনাথের মতই আমি গ্রহণ করেছি।

৩। দ্রষ্টব্য—বংশ পরিচয়, ৪র্থ খণ্ড, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত, পৃ-৩।

৪। রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৪ সালে এবং প্রসন্নকুমারের জন্ম হয় ১৮০১ সালে।

৫। The Tagore Family—Memoir by J. W. Furrell . p.99.

৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ ১১৭।

৭। 'The Tagore Family—a Memoir' p.63.

৮। The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc. By Loke Nath Ghose. part II. pp. 169-70.

৯। The Modern Hist. of the Indian Chiefs etc. By Loke Nath Ghose. part II. p 17।

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, পৃ ৮১।

১১। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত"; কিন্তু 'মধুস্মৃতি'-র লেখক নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে যতীন্দ্র মোহন এই নাটকের মাত্র দুটি গান রচনা করে দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথের মতই সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্য—সাহিত্য সাধক চরিতমালা. ২য় খণ্ড।

১২। Hansard's Parliamentary Debate, vol 242, part I, p.57.

১৩। বইটি হিন্দু সঙ্গীত সম্পর্কে বিদেশী চিন্তাশীলদের বিভিন্ন রচনার একটি মূল্যবান সংকলন।

———

হিন্দু কলেজ ঃ নব্যবঙ্গ ঃ ঈশ্বর গুপ্ত

ভবতোষ দত্ত

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ১৮৩১এ সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক রূপে আবির্ভূত হবার সময়টি আধুনিক বাংলার একটি স্মরণীয় আন্দোলনের যুগ। কলকাতার নব্যবঙ্গের আন্দোলন এই সময়েই আরম্ভ হয়েছিল। নবপ্রচারিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এই আন্দোলনের কিছু ছায়াপাত হয়েছিল, তার থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের যোগের একটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নি। এই আন্দোলন হয়ে গিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মেরও পূর্বে। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য জীবনের এই সময়ের খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি পান নি। তাঁর শেষ জীবন-সম্পর্কিত সংবাদই তিনি জানতেন। তাঁর রচিত জীবনীতে বিশেষ করে পরবর্তী সময়ের মতামত ও আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে।

নব্যবঙ্গের এই আন্দোলন শুরু হয় হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট-এর উদ্যোগে ডেভিড হেয়ারের উৎসাহে এবং গণ্যমান্য দেশীয় ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজের একটি ডিরেকটর-সভা গঠিত হল। রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রথম গবর্ণর নির্বাচিত হলেন তাঁদের দানের পরিমান সর্বোচ্চ ছিল বলে। ডিরেক্টর সভায় ছিলেন গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গঙ্গানারায়ণ দাস। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দেশীয় সেক্রেটারি এবং মেজর আরভিঙ হলেন য়ুরোপীয় সেক্রেটারী। ডিরেক্টররা প্রতি বৎসর চার জন সদস্যসমন্বিত কমিটি অব ম্যানেজমেণ্ট নির্বাচন করতেন। আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এই তিনটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কেননা এই শিক্ষানীতি থেকেই পরবর্তী নব্যবঙ্গের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ঃ

1. The primary object of this Institution is the tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages and in the literature and science of Europe and Asia.

4. In the school shall be taught English and Bengali Reading, Writing, Grammer and Arithmetic by the improved method of instruction. The Persian language may also be taught in the school until the Academy be established as far as shall be found convenient.

5. In the Academy besides the study of such language as cannot be so conveniently taught in the School, instruction shall be given in History, Geography, Chronology, Astronomy and Mathematics Chemistry and other sciences.

অবশ্য ইংরেজী সাহিত্যশিক্ষার ওপরেই শেষ পর্যন্ত ঝোঁক বেশী করে পড়েছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কলেজে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই পড়ানো হত।[২] ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু কলেজের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল[৩]:

The Hindoo College is intended to compass something more to teach Bengalee youth to read, and relish English literature; to store their minds with the facts of history and science and to enable them to express just conclusions in a clear and polished style; founded upon a comprehensive view of the constitution of society, and the phenomena of nature.

হিন্দু কলেজের এই শিক্ষানীতিতে বাংলা দেশে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হল। কিন্তু এই কলেজের শিক্ষাদর্শেরও দুটি যুগ ছিল। কলেজ স্থাপন থেকে

১৮২৬ পর্যন্ত শিক্ষানীতিতে ছাত্ররা বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অতীত এবং বর্তমান ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা, সংখ্যা ও বীজগণিতের কয়েকটি নিয়ম, শেক্সপীয়র পোপ মিলটন ক্যাম্বেলের কিছু রচনা মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছু করত না।[৪] ১৮২৬এ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও শিক্ষক নিযুক্ত হবার পর কলেজের শিক্ষানীতিতে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তিত শিক্ষানীতির একটি দীর্ঘ বর্ণনা ১৮৩৭-এর ক্যালকাটা মানথলি জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৫] নতুন শিক্ষান্দোলনের সমর্থনসূচক সর্বপ্রাচীন বিবরণ বলে এই ধারাবাহিক দীর্ঘ রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য—

When Mr. Derozio was appointed an assistant teacher at the Hindu College, he introduced wonderful innovations into the former method of instruction. It was he that first awakened in the minds of his pupils a curiosity and a thirst for knowledge. It was he who thought it his principal duty to *refine their feelings*. It was he who roused them to *think for themselves*. It was he that gave them *solid* instruction in the shape of entertainments nd it was he that enraptured them sublimest precepts.

এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি এবং চিন্তাবৃত্তির উদ্‌বোধন কার্যের নায়কতা যিনি করেছিলেন, তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক কবি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)।[৬] ডিরোজিও বাল্যকাল থেকেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর জন গ্রাণ্ট তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৭]

I was engaged one day to take four o'clock dinner at the house of colonel W. C. F. a valued and kind hearted old friend of mine and also

my commanding officer in days that were amongst the pleasantest of my life in a corps, the officers of which were like a bond of brothers. Colonel F. had long known Mr. Derozio Senior (a highly respectable and worthy man) and his amiable wife. I had scarcely been introduced to them when Henry came up, his face sparkling with pleasure at meeting the reports of the School examination. The boy after this, as I particularly requested he would often come to see me and I found his intellectual powers precocious and his acquirements ripe beyond his years. In a word I took great interest in him.

ডিরোজিও ১৮১৫ থেকে ১৮২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেভিড ড্রামনডের ধর্মতলা একাডেমিতে ছাত্র ছিলেন।৮ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও ভাগলপুরে তাঁর মামার নীলকুঠিতে কাজ নিয়ে যান। এখানেই তাঁর 'ফকির অব জঙ্গীরা' কাব্যের সূচনা। কলকাতায় ফিরে এসে ১৮২৬-এ প্রথমে ইনডিয়া গেজেটের সহকারী সম্পাদক, তার পর মার্চ মাস থেকে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের কাজ নেন। এখানে ডিরোজিও পড়াতেন Goldsmith's History of Greece, Rome and England, Russel's Modern Europe, Robertson's Charles V, Gay's Fables, Pope's Homer's Iliad and Odyssey, Dryden's Virgil, Milton's Paradise Lost, Shakespeare's one of the tragedies।৯

১৮৩১ এর ২৫এ এপ্রিল পর্যন্ত ডিরোজিও এই কলেজের শিক্ষক ছিলেন। নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত অধিকাংশ যুবকেরাই এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র।

রামগোপাল ঘোষ	১৮২৩-১৮৩০
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২৪ ফেব্রুয়ারি-১৮২৯, নবেম্বর
রাধানাথ শিকদার	১৮২৪ মার্চ-১৮৩১ ডিসেম্বর

শিবচন্দ্র দেব	১৮২৫ আগস্ট-১৮৩১,২০ ডিসেম্বর
প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮২৭,৭ জুলাই-স্কুলত্যাগের কাল অজ্ঞাত ১০
রসিককৃষ্ণ মল্লিক	১৮২১-১৮৩০, ১৩ মার্চ
রামতনু লাহিড়ী	১৮২৮-১৮৩৩

এছাড়া মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮৩১-এর মার্চ পর্যন্ত), হরচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। রামমোহনের সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না। ১৮১৭ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত তিনি এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি অবশ্য পরে নব্যবঙ্গের নেতৃত্ব করেছিলেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ডিরোজিও ছাত্রদের বিশেষ করে যেসব বই পড়াতেন বলে ইংলিশম্যানের প্রবন্ধলেখক এবং প্যারীচাঁদ মিত্র বলেছেন, ডুগালড ষ্টুয়ার্ট, ডক্টর রীড, হিউম, টমাস ব্রাউন, অ্যাডাম স্মিথ, বেনথাম প্রভৃতির সেই সব তত্ত্ব বা দর্শন তাঁর কলেজের পড়ানোর মধ্যে পড়ত না। তাঁর ছাত্ররা এসব কখন তাঁর কাছে পড়েছে? ১৮২৮ এ ডিরোজিওর বাড়িতে এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন নামে যে বিতর্ক সভা স্থাপিত হয়, সেখানে কলেজের বাইরের ছাত্রদের সঙ্গে ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[১১] সেই সব আলোচনাসভাতেই এসব তত্ত্ব-দর্শন আলোচিত হয়েছে এবং হিন্দু কলেজের গতানুগতিক পাঠ্যধারার মধ্যে নতুন চিন্তাপ্রবাহ এসে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এই এসোসিয়েশন পরে মাণিকতলায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে ডেভিড হেয়ার, কর্ণেল বাটসন, স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, ডেপুটি গভর্ণর ডবলিউ ডবলিউ বার্ড, বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল প্রভৃতি উপস্থিত থাকতেন। নীতি ধর্ম হিন্দু 'আচার অনুষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রভৃতি অনেক কিছুই এখানে যুক্তিসহকারে আলোচিত হত। এসোসিয়েশন যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল, তার ফলে কলকাতার নানা জায়গাতেই অনুরূপ সভা স্থাপিত হল। ১৮৩০ এর মধ্যেই শুধু হিন্দু কলেজ নয়, রামমোহন রায়ের অ্যাংলো হিন্দু স্কুল এবং

কলকাতা স্কুল সোসাইটির ইংরেজি স্কুলগুলি সাতটি সভা স্থাপন করেছিল।১২ ইংরেজি ভাষায় সভার কার্য পরিচালিত হত। এক একটি সভার সভ্যসংখ্যা ছিল সতেরো থেকে পঞ্চাশ। ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সভাপতি হলেও এই সমস্ত সভাতেই উপস্থিত থাকতেন। ক্রমে ছাত্র নয়, এমন ব্যক্তিরাও এরকম সভা গড়ে তুলতে লাগল। এসব সভায় অবশ্য বাংলায় আলোচনা হত। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও পটলডাঙ্গা স্কুলে সন্ধ্যাবেলায় মেটাফিজিক্স-এর ক্লাস নিতে লাগলেন। এতে প্রায় দেড়শ জন উপস্থিত থাকতেন।১৩

কলকাতায় নব্যবঙ্গের আন্দোলন নামে যে বিখ্যাত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে ছিল ডিরোজিও-অনুপ্রাণিত সভা-সমিতির ফল, যদিও হিন্দু কলেজের মধ্যে সে রকম সভা কিংবা উত্তেজনার পরিপোষক শিক্ষাদর্শ ছিল না। হিন্দু কলেজের পরীক্ষার যে সব বিবরণ পাওয়া যায়, তা অবশ্যই ইংরাজি শিক্ষার অগ্রগতির সূচক। কাশীপ্রসাদ ঘোষ জেমস মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে-সমালোচনা করেছিলেন তার বিস্তৃত উল্লেখ প্রসঙ্গে ক্যালকাটা গেজেট লিখেছিল—

When Mr. Mill wrote his History of British India, he very probably, never suspected that the pages of his work would be critically examined by a Hindoo, distinguished for his acquirments in the Enlish language, and familiar with the classical and recondite learning of the West…For this sudden revolution, in the intellectual qualities of the natives of this country we are mainly indebted to the establishment of the Anglo-Hindoo College; and the specimens we have already given of the progress of the pupils, must have shown how easy the task is to make them profit by liberal instruction, when steadily and zealously presumed.১৪

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এর কোন কুফল হচ্ছে কিংবা এই কলেজের শিক্ষা-নীতির জন্যই ধর্ম বিপন্ন হয়েছে—এমন অভিমত অনেকদিন পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব পেয়েছিল বলে মনে হয় না। ১৮৩০-এর আগে পত্রপত্রিকাগুলিতে নব্য-বঙ্গের আন্দোলন বা 'উচ্ছৃঙ্খলতা' সম্বন্ধে তেমন কোন সংবাদ দেখতে পাই না। ১৮৩০-এর ১৩ই মার্চ সমাচার দর্পণ পত্রিকাতে 'জাবনিক রুটি ভক্ষণ' এই শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।১৫ ঘটনাটিকে ক্ষুদ্র বলা হয়েছে, কিন্তু তাই নিয়ে সমাচার চন্দ্রিকা খুব সোরগোল করে।

"আবশ্যক সম্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্র ঘটনাতে চন্দ্রিকাকার ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদ্ঘটনাঘটিত দুই কাব্য উত্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম বিশেষত জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমন করত ঐ দোকানঘরে প্রবেশপূর্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন।"

নব্যবঙ্গের আন্দোলন বস্তুত হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ ফল নয়। এ ছিল অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন এবং ডিরোজিওর অনুপ্রেরণার ফল। অবশ্য কলেজের বাইরে এসোসিয়েশনের সভাতে হিন্দু কলেজের ইংরাজিতে অভ্যস্ত ছাত্ররাই যোগ দিয়েছে। সেই হিসাবে হিন্দু কলেজ এই আন্দোলনের সহায়ক ছিল। ডিরোজিওকে নিয়ে কলেজের কর্তৃপক্ষ—সভায় আলোচনা হল। তখন কেউ তাঁকে প্রত্যক্ষত দায়ী করেন নি অন্ততঃ কলেজের ভিতরে তাঁর আচরণ থেকে দায়ী করার কারণ খুঁজে পান নি। ২৩এ এপ্রিল ১৮৩১ এর সভার বিবরণ১৬—

Whether the managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars are such as to render him an improper person to be entrusted with the education of youth.

Baboo Chandra Coomer stated that he knew no-

thing of the ill effects of Mr. Derozio's instructions except from report.

Mr. Wilson stated that he had never observed any ill effects from them and that he considered Mr. Derozio to be a teacher of superior quality.

Baboo Rada Canto Deb stated that he considered [P.37] Mr. Derozio a very improper person to be entrusted with the education of the youth.

Baboo Russomay Dutt stated that he knew nothing to Mr. Derozio's prejudice except from report.

Baboo Prosanna Coomer Tagore acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage.

Baboo Radha Madub Banerjee believed him to be a improper person from the report he heard.

Baboo Ram Camul Sen concurred with Baboo Rada Canto Deb in considering him a very improper person as the teacher of youth.

Baboo Srikishen Sinh was firmly convinced that he was far from being an improper person and Mr. Hare was of opinion that Mr. Derozio was a highly competent teacher and that his instructions have always been most beneficial.

The majority of the managers being unable [38] from their own knowledge to pronounce upon Mr. Derozio's disqualifications as a teacher the Committee proceeded to the consideration of the negative question.

ম্যানেজার সভার অধিকাংশ সভাই ডিরোজিও সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন অনুপযুক্ততার প্রমাণ পান নি। তাঁদের বক্তব্য নিশ্চয়ই কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বিষয়েই। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষ যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার পশ্চাৎপট হিসাবে এই বিবরণটি মনে রাখা দরকার।

পটলডাঙ্গা স্কুলঘরে ডিরোজিও মেটাফিজিকস-এর ক্লাশ নিচ্ছিলেন সেখানে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা উপস্থিত থাকত, সেখানে তর্ক ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার সূত্রপাত হল। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই চিন্তাবিপ্লব লক্ষ্য করেছিলেন।১৭ এতে তিনি খুশি হয়েছিলেন, শুধু মনে হয়েছিল এদের এই ধর্মবোধহীন চিন্তাধারাকে ধর্মের পথে নিয়ে যাওয়া দরকার। হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। অতএব এই চিন্তার স্বাধীনতার আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে ডাফ এবং তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য পাদ্রী কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। বক্তৃতাগুলি এই—

১. The External and Internal Evidences of Natural and Revealed Religion—ডাক্তার ডাফ

২. The proofs derived from profane history, of the fulfilment of scripture prophecy, as a source of evidence, which, it was supposed, the attainments and previous studies of the young men would prepare them to appreciate.—অ্যাডাম

৩. The facts recorded in the four Gospels, as exhibiting the moral character of the Founder of Christianity, and the genius and temper of his religion —হিল

৪. The doctrines of Revelation—ডিয়েলট্রি

ডাক্তার ডাফের বাড়ি হিন্দু কলেজের কাছে। তারই বাড়ির একতলায়

এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। প্রথমে বক্তৃতা তার পরে প্রশ্নোত্তর—এই পদ্ধতিতেই আলোচনা পরিচালিত হবে স্থির হল। এই বক্তৃতামালার ভূমিকা স্বরূপ একটি বক্তৃতা দিলেন হিল ১৮৩০ এর আগস্ট মাসে। ডাফ লিখেছেন, এই বক্তৃতার সংবাদ দেশীয় সমাজে আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল। সমস্ত শহরেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। সে চাঞ্চল্যের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া কঠিন। এমন একটা ধারণা তৈরি হল, পাদ্রীরা ধর্মান্তরণের উদ্যোগ করছেন মাত্র। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এই নিয়ে নালিশও করেন। তার মধ্যে য়ুরোপীয়ও কেউ কেউ ছিলেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা প্রকাশ করে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা। ১৮৩১-এর ২২এ জানুয়ারি সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে বলা হয়েছে ১৮—

"হিন্দু কলেজ নামক যে বিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিত হওয়াতে সর্বসাধারণের যে উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা যোত্রহীন তাঁহাদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্রলোকের অবিদিত কি আছে কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী, তিনি যে কলেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারাদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কলেজের বিপক্ষ···

'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকাতেই প্রকাশিত একটি চিঠিতে ইতিপূর্বে হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রের অভিভাবক পুত্রের ইংরেজিয়ানায় বিরক্ত হয়ে পুত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা বিজ্ঞাপিত করেন।১৯ সত্যসত্যই কলেজ থেকে অনেক অভিভাবকই তাঁদের ছেলেদের নিয়ে আসছিলেন। হিন্দু কলেজের পরিচালক সভার পূর্বে উদ্ধৃত কার্যবিবরণেই (২৩ এপ্রিল ১৮৩১) জানা যায় ২০ বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের পঁচিশটি ছাত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় একশ ষাট বালক অনুপস্থিত থাকছে, যাদের কেউ কেউ হয়তো অসুস্থ, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন অনেকেই কলেজে যোগ দিচ্ছে না।

ডাফ তাঁর বক্তৃতা দেবার জন্যই কলকাতার হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু তিনিও বস্তুত অনুকূল সময়ের সুযোগ নিচ্ছিলেন মাত্র। এই অনুকূলতা সৃষ্টি করে তুলছিল ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সভাগুলি। অতএব ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের প্রতি এক নির্দেশ দিলেন :২১

The Managers of the Anglo-Indian College having heard that several of the students are in the habit of attending Societies at which Political and Religious discussions are held, think it necessary to announce their strong disapprobation of the practice and to prohibit its continuance. Any students being present at such a Society after the promulgation of this order, will incur their strong displeasure.

এই নির্দেশের সমালোচনায় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে ওঠল। ক্যালকাটা গেজেটের সম্পাদক লিখলেন কলেজের বাইরে ছেলেরা কি বলবে বা করবে সে বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের বলবার অধিকার নেই। এই নিয়ে কাগজের লেখালেখি কিছুদিন পর কমল বটে কিন্তু ডাফ লিখেছেন যে এর ফলে কলকাতায় বহু সভাসমিতি গড়ে ওঠল যেখানে নানা বিষয়ের আলোচনার আগ্রহ দেখা দিল। ডাফ নিজে এরকম কয়েকটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় আবেগ ও উদ্দীপনা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আলোচনা যদি ইতিহাসের বিষয় হত রবার্টসন এবং গিবন উদ্ধৃত হতেন ; যদি রাজনীতি বিষয়ক হত তবে অ্যাডাম স্মিথ এবং জেরেমি বেনথাম ; যদি বিজ্ঞান বিষয়ক হত তবে নিউটন এবং ডেভি ; ধর্ম বিষয়ক হলে হিউম এবং টমাস পেন ; দর্শন বিষয়ক হলে লক বীড ডুগালড ষ্টুয়ার্ট এবং ব্রাউন। বার্নসের

For a' that, and a' that
Its comin' yet, for a' that

That man to man, the world o'er
Shall brothers be, for a' that.

এই কাব্য পঙক্তির আবৃত্তি শুনে স্কচ ডাফ স্বভাবতই আনন্দিত হতেন।

(ক্রমশঃ)

পাদটীকা

(১) হিন্দু কলেজ স্থাপনের ইতিহাস সম্পর্কে দ্রষ্টব্য *Presidency College Centenary volume* 1956।

(২) S. K. De, 'The Hindu College and the Reforming Young Bengali' in the *Sir P. C. Roy Commemoration Volume*, 1032, P, 104। এই প্রবন্ধটি History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1962, গ্রন্থে সংকলিত (পৃঃ ৪৭৮-৪৯৮)।

(৩) Calcutta Gazette, Thursday, January 17, 1828, *The Days of John Company 1824-1832*, Compiled and edited by Anil Chandra Das Gupta, 1959, ২৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(৪) নিচের উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৫) *The Calcutta Monthly Journal*, March (প্রকাশিত ২২মে) 1837। Englishman পত্রিকা থেকে সংকলিত। The Hindoo নামে প্রবন্ধটি ইংলিশম্যানের ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নেই। প্রথম সংখ্যা 'P' স্বাক্ষরিত। প্যারীচাঁদ মিত্র হওয়া বিচিত্র নয়। *A Biographical sketch of David Hare*, 1877 গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়।

(৬) ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও (১৭৭৯-১৮৩১) ছিলেন পর্তুগীজ বংশোদ্ভব প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টান। হেনরির মায়ের নাম সোফিয়া জনসন। ফ্রান্সিস ও সোফিয়ার পাঁচ ছেলেমেয়ে—ক্রান্স সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী কুড়ি বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন; হেনরি কবি ও শিক্ষক; ক্রডিয়াস স্কটল্যাণ্ডে শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু ১৮৩৬এ মৃত্যু হয় বাইশ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর; ভগিনী সোফিয়া সতের বছর বয়সে মৃত;

আমেলিয়া ডিরোজিওর মৃত্যুর পর শ্রীরামপুরে চলে আসে। সেখানে সম্পর্কিত ভাই আর্থার ডিরোজিও জনসনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। আর্থার রাজপুতনার কোটার রাজা বিষাণ সিংহের সেক্রেটারী ছিলেন। সেখানেই আমেলিয়ার বাইশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। সোফিয়া-ডিরোজিওর মৃত্যুর পর (১৮১৩) ফ্রান্সিস আনাবারিয়া স্টিভার্স নামক একজন ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন ; ইনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

(৭) *Bengal Harkaru*, Nov, 12, 1833, প্রবন্ধটির নাম *The Late H L. V. Derozio.* Extracted from an article in the Calcutta Literary Gazette of Sunday. প্রবন্ধটির সম্পর্কে ঐ সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল : We extract from the Literary Gazette of Sunday last some passages from an article on the Late H. L. V. Derozio in which although it is from the pen of one who was a kind friend and patron of the youthful poet, we do not think the writer has in any degree exceeded the measure of praise which was justly due to the intellectual talents or the moral and social qualities of the subject of his biographical sketch.

ডক্টর গ্রান্ট ডিরোজিওর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সুহৃদ ছিলেন। উপরে উদ্ধৃত লেখাটিতে গ্রান্ট বলেছেন, তিনি ডিরোজিওকে ইতিহাস এবং লাতিন ভাষায় লেখা মূল বই পড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'জুবেনিস' স্বাক্ষরিত একটি সনেট প্রকাশার্থ পান। পরে বুঝতে পেরেছিলেন লেখক ডিরোজিও। তেমন উৎকৃষ্ট না হলেও সনেটটি তিনি ছেপেছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ডিরোজিও ইনডিয়া গেজেটে নিয়মিত লিখতে থাকেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বই Poems প্রকাশিত হয়। বইখানি লণ্ডনেও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে *The Fakeer of Jungheera* বেরোয়। ডিরোজিওর তিনটি কবিতা রিচার্ডসনের কাব্যসংকলনে স্থান পেয়েছে। তাঁর একটি গদ্য রচনা *The Modern British Poets* Calcutta Literary Gazette, October 13, 1833-তে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা কাণ্টের সমালোচনাটি পাওয়া যায় নি।

ডিরোজিও সম্বন্ধে এই বইগুলি দ্রষ্টব্য : Thomas Edwards, *Henry Derozio The Eurasian Poet, Teacher and Journalist, Calcutta 1884* ; Peary Chand Mitra, *A Biographical Sketch of David Hare, Calcutta 1877* ; Eliot Walter Madge, *Henry Derozio. The Eurasian Poet and Reformer*, edited by Subir Roy Choudhuri, Calcutta 1966 ; যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, ১৯৬৩ ; বিনয় ঘোষ বিদ্রোহী ডিরোজিও, ১৯৬১ ; S. K. De, *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century 1962* ; F. Bradly—Birt, *Poems of Henry Louis Vivian Derozio*, Oxford University Press, 1923 ; বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ পল্লব সেনগুপ্তের প্রবন্ধ, 'হেনরী ডিরোজিওর কবিতা'।

(৮) স্কুল ছাড়বার পরেও ডিরোজিও ড্রামনডের স্কুল অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ১৮২৪-এর ২০ জানুয়ারি এখানে 'ভগলাস' নামে একটি নাটকের অভিনয়ে ডিরোজিও ভূমিকা হিসাবে একটি স্বরচিত কবিতা পড়েন। তিনি এতে অভিনয়ও করেন। এই অভিনয়ের বিবরণ ২২ জানুয়ারী ১৮২৪-এর ইনডিয়া গেজেটে বের হয়। ডক্টর প্রাণ্ট পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। সম্প্রতি কবিতাটি বিনয় ঘোষ সংকলিত করেছেন। দ্রষ্টব্য 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' পৃ: ১৩৪-১৩৫। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ড্রামনড তাঁর ছাত্র ডিরোজিও সম্বন্ধে The Weekly Examiner, 26th September 1840 একটি প্রবন্ধ লেখেন। ড্রামনডের ধর্মতলা একাডেমির একটি বিবরণ দ্রষ্টব্য The Calcutta Review...।

(৯) টমাস এডওয়ার্ডসের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৬৬।

(১০) এ পর্যন্ত তালিকা দিয়েছেন সুখেন্দ্র লাল মিত্র। দ্রষ্টব্য 'Old Memories' *The Bengalee* 7 May, 1925।

(১১) অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নবা-সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী ১৯৫৮।

(১২) Alexander's *East India Magazine* (London) June 1831, i, 7, 704। দ্রষ্টব্য A. F. Salauddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, Leiden, 1965, পৃ: ৪১।

(১৩) Alexander's East India Magazine, London, June 1831, i, 7.705, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। অলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁর *India and India Mission*-এ

1840, পৃ: ৬৩৮, লিখেছেন, তাঁর বক্তৃতা এবং হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রতিক্রিয়াতেই কলকাতায় অনেকগুলি বিতর্কসভা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডাফ বক্তৃতা করবার আগেই এরকম সভার সৃষ্টি হয়েছিল।

(১৪) Calcutta Gazette, Thursday, February, 1828, দ্রষ্টব্য Selections from Calcutta Gazette 1824-1832, (1959) P. 298। কিন্তু এই বিবরণে লেখকের নাম বলা হয়েছে কাশীনাথ ঘোষ। সেটা নিশ্চয়ই ভুল। গেজেটের পূর্ববর্তী সংকলিত অংশে (দ্র: ২৮৪ পৃষ্ঠা) নাম আছে কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কাশীপ্রসাদ আত্মজীবনীতেও এই অনুবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড (১৩০৬) পৃ: ৪৪১। কাশীপ্রসাদের রচনাটি ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮২৯-এর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক জার্নালে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

(১৫) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৫। এর আগে ১৮২৫, ২২ জানুয়ারী সমাচার দর্পণে সমাচার চন্দ্রিকার একটি সংবাদ উদ্ধৃত হয়—'বালকের ইংরাজী পোষাক'। দ্র সং-সে-ক ১ম, পৃ: ১২৯।

(১৬) হিন্দু কলেজ পরিচালক সভার কার্য বিবরণ (পাণ্ডুলিপি) পৃ: ৩৬-৩৭।

(১৭) এই বিবরণ আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর India and India Mission, (Edinburgh 1840) Appendix থেকে সংকলিত।

(১৮) সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩৩।

(১৯) স-সে-ক, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩১। সমাচার দর্পণে সংকলনের তারিখ ৬ নবেম্বর, ১৮৩০।

(২০) পাণ্ডুলিপি পৃ: ৩২।

(২১) *The Days of John Company* (West Bengal Govt. Press Calcutta, 1959) edited by Anil Ch. Das Gupta. p. 575.।

পয়সা

দীনেশচন্দ্র সরকার

'অর্থ' এবং 'মুদ্রাবিশেষ' অর্থে 'টাকা' ও 'পয়সা' শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত। হিন্দী প্রভৃতি ভাষার 'টংকা' শব্দ হইতে 'টাকা' শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে। আবার 'টংকা' শব্দের মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত 'টংক' বা 'টংকক্' শব্দ। 'টংক' অর্থাৎ 'ছেনী' দ্বারা রূপার পাত কাটিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ 'রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ' অর্থে 'টংক' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু 'পয়সা' শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই; এ বিষয়ে কোন আলোচনাও হয় নাই।

'তাম্রমুদ্রাবিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত 'পয়সা' শব্দটি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় 'পৈসা' আকারে দেখিতে পাই। মারাঠী ভাষায় একটি ভূমি পরিমাণেরও নাম 'পৈসা'। উহা ৭ ½ বিঘার সমান। শব্দটির ইংরেজী রূপ pice; কিন্তু পূর্বে pyse, pyce প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে ইহা লিখিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, ৪০ আকবরী 'দামে' ১ আকবরী 'রুপিয়া' এবং এই 'দাম'কেই পূর্বে 'পৈসা' বলা হইত। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে Wilson সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Glossaryতে লিখিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পয়সার ওজন ১০০ গ্রেণ নির্দ্ধারিত করিয়া ৬৪ পয়সা ১ টাকার সমান স্থির করেন; কিন্তু দেশীয় রাজন্যবর্গের জনপদে ১ রৌপ্যমুদ্রার সমপরিমাণ পয়সার সংখ্যা নির্দ্ধারিত ছিল না। আবার ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত Fryer সাহেবের গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, কোম্পানীর হিসাবে ৮০ পৈসা ১ মুসলমানী রূপিয়ার সমান গণ্য করা হইত। মুসলমান আমলেই 'পৈসা' সংজ্ঞক তাম্র মুদ্রা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নামটির মূল প্রাচীন।

প্রাচীনকালে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 'বিংশোপক' নামক তাম্রমুদ্রার প্রচলন

ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিষ্ণুষেণসন্ত্রক রাজা গুজরাত অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একখানি তাম্রশাসনে ৫ বিংশোপক 'রূপক' নামক রৌপ্যমুদ্রার এক চতুর্থাংশরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ২০ বিংশোপকে ১ রূপক গণনা করা হইত। আবার ঝান্সী জেলার সিয়াডোনীতে প্রাপ্ত গুর্জরপ্রতীহার আমলের একটি শিলালেখে দেখা যায় যে, ২০ বিংশোপক ১ দ্রম্মের সমান। অতএব একই প্রকারের রৌপ্য মুদ্রাকে 'রূপক' এবং 'দ্রম্ম' বলা হইত এবং বিংশোপকের মূল্য ছিল উহার বিশ ভাগের এক ভাগ। বিংশোপক যে তাম্রমুদ্রার নাম, তাহার কিছু প্রমাণ আছে।

প্রাচীন ভারতের জনপ্রিয় রৌপ্য মুদ্রার নাম ছিল 'কার্ষাপণ'। উহাকে 'পুরাণ' এবং 'ধরণও বলা হইত। এই মুদ্রার ওজন ছিল ৩২ রতি। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের শকবংশীয় রাজগণ অপেক্ষাকৃত কম ওজনের যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচার করেন, উহাকেও "কার্ষাপণ" বলা হইত। তাই পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ 'প্রাচীন' এবং 'নবীন' কার্ষাপণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নবীন কার্ষাপণের মূল্য প্রাচীন কার্ষাপণের তিন চতুর্থাংশ। সুতরাং নবীন কার্ষাপণের ওজন ২৪ রতি ধরা হইত। প্রকৃতপক্ষে শকরাজগণের রৌপ্যমুদ্রার ওজন ২৪ রতি হইতে কিছু কম ছিল। যাহা হউক, পরবর্তী কালে গুপ্ত, ত্রৈকূটক, কলচুরি প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশের নরপতিগণ শক মুদ্রার অনুকরণে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। এই মুদ্রা 'রূপক' এবং 'দ্রম্ম' নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু কখনও কখনও 'কার্ষাপণ', 'পুরাণ' ও 'ধরণ' নামেও উহা উল্লিখিত হইত।

ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী'তে একস্থলে বলা হইয়াছে—২০ কড়ি = ১ কাকিনী ; ৮০ কড়ি বা ৪ কাকিনী = ১ পণ ; ১২৮০ কড়ি বা ১৬ পণ = ১ দ্রম্ম (রৌপ্যমুদ্রা) ; ১৬ দ্রম্ম = ১ নিষ্ক (স্বর্ণমুদ্রা)। অন্যত্র মুদ্রার ওজনের বেলায় বলা হইয়াছে—৩ রতি = ১ বল্ল ; ২৪ রতি বা ৮ বল্ল = ১ ধরণ ; ২ ধরণ = ১ গদ্যাণক। মুদ্রার তালিকায় যে রৌপ্যমুদ্রাকে 'দ্রম্ম' বলা হইয়াছে, উহাকেই ওজনের তালিকায় 'ধরণ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলা ধারাপাতে আবার উহাকে 'কাহণ' অর্থাৎ 'কার্ষাপণ' বলা হইত—৪

কড়ি = ১ গণ্ডা ; ৮০ কড়ি বা ২০ গণ্ডা = ১ পণ ; ১২৮০ কড়ি বা ১৬ পণ = ১ কাহণ (কার্ষাপণ)। অতএব মধ্যযুগে ২৪ রতি ওজনের যে রৌপ্যমুদ্রা কার্ষাপণ, ধরণ, দ্রম্ম, পুরাণ বা রূপক নামে পরিচিত ছিল, উহার একটি ২০ বিংশোপকের সমান বলিয়া গণিত হইত। সুতরাং একবিংশোপকের মূল্য ছিল কিঞ্চিদধিক একরতি রৌপ্যের সমান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিংশোপক ছিল তাম্র মুদ্রার নাম।

গুজরাতের সোলংকীবংশীয় রাজগণের লেখমালায় ভূমিপরিমাণ বিশেষ বুঝাইতে 'বিংশোপক' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আবার ঐ অঞ্চলে বিংশোপক সংজ্ঞক তাম্রমুদ্রাকে কখনও কখনও 'বীসোবা' বলা হইত। এই 'বীসোবা' নামটি 'বিংশোপকে'র স্থানীয় রূপ। মহারাষ্ট্রে বিঘা নামক ভূমিপরিমাণের বিশভাগের একভাগকে 'বিস্বুবা' বলা হয়। এই 'বিস্বুবা' উল্লিখিত 'বীসোবা'রই রূপান্তর।

আদি মধ্যযুগের কন্নড লেখমালায় 'লোক্কিয়বীসা' নামক মুদ্রার উল্লেখ আছে। উহার অর্থ—'লোক্কি নামক স্থানে মুদ্রাঙ্কিত বীসা'। ধারবার জেলার অন্তর্গত বর্তমান লক্কুণ্ডি সেকালে লোক্কি বা লোক্কিগুণ্ডি নামে পরিচিত ছিল। যাহা হউক, মুদ্রা বুঝাইতে ব্যবহৃত 'বীসা' শব্দটি যে বিংশোপকের সমার্থক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উহা সংস্কৃত 'বিংশক' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়।

মধ্যযুগে রাজস্থান অঞ্চলে 'পাবীসা' সংজ্ঞক তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল। উহার নাম সংস্কৃত 'পাদবিংশক' (অর্থাৎ বিংশকের এক চতুর্থাংশ) হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ৪ পাবীসা ১ বীসা' বিংশক বা বিংশোপকের সমান ছিল। অতএব ৮০ পাবীসা এক রৌপ্য মুদ্রার সমান গণ্য হইত।

আমাদের মনে হয়, এই 'পাবীসা' নাম হইতেই 'পৈসা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ যেমন ৮০ পাবীসা এক রৌপ্যমুদ্রার সমান ছিল, সেইরূপ ৮০ পৈসাকে অনেক সময় এক মুসলমানী রুপিয়ার সমান গণনা করা হইত। কিন্তু 'পাবীসা' হইতে উৎপন্ন শব্দটি 'পৈসা' (পইসা) না হইয়া 'পাইসা' হওয়া স্বাভাবিক। তাই মনে হয়, 'পৈসা' নামটির মৌলিক উচ্চারণ ছিল 'পাইসা'।

সংবাদ ও মতামত

ডঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক গমন

গত ৫ই মার্চ (১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) কলকাতায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স ৬৫ হয়েছিল।

তিনি এলাহাবাদ ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। তারপর কালক্রমে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলার ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ক্লাইভ, দেওয়ানী শাসন ব্যবস্থা, ভেরেলেস্ট ও নীরকাশিম সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিক-দের নিয়ে যে বোর্ড গঠন করেন ডঃ চট্টোপাধ্যায় তার সম্পাদক মনোনীত হন। তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পক্ষে তাঁর প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখা দরকার।

অমৃত বাজার পত্রিকার শতবর্ষ

শতবর্ষ পুর্তি উপলক্ষে আমরা অমৃতবাজার পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করছি। ভারতের জনমানস গঠন করার ব্যাপারে এই পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা আছে। এই পত্রিকা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে গত একশত বছরের

ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকেই গবেষণা করেছেন বা করছেন। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এই পত্রিকার ব্যবহার যাতে ভবিষ্যতেও বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পত্রিকা সম্পাদিত হলে আমরা খুশী হব। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ে পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একশত বছর ধরে পত্রিকায় যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বাছাই করে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করলে গবেষক ও পাঠকেরা উপকৃত হবেন।

অমলেন্দু দে

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির হীরক জয়ন্তী

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৭-এর এপ্রিল মাসে। ঐ বৎসর অক্টোবরে সোসাইটির পত্রিকা বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেসেণ্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। কলকাতা শহরের ইতিহাস ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করাই ছিল সোসাইটির উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে প্রাথমিক আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তৎকালীন রাজধানীবাসী ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং তাঁদেরই উৎসাহে এই সোসাইটি গঠিত হয়। প্রথম থেকেই অবশ্য কিছু সংখ্যক ভারতীয় পণ্ডিত সোসাইটির কাজের সঙ্গে যুক্ত হ'ন। বলা বাহুল্য সোসাইটির কাজ শুধুমাত্র কলকাতার ইতিহাস আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চায় বিশিষ্ট অংশ নিয়েছে ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি।

গত ২৭।২৮শে জানুয়ারী (১৯৭৮) সেণ্ট্ পল্স্ ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গণের প্যারিস্ হলে সোসাইটির হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন হয়। উদ্বোধনী সভায় বাংলাদেশ ও কলকাতার পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। এর পর কলকাতার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয়। কলকাতার প্রথম যুগের ছাপাখানা ও প্রকাশকদের সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ শশীভূষণ চৌধুরী। ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা পুরনো কলকাতার ছবি সম্পর্কে বলেন ডঃ মরিস সেলিব এবং এই শহরের ও আশেপাশের

মন্দির ও গীর্জা নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকাচিনে, শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেভারেণ্ড সেসিল ম্যাহুয়েল। কলকাতার নাগরিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতি নিয়ে বলেন ডঃ প্রদীপ সিংহ। ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ হিন্দু কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ নিয়ে ভাল আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ চিন্তামনি কর, শ্রীরমেশ মোহাল, ডঃ বরুণ দে, ডঃ ভবতোষ দত্ত, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠি, অধ্যাপক সুশোভন সরকার এবং রেভারেণ্ড সেসিল ম্যাহুয়েল এবং মেঃ কার্লটন।

হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেসেণ্ট্ এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় লিখেছেন দেশের ও বাইরের অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। আলোচনা সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল—আধুনিক যুগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হিস্ট্রী অব বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫) প্রকাশিত হ'ল। বেশ কিছুকাল আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রী অব বেঙ্গল-এর বিষয়বস্তু আধুনিক যুগ। আশা করা যায় বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) থেকে ভারত বিভাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত ইতিহাস রচনার কাজও অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ হবে।

গ্রন্থের সম্পাদক ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ভূমিকায় লিখেছেন যে হিস্ট্রী অব বেঙ্গল কমিটিকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। ফলে আধুনিক কালের বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হলেও দু একটি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব হয়নি।

এই গ্রন্থে রাজনৈতিক ইতিহাস ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও বিনয় চৌধুরী। শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে লিখেছেন নরেশ চন্দ্র রায়, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ সিংহ ও বিনয় চৌধুরী। রাজনৈতিক ভাবধারা, ধর্মান্দোলন,

শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদ পত্র, শিল্পকলা ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে লিখেছেন নিশীথ রঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষ, রমেশ মিত্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, অমলেন্দু বসু, সরসী সরস্বতী, শশীভূষণ চৌধুরী, জগদীশ নারায়ণ সরকার, দিলীপ কুমার বিশ্বাস ও রাজ্যেশ্বর মিত্র।

অরুণ দাশগুপ্ত

পরিত্যক্ত গ্রামাঞ্চল ও অর্থনৈতিক ইতিহাস

১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে জার্মানীর মিউনিখ্ শহরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের সম্মেলনে প্যারিসের একটি সংস্থা (Ecol Pratique Des Etndes, VI section) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করে। বিষয়টির নাম দেওয়া যেতে পারে "পরিত্যক্ত গ্রামাঞ্চল ও অর্থনৈতিক ইতিহাস"। কিছুকাল পরে ঐ সম্মেলনে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধের একটি সংকলন ঐ নামে প্রকাশিত হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে বিষয়টিকে সংকীর্ণ এবং স্থানীয় ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সামগ্রিক সমস্যার ইঙ্গিত আছে—যেমন জনসংখ্যা নির্ধারণ, শহর ও শহরতলীর বাজার, ভূমির অধিকার এবং ভূম্যধিকারীর আইনগত স্থান, জমির উর্বরতা ও বিভিন্ন ধরণের কৃষিকার্য ইত্যাদি। যদিও আলোচনাটি প্রধানত ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তবু এ বিষয়টি বা এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা সম্পর্কে গবেষণা করার প্রচুর অবকাশ আছে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। সাধারণত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি এঁরা বিচার্যের মধ্যে এনেছেন। দশম শতাব্দীর আগে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান অল্প এবং তার ধারাবাহিকতা নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি নূতন নয়। বহুদিন ধরেই ইউরোপের ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে গবেষণা করে আসছেন। ফ্রান্সে জে. দুবী (J. Duby) ল রোয়া লাদুরী (Le Roy Laduri), জঁা, মবে (Jean Mauvret) এবং আরো অনেকে, জার্মানীতে আবেল (Abel), ইংলণ্ডে বেরেসফোর্ড (Beresford) এবং পোলাণ্ডে গিয়েইচ্সুস্কার (Giyeiszar) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেকদিন থেকেই এ জাতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন।

এঁরা যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রশ্ন হ'ল : গ্রামাঞ্চল পরিত্যক্ত হ'বার কারণ কি ? এর মূলে কি শুধুই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা রয়েছে ? বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ফল কেবলমাত্র সাময়িক। ভৌগোলিক ইতিহাস দিয়ে গ্রামত্যাগের অন্তর্নিহিত চরিত্র ও কারণ বোঝা যাবে না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বেও পুরাতত্ত্বের মাধ্যমে এই পরিত্যক্ত গ্রামাঞ্চলের যে ধারণা পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটি বড় ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে বিপর্যয়ের ফলে পরিত্যক্ত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সভ্যতার যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে। নীচের আলোচনায় দেখা যাবে যে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন নয়।

আসলে সমস্যাটি অত সরল নয়। গ্রামাঞ্চল ত্যাগের অন্য অনেক গভীর কারণ থাকতে পারে। যেমন কে, দুবী শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে নূতন চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, যুদ্ধের ফলে সেই চাপ কমে গেলে গ্রামাঞ্চলগুলি পরিত্যক্ত হতে থাকে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সংকটের সময় ঐ রকম অবস্থার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।

এছাড়াও অবশ্য অন্যান্য কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেছেন। ও. টিউলিপ (O. Tulip) এবং আর. ব্রুনেট (R. Brunet) দেখিয়েছেন যে পঞ্চদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রামাঞ্চল ত্যাগের মূলে কিছু অভিজাত এবং 'বুর্জোয়া' পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে। এই পরিবারগুলি নিজেদের জন্যে বড় বড় খামার (ফার্ম) তৈরী করার দিকে মন দিলে কৃষকদের পুরোনো জমি বেদখল হয়ে যায় এবং তারা অন্যত্র সরে যেতে থাকে। এই সামাজিক কারণের সঙ্গে কি ভৌগোলিক কারণের কোন সম্পর্ক নেই ? সাম্প্রতিক গবেষণায় আবার দেখা যায় যে, এর মূলে ভৌগোলিক কারণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইংরাজ ঐতিহাসিক বেরেসফোর্ডের মতে এর পেছনে রয়েছে খাদ্যশস্যের সংকট—অর্থাৎ খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস অথবা অন্য ধরণের কাজ আরম্ভ (যেমন পশুপালন বৃদ্ধি)। এই সবের ফলে অভিজাত পরিবারগুলি তাদের নিজেদের সংরক্ষিত এলাকা বাড়াতে থাকে। বেরেস্‌ফোর্ড দেখিয়েছেন যেসব অঞ্চলে পশুপালন ও কৃষি সমানভাবে রয়েছে সেই সব এলাকায় বেশী জমি পরিত্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্যারিসের দুজন বিশেষজ্ঞ জ্যাক্ লে গফ্ (Jacques Le Goff) ও রুজিয়েরো রোমানো (Ruggiero Romano) এ প্রসঙ্গে একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওঁরা এ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন।

একটি প্রশ্ন হল : প্রাকৃতিক কারণে একটি গ্রামাঞ্চল পরিত্যক্ত হ'লে সেই একই কারণে অপর একটি গ্রামাঞ্চল পরিত্যক্ত হয় না কেন ? এর কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এঁরা বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এঁরা লক্ষ্য করেছেন যে ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাসে গ্রামাঞ্চল পরিত্যক্ত হবার ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে, যদিও তার গতিবেগ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়েছে এবং এর সঠিক মূল্যায়ন এখনও সম্ভব হয়নি। আর একটি প্রশ্ন : কোন্ অর্থ নৈতিক অবস্থায় গ্রামবাসীরা গ্রামত্যাগ করে থাকে ? পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজারাজড়াদের শিকারের জন্য কোনো এলাকা সংরক্ষিত করার জন্যে যদি গ্রামাঞ্চল পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলেও আপাতদৃষ্টিতে একই জাতীয় দুটি ঘটনার পিছনের অর্থ নৈতিক অবস্থা ও তার ফলাফলের প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রামত্যাগের মূলে একটা গোটা দেশের অর্থ নৈতিক সংকট আছে ; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার অর্থ নৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে ভালোর দিকে চলেছে। আসল কথা প্রত্যেকটি গ্রামত্যাগের ঘটনার একটি অনন্যতা আছে—কোনোটি হয়ত মৃত্যুর হাত থেকে পলায়ন আবার অন্যটি হয়ত আরো ভাল করে চাষ করার জন্যে নূতন অঞ্চলে সরে যাওয়া। সুতরাং পরিত্যক্ত গ্রাম সব-সময়েই গ্রামীণ সভ্যতার সংকট সূচিত করে না, অর্থ নৈতিক উন্নতির ইঙ্গিতও দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ ফরাসী অধ্যাপক জঁা মঁত্রে বলেছেন গ্রাম পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন। যেমন একাদশ শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হওয়ার অর্থ মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়া—অপরদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ একই অবস্থার অর্থ কৃষির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ।

গ্রামাঞ্চল পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ যাই হোক্ না কেন, এর ফলে সারা মধ্য-যুগের ইউরোপে এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়েছিল যারা সর্বদাই ঘুরে বেড়াত—এক শহর থেকে অন্য শহরে, গ্রামাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে। জঁা মঁত্রে তাই বলেছেন যে দু'ধরণের লোক ছিল—স্থায়ী ও অস্থায়ী। আবার শহরগুলিতে এত লোক ভিড় করার ফলে কাজ পাবার সম্ভাবনা অনেক কম ছিল (কারণ একদল ভবঘুরেকে সর্বদাই সব রকম কাজ করার জন্যে পাওয়া যেত) ; ফলে একটি নির্দিষ্ট মানের উপরে দৈনিক রোজগার উঠতে পারত না।

ইউরোপীয় সভ্যতায় এইসব গ্রামীণ ভবঘুরেদের অবদান অনেক। এরা নিজেদের চাহিদা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ইতিহাসের সাম্প্রতিক গবেষণায় এরা এখনো উপেক্ষিত।

মনে রাখতে হবে যে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলকে বরাবরই উন্নতির ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে বেশী। ভবঘুরেরা গ্রামে থাকলে এদের শ্রমের (অন্যদের তুলনায়) ফলে গ্রামাঞ্চলের প্রভূত উন্নতি সাধন হতে পারত। একথা আজ অনস্বীকার্য যে, গ্রামবাসীদের শহরমুখী গতিবেগের জন্যে দায়ী অনেকাংশে শহরগুলি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই শহরগুলি নিজেদের সুবিধার জন্য ঐ গতিবেগকে ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এইসব ভবঘুরেদের শ্রমিকশ্রেণী পর্যায়ভুক্ত করার জন্যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে বহু শহরে। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে শহরগুলি সর্বদাই তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিল।

অনিরুদ্ধ রায়

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বাণিজ্য

সময় ১৭৮১-১৭৯৩। ইউরোপীয় উৎপাদন ও দূরপাল্লার বাণিজ্য ব্যবস্থা এই ক'বছরে একাধিক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন; একদিকে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ, অন্যদিকে ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতার দ্রুত সম্প্রসারণ। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের plantationsএ নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ তখনো বিপুল; ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের বহু পরিবারের অর্থভাগ্য জড়িত এই দ্বীপগুলির সমৃদ্ধির সঙ্গে। তবু St. Domingoতে বিপ্লবজনিত বিপর্যয়ের আগেই plantation ভিত্তিক অর্থনীতির জরা প্রকট হয়ে উঠছে, যার অন্যতম প্রকাশ, দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাতে। অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য ক্ষেত্রে লাভের নতুন আয়োজন, যার কেন্দ্র বাংলাদেশ। ইংল্যাণ্ডের অনস্বীকার্য প্রাধান্য সত্ত্বেও সেখানে অন্য ভাগীদারদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করবার মতো নয়।

এই ভাগীদারদের দলে আছেন ফরাসী স্বাধীন বণিক ও ব্যবসায়ীর দল; ১৭৬৯ থেকে ১৭৮৫, ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপ আর পুনর্গঠনের মাঝের বছরগুলিতে যাঁদের তৎপরতা ভারতবর্ষে সুস্পষ্ট। অনেকের মতো মার্সেই নিবাসী Autoino Jean Solier তাঁর নিজস্ব কোম্পানী চালু করেন (১৭৮১)। ১৭৮১—১৭৮৯ এই আট বছরের উনিশটি বাণিজ্য অভিযানের প্রস্তুতি, লাভক্ষতির হিসাব নিকাশ, অংশীদারদের নামের ফর্দ সম্বলিত দলিল সঙ্কলন

করেছেন Louis Dermigny 'Cargaisour Indiennor' নামে (প্যারিস ২য় খণ্ড, ১৯৫৯। ১ম খণ্ড, ১৯৬০)। সঙ্গে রয়েছে ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ব্যবসায়ী মহলের অনুকরণীয় বাহুল্যবর্জিত ভাষায় Captain ও Supercargo দের প্রতি নির্দেশ। দলিলটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভরত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যজালের কতকগুলি মূল গ্রন্থি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মরিশাস দ্বীপের তৎকালীন গুরুত্ব আর করমণ্ডল উপকূল এবং বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যে সুইস ও Huguenot বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ভূমিকা। সঙ্কলনটির প্রথম খণ্ডে Dermigny দলিলটিকে প্রধানতঃ পশ্চিমী পাঠকবর্গের বোধগম্য করবার উদ্দেশ্যে এর পশ্চাৎপট ও মূল বক্তব্যকে কতিপয়ের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর অন্যতম সিদ্ধান্ত হ'ল, এই "Book of Expeditions' তৎকালীন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক বিন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সাক্ষী। ঐ উনিশটি বাণিজ্য অভিযানের অংশীদারদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এই সময়ে বণিক ধনতন্ত্র (যার প্রতিপত্তির ভিত্তি ছিল পণ্যপাত্রার সামুদ্রিক বাণিজ্য) ক্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে প্রাক্‌যন্ত্রশিল্প যুগের ধনিকদের।

ইন্দ্রাণী রায়

নব পর্যায়
৩য় খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫

ইতিহাস

সম্পাদক :
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

With best compliments of :

UNITED MERCANTILE CORPORATION

GENERAL MERCHANT

&

COMMISSION AGENT.

55, BIPLABI RASH BEHARI BASU ROAD

(CANNING STREET)

'F' BLOCK-SECOND FLOOR,

C A L C U T T A - 1.

PHONE 34-2756

নব পর্যায় তৃতীয় খণ্ড ২য় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

অমলেন্দু দে

শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ৩ সংখ্যা ২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	৮১
হিন্দু কলেজ : নবাবঙ্গ : ঈশ্বর গুপ্ত ভবতোষ দত্ত	৮৭
বিশপ্ স্টাব্স্ সুবোধ কুমার মজুমদার	১০৫
ভারত সন্ধানী উইলিয়ম এডাম চিত্তব্রত পালিত	১২৩
লালা লাজপত রায়ের আত্মকথা অনুবাদক-কিরণ মৈত্র	১৪১

ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড | শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ | ২য় সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এটি একটি আবাসিক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয়। সমস্ত ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে হ'ত। কারণ এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিকার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি তিনটি ছাত্রাবাস ছিল। পুরনো ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের নামানুসারে দুটি ছাত্রাবাসের নাম হয় ঢাকা হল (Dacca Hall) এবং জগন্নাথ হল (Jagannath Hall)। জগন্নাথ হলে দু'শ এবং ঢাকা হলে প্রায় দেড়শ' হিন্দু ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা ছিল। তৃতীয় ছাত্রাবাস মুসলিম হলে প্রায় তিনশ' ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পুরনো ঢাকা কলেজের হোস্টেলে ঢাকা হল হয়। আর দুটি হলের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র এই তিনটি ছাত্রাবাসে থাকত না, তাদের প্রত্যেককে হিন্দু হ'লে ঢাকা কিম্বা জগন্নাথ হলে, আর মুসলমান হ'লে মুসলিম হলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হ'ত। অর্থাৎ প্রত্যেক হলে যে সব অনুষ্ঠান হ'ত, তাতে যে কেবল তাদের যোগ দেবার অধিকার ছিল তা নয়, এটা তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলে গণ্য হ'ত। প্রত্যেক হলের জন্য একজন প্রোভোস্ট (Provost) এবং তাঁর অধীনে দু'জন হাউস টিউটর (House Tutor) ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকদের কোন না

কোন হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হ'ত। এঁদের কর্তব্য ছিল প্রত্যেক হলের ছাত্রদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখা, তাদের নানা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের সব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। হলে যে-সব ছাত্র থাকত তাদের সম্বন্ধে সকল রকম ব্যবস্থা করাই ছিল হাউস টিউটরদের প্রধান কাজ। এঁরা ছাত্রদের খাওয়া দাওয়া তদারক করতেন, রাত্রে নাম ডেকে দেখতেন সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে হলে ফিরেছে কিনা। কাউকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত দেখলে তার নামে রিপোর্ট করতেন। প্রোভোস্টের কর্তব্য ছিল কলেজের অধ্যক্ষের অনুরূপ। তবে লেকচার প্রভৃতি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ে হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটোরিয়াল ক্লাশের কথা পূর্বেই বলেছি। প্রথম প্রথম এই ক্লাশগুলি হলেই নেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাতে নানা অসুবিধা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়েই টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেওয়া হ'ত। প্রত্যেক হলে একটি বড় সভাকক্ষ (lecture hall) ছিল এবং এই কক্ষে একটি উচ্চ মঞ্চও ছিল। এই কক্ষে ছাত্রদের নানারকম সভা এবং নাট্যাভিনয় হ'ত। হলগুলি ছিল খুব বড়; তাতে প্রায় ছ'সাতশ' লোকের বসবার জায়গা হ'ত। স্বাধীনতা-লাভের পর জগন্নাথ হলের এই সভাকক্ষেই পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার অধিবেশন হ'ত।

জগন্নাথ হলের সভাকক্ষের দু'পাশে অনেকগুলি ছোট বড় ঘর ছিল। সেগুলি প্রোভোস্টের বসবার ঘর, অফিস এবং লাইব্রেরীর জন্য ব্যবহার হত। যেসব শিক্ষক একটি হলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতেন তাদের প্রত্যেককে এক একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রদলের তত্ত্বাবধান করতে হ'ত। সভাকক্ষের পাশের কতকগুলি ছোটঘরে শিক্ষক ও ছাত্রদের বসবার ব্যবস্থা ছিল; কয়েকটি ঘর আবার অসুস্থ ছাত্রদের থাকার জন্য আলাদা করে নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বেতনভোগী বড় ডাক্তার ছিলেন। তিনি প্রত্যেক দিন তিনটি হল ঘুরে অসুস্থ ছাত্রদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি ঔষধালয়ও ছিল। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ছাত্রেরা সেখানে বিনামূল্যে ঔষধ পেত। প্রত্যেক হলে একটি বড় খাওয়ার ঘর ছিল। জগন্নাথ হলে দুটি পৃথক বাড়ী থাকায় প্রত্যেক বাড়ীতে আলাদা খাওয়ার ঘর ছিল। নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই

এই ঘরে গিয়ে খেতে হবে। কিন্তু এ নিয়ে দুটি হিন্দু হলে প্রথমে কিছু গোলমাল আরম্ভ হয়। কয়েকটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাত্র অন্য জাতির ছাত্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে খেতে রাজি হ'ল না। জগন্নাথ হলে এই গোলমাল এড়াবার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ছাড়া অন্য সকল জাতির ছাত্রকে দুটি বাড়ীর মধ্যে একটিতে জায়গা দেওয়া হ'ত, যাতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা অন্য বাড়ীতে পৃথকভাবে থাকতে পারে। কিন্তু ক্রমে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্য জাতির ছাত্রেরা আন্দোলন সুরু করে এবং একবার সরস্বতী পূজার সময় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ঢাকা ও জগন্নাথ—দুটি হলেই খুব ধুমধামের সঙ্গে সরস্বতী পূজা হ'ত। এই উপলক্ষে যাত্রা ও গীত বাদ্যের অনুষ্ঠানও হ'ত। পূজায় গোঁড়া ছাত্রেরা আলাদা অঞ্জলি দিত। কিন্তু একবার অন্য ছাত্রেরা আপত্তি জানিয়ে বলল যে, তারা কাউকে পৃথক অঞ্জলি দিতে দেবে না সকলকে একসঙ্গে অঞ্জলি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার ঘরের কথাও উঠল। তখন আমি ছিলাম জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট এবং ঢাকা হলের প্রোভোস্ট ছিলেন ডঃ (পরে স্যার) জ্ঞান ঘোষ। আমরা দুজনে পরামর্শ করে আর কোন উপায় না দেখে ছাত্রদের ডেকে বললাম যে, তোমাদের কারুর কোন ধর্ম বিশ্বাস বা সংস্কারে আমরা আঘাত দিতে চাই না। কিন্তু যেহেতু আমরা হলের প্রোভোস্ট এবং সকল ছাত্রই আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, এই অবস্থায় যদি সকল ছাত্র একসঙ্গে অঞ্জলি না দেয় তাহলে আমরাও প্রচলিত প্রথামত ছাত্রদের সঙ্গে একত্র হয়ে অঞ্জলি দেব না। কারণ একদল ছাত্রর সঙ্গে মিলে আমরা অঞ্জলি দেব, আর এক দল তাতে যোগ দেবে না—এটা খুবই বিসদৃশ দেখাবে। আর আমরা তোমাদের সরস্বতী পূজার কোন অনুষ্ঠানে বা ভোজে যোগ দেব না। কিছুক্ষণ এই নিয়ে খুব হৈ চৈ চলল। তারপর ছাত্ররা একসঙ্গে অঞ্জলি দিতে এবং খাওয়ার ঘরে একসঙ্গে বসে খেতে রাজী হ'ল। তবে প্রথম কয়েক বছর চার পাঁচ জন খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাত্রের জন্য আমরা তাদের থাকবার ঘরে বসেই খাওয়ার ব্যবস্থা করি। পরে এ প্রথা উঠে যায়। ব্রাহ্মণ থেকে নমঃশূদ্র পর্যন্ত সকল জাতির ছাত্র একই ঘরে বসে খেত। এই একত্রে খাওয়ার ব্যাপারটি একটি খুব বড় রকমের সংস্কার বলে আমরা

মনে করতাম। কারণ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা একবার ঢাকায় গিয়ে এই ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন যে, তিনি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাকে পানীয় জল দেওয়া হ'ত না। কারণ অন্য ছাত্রেরা তাতে আপত্তি করত। পানীয় জল বন্ধ করার জায়গায় একেবারে একসঙ্গে বসে আহার করা —পনর কুড়ি বছরের মধ্যে এরকম একটি গুরুতর পরিবর্তন দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন।

প্রত্যেক হলে ছাত্ররা নানারকম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত। এজন্য কয়েকটি আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। যেমন, ১। ক্রীড়া (ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, টেনিস). ২। সাহিত্য ও পত্রিকা, ৩। বিতর্ক সভা, ৪। নাট্যাভিনয়, ৫। সমাজ সেবা। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন সেক্রেটারী এবং একটি ছোট কর্ম সমিতি প্রতি বছর নির্বাচিত হ'ত। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য এবং সাধারণভাবে হলের ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর অতিরিক্ত কর্মসূচী স্থির করার জন্য হল ইউনিয়ন এবং তার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হতেন। প্রোভোস্ট এই হল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হতেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়। তখন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও আইন ব্যবসায়ী ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ। তিনি জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট নিযুক্ত হন। আমিও জগন্নাথ হলের সঙ্গে শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলাম। তিন বৎসর পরে ১৯২৪ সালে যখন নরেশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী ছেড়ে আবার কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেন, তখন আমি জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট পদে নিযুক্ত হলাম। সেই থেকে তের বৎসরকাল অর্থাৎ ভাইস চ্যান্সেলার হওয়া পর্যন্ত আমি এই জগন্নাথ হলের প্রোভোস্টের কাজ করেছি। এই কয়েক বৎসর আমার জীবনের একটি স্মরণীয় যুগ বলে মনে করি। কারণ প্রোভোস্ট হিসেবে প্রতি বছর প্রায় দু'তিনশ' নূতন ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটত। ছাত্রদের অনেককেই আমি ভালভাবে জানতাম। তাদের প্রতিটি কর্মসূচীতে সাধ্যমত যোগ দিতাম এবং সাহায্য করতাম। জগন্নাথ হলের সাহিত্য বিভাগের খুব নাম ছিল।

জগন্নাথ হল থেকে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। তার নাম ছিল বাসন্তিকা। হলের ছাত্র এবং সংযুক্ত শিক্ষকেরা এই পত্রিকায় লিখতেন। সে সময়ে কয়েটি ছাত্রের রচনা পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হই। আমার এই বিচার-শক্তি যে খুব ভ্রান্ত ছিল না, তার প্রমাণ এদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তী-কালে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের একজন মন্মথ রায় এর একাঙ্ক নাটক জগন্নাথ হলে অভিনীত হয়েছে। আজ একাঙ্ক নাটক লেখকদের মধ্যে মন্মথ রায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত। আর একজন বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্য জগতে আজ বিশেষভাবে পরিচিত। বুদ্ধদেবের কয়েকখানি ছোট নাটক হলে অভিনীত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক। জগন্নাথ হলে থাকতেই সে তার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। অজিত দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

নাট্যাভিনয়ে জগন্নাথ হলের খুব খ্যাতি ছিল। হলের কয়েকজন ছাত্র পরবর্তীকালে সাধারণ নাট্যশালায় যোগ দিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। সুসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন এবং মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে নিজে অভিনয় করতেন। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা এবং আরও কয়েকখানি নাটক তিনি পরিচালনা করেন এবং তাতে নিজেও অংশ গ্রহণ করেন। এগুলি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। জগন্নাথ হলের আর একজন ছাত্র প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে প্রবোধ জগন্নাথ হলের অভিনয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে প্রবোধ কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হয়েছিল।

অভিনেতা হিসেবে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য—সে হ'ল সুদেব বসু। একবার ভারত সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লেখেন যে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জন্য তারা যেন দু'জনকে মনোনীত করেন। আমি এই কাজের জন্য সুদেবকে মনোনীত করেছিলাম এবং সে-ই এই চাকুরি পায়। সুদেব পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ডিরেক্টর হয়েছিল। এখন সে আকাশ বাণীর দিল্লী অফিসে উচ্চপদে আছে। ঢাকা শহরে জগন্নাথ হলের নাটকের এমনই

সুনাম হয়েছিল যে, অভিনয়ের সময় টিকিট প্রার্থীদের মধ্যে অনেককেই বিমুখ করতে হ'ত।

জগন্নাথ হলের সমাজ সেবা বিভাগও খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হ'ত। কয়েকজন সমাজসেবী ছাত্র নানাদিক থেকে এই বিভাগটির যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেছিল। জগন্নাথ হল থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি গ্রামে নিম্ন শ্রেণীর ছেলেদের জন্য এরা একটি নৈশ বিদ্যালয় চালাত। পালাক্রমে দু'জন ছাত্র প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে পড়াত। সমাজ সেবা বিভাগের এ কাজের জন্যই ঐ বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র পরবর্তী কালে ভাল চাকুরী পেয়েছে। এদের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীর এক ছাত্র এখন বড় সরকারী চাকুরী করে। আমার সঙ্গে আজও সে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে।

(ক্রমশঃ)

———

হিন্দু কলেজ ঃ নব্যবঙ্গ ঃ ঈশ্বর গুপ্ত

ভবতোষ দত্ত

(২)

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইতিপূর্বেই 'নববিশিষ্ট শিষ্টগণসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেছিলেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তার বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই বলা হয়েছিল 'ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিকমতাবলম্বী মান্যামান্য বিবেচনাশূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না।' তখন 'ধর্মদ্বেষী' বলতে বোঝাত উদারপন্থী ও ধর্মসভার বিরোধী মতাবলম্বী ব্যক্তিকে। সুতরাং ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার প্রকাশকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মনোভাব কি ছিল সহজেই অনুমেয়। ঠিক এই সময়েই কলকাতায় ডিরোজিও এবং নবাবঙ্গের আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠছে এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এই সময়ের সংবাদ প্রভাকরের ফাইল পাওয়া যায় না। সেজন্য এই আন্দোলন সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের মতামতের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়ার উপায় নেই। তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মনোভাব পরোক্ষভাবে জানা যায় অন্য পত্রিকার উদ্ধৃতি এবং মন্তব্যের সাহায্যে। ১৮৩১এর ১২ই ফেব্রুয়ারি সমাচার দর্পণ পত্রিকায় 'বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম' – এই শিরোনামার একটি খবর বের হয়।১

"পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দু ধর্ম্মনাশোচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যে হেতুক প্রভাকর প্রকাশকের যুক্তি উক্তি দ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।"

সংবাদ প্রভাকর প্রথমবার প্রকাশিত হয়ে মাত্র এক বৎসর চার মাস চলেছে। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মসভাবিরোধীদের—এবং সহজেই অনুমান করা যায়—নব্যবঙ্গদের যথেষ্ট কটূক্তি ও সমালোচনা করেছিলেন।[২] ১৮৩২, ২রা জুনের সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত সমাচারচন্দ্রিকার একটি খবর[৩] বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করতে হয় যেগুলি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

"প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকর নামক এক সমাচারপত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ সর্জ্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশ পূর্বক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন পাওয়া ভার।...সং চং

এই সংবাদ অনুযায়ী ১২৩৭-এর মাঘ থেকে ১২৩৮-এর মাঘ পর্যন্ত শুক্রবারে প্রকাশিত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মাঘ মাসের পর তিনি সম্পাদনা ত্যাগ করেন। তার পরেও চার মাস পত্রিকা চলেছিল নিশ্চয়ই যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে কিন্তু কার সম্পাদনায়, ঠিক জানা যায় না।

এই এক বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে নবশিক্ষার আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিওর সমালোচনা করে বস্তুতঃ ধর্মসভার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ১৮৩২-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি যতদিন সম্পাদক ছিলেন, ততদিন তিনি 'বিলক্ষণরূপে ধর্ম্মপক্ষ', কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ছেড়ে গেলে সংবাদ প্রভাকরের

মতামতের উগ্রতা কমে আসে এবং তখন 'ধর্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ'ও করা হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা যায় ঈশ্বর গুপ্তের নব্য আন্দোলনের সম্বন্ধে মতামত যথেষ্ট কঠোর ছিল। ইতিমধ্যে ডিরোজিওর প্রভাব ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছে এই অভিযোগে ১৮৩১-এর পঁচিশে এপ্রিল তাঁকে পদত্যাগ করানো হল। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমসাময়িক পত্রিকায় যে-সব লেখা হয়েছিল, সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্তের লেখাও তাদের অন্যতম। তিনি ঠিক কি লিখেছিলেন জানা যায় না. তবে তাঁর লেখার উল্লেখ এবং তার প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়।

হিন্দু কলেজের পরিচালক সভার কার্যবিবরণীতে কলেজের সেক্রেটারি লক্ষীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্রের নকলে দেখা যায় ১৫ই এপ্রিলের সংবাদ প্রভাকরে হিন্দু কলেজের শিক্ষকের সমালোচনা করে একটি পত্র প্রকাশিত হয়।৪

Read the following correspondence with the Editor of the Sumbad Probhakar.

To

The Proprietor of Sumbad Probhakar

Sir,

Having observed a letter in your paper of the 1st April No 12 reflecting in very unbecoming language upon the character of the teachers of the Hindoo College, I have to request your informing me of the writer's name that legal measures may be adopted for his punishment.

I am

Hindoo College　　Lyckynarain Mookerjee

the 19 April 1831　　Secy. H. College

এই পত্র পেয়ে ঈশ্বর গুপ্ত যে পত্র দেন তার নকলও সেই সঙ্গে দেওয়া আছে।

To

The Secretary of the Hindoo College

Sir,

In acknowledging the reciept of your letter dated 19th instant requesting me to furnish you with the name of the author of a certain article appeared in the 12th No. of the Probhakar I am authorised in the name of the writer to inform you that he neither had the least intention nor did he mean by the language of his letters to bring the College institution or the characters of its teachers and Members as a body into hatred and contempt or ridicule. You will under this consideration see how far I should be justified as an Editor of a public journal to meet your calls as Secretary of the College when the writer positively denys any intention to have offered any unbecoming language either towards the instisution or its members as a body which assertion he denys will be manifested by referring to the article in question.

I am etc.

Isher Chunder Gopto

23rd April 1831 Editor Proprietor of Probhakar

ঈশ্বর গুপ্তের এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে পরিচালক সভা এই চিঠি দিলেন—

Resolved that following letter be written to the editor.

To

The Editor of the Sumbad Probhakar

Sir,

I am desired by the Managing Committee of the Hindoo College to inform you that having laid before them your letter of the 23rd Instt it has not been considered as altogether satisfactory. They except therefore that in your next number you will express your regret for having admitted into your paper a letter containing such improper and unfounded imputations against the teachers of the Hindoo College.

ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের এই বাদবিতর্কে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষ সমর্থন করেন ২৬এ এপ্রিল ১৮৩১-এর সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশ করে।৬ তাতেই প্রকাশ পায় প্রায় সাড়ে চারশ' ছাত্রের মধ্যে প্রায় দু'শ' কলেজে আসা বন্ধ করেছে। জনরব, গোপীমোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর, নবীনকৃষ্ণ সিংহ, আশুতোষ দেব প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বালকদের পাঠানো বন্ধ করেছেন।

স্মরণীয় এই যে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি যে-সভায় আলোচিত হচ্ছিল, সেই সভাতেই ডিরোজিওর কর্ম্মাবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সংবাদ গোপন ছিল না। হয়তো সমালোচনার ফল ফলতে দেখে ঈশ্বর গুপ্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করে সংবাদপত্রে ত্রুটি স্বীকার করেন নি। ১৮৩১-এর ১১ই জুনের পরিচালক সভার অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়৭—

Resolved that measures be adopted for proceeding against the Publisher and Editor of Probhakar legally and Mr. Hare be requested accordingly to communicate

with Mr. Stacy upon the subject and empower him to write to the proper parties.

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল অনুমান করা যায়। কেননা ঈশ্বর গুপ্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছিলেন। ১৮৩১-এর ২রা জুলাইয়ের অধিবেশনের বিবরণ৮—

No 13. Read a letter from Isher Chundro Goopto the Editor of the Probhakar.

Resolved that the letter be recorded but that it be still expected that he shall insert in his Paper a further apology to be written for him.

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইলেও প্রকাশ্যে কাগজে ত্রুটি স্বীকার করতে চান নি বলেই মনে হয়। ফলে ৩০-এ জুলাইর অধিবেশনে দেখি৯—

Resolved that the papers relative to the Editor of Probhakar Isher Chundro Goopto be sent to Baboo Chundro Coomar Tagore who promised to get the matter settled and has the authority of prosecuting him if necessary without further reference.

চন্দ্রকুমার ঠাকুর তখন হিন্দু কলেজের অন্যতম গবর্ণর। তিনি গোপী-মোহন ঠাকুরের পুত্র এবং ঈশ্বর গুপ্তের পৃষ্ঠপোষক যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতাত। হয়তো তিনিই মধ্যস্থ হয়ে এই ব্যাপারে পরিসমাপ্তি ঘটান। ঈশ্বর গুপ্ত যে ১৮৩২-এর জানুয়ারি মাসে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদনা ত্যাগ করেন, সেটা এই ব্যাপারেরই জের কিনা বলা শক্ত। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ চরমে উঠলেও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর উগ্র মত ত্যাগ করেন নি। ১৮৩১-এর ১৪ই মের সমাচার দর্পণে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়।১০ তাতে জনৈক ব্যক্তি জানাচ্ছেন যে তাঁর ছেলে কলেজে লেখাপড়া শিখে ইংরেজি আচার শিখেছে এবং কালীঘাটের কালীকে প্রণাম না করে বলছে 'গুড মর্ণিং ম্যাডম্'! ১৬ই জুলাইএর সমাচার দর্পণে প্রভাকর

সম্পাদকের নিজস্ব রচনাই উদ্ধৃত হয়েছে।১১ হিন্দু কলেজের নেথারদের তিনি নিবেদন করছেন "হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতা পায় সবচুল মাথায় খালি অঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় ।"

ডিরোজিও কলেজ থেকে চলে গেলেও নব্যবঙ্গের আন্দোলন থেমে থাকে নি। ডিরোজিও ইস্ট ইণ্ডিয়ান নামক সংবাদপত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এনকোয়ারার পত্রিকা বের করলেন।১২ ১৮৩১-র ১৩ই জুন সার এডওয়ার্ড রায়ান বেন্টিঙ্ককে একটি পত্রে জানান কৃষ্ণমোহন টাউন হলে জন রিকেটের সম্বর্দ্ধনায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আয়োজিত একটি ভোজ সভায় যোগদানের ইচ্ছা জানিয়ে হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।১৩ রাজা রাধাকান্ত দেব কলকাতা স্কুল সোসাইটির সেক্রেটারি হিসাবে সার এডওয়ার্ড রায়ানকে অনুরোধও করেন তিনি যেন কৃষ্ণমোহনকে শিক্ষক পদ থেকে বরখাস্ত করেন।১৪ ২৩এ আগষ্ট কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে মাংসাহারের ঘটনা ঘটল যে-জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন।১৫ কৃষ্ণমোহন এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক দুইজনেই প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মবিদ্বেষ উগ্রভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। মাংসাহারের ঘটনার পর কৃষ্ণমোহন বিতাড়িত হয়ে The Persecuted নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেন Hindoo youthকে। উৎসর্গের তারিখ ১২ই নবেম্বর, ১৮৩১। ভূমিকায় তিনি বলেন,

The Author's purpose has been to compute its excellence by measuring the effects it will produce upon the minds of the rising generation. The consistencies and the blackness of the influential members of the Hindoo community have been depicted before their eyes. They will now clearly percieve the viles and tricks of the Brahmins and thereby be able to guard themselves against them…

এই নাটকটির একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়-পরিচয় দেওয়া দরকার। নাটকে পাঁচটি অঙ্ক। চরিত্র অনেকগুলি। কামদেব, দেবনাথ এবং রামলোচন সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল হিন্দু ভদ্রলোক। লালচাঁদ একটি পত্রিকার সম্পাদক (proprietor), মহাদেব, তর্কালংকার এবং বিদ্যাবাগীশ দুই কপটাচারী ব্রাহ্মণ; বানীলাল, শ্যামনাথ, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রকুমার, ভৈরব, কেদারমোহন সম্বলচাঁদ, হরিচাঁদ, রামমোহন এরা হিন্দু যুবক। দেবনাথের পুত্র দীননাথ। এই নাটক মূলত কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা অবলম্বনে কল্পিত।

পত্রিকা সম্পাদক লালচাঁদের ভূমিকাটিই বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে লালচাঁদের উক্তি—But care must positively be taken that he embibe not those dry and useless nonsense about TRUTH. I am sure Truth would have revived me if I had conformed to it. অনাচারীদের বিরুদ্ধে লালচাঁদ পত্রিকায় নির্বিচারে সত্য মিথ্যা লিখতে নির্দেশ দিয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে লালচাঁদ বলছে—Let this be a resolution of our *Sabha* not to allow children know that destroyes of all religion-Science. Do not let your children go to School.

আমরা দেখেছি, সে-সময় হিন্দু কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন বিশেষ ভাবে করেছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর। এই নাটকের পত্রিকা সম্পাদক এঁদেরই প্রতিনিধি। অন্ততঃ ঈশ্বর গুপ্ত মনে করেছিলেন এতে তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি তাঁর পত্রিকায় অত্যন্ত হীন ভাষায় কৃষ্ণমোহনকে আক্রমণ করেছিলেন।[১৬]

"প্রভাকর সম্পাদক কর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের ভাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।—শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপাহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ক্রিঙ্গি হিন্দু ইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুণ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের

কি করিবেন যে হেতুক তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্চা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভাল ২ বন্দা জেনো তাহার সাধামত কসুর করে না কিন্তু আমাদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্চা পত্র বন্দ বা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই এ হায়হীন ড্রেজো ভায়ার কর্ম্ম কেননা ড্রেজো ভায়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরার পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের বাটা অহিরাবণ কি হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রেজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার নামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালা মেন বাঙ্গালিদিগের ঘতে করিতে পারিবে না অতএব হে ভায়া সামাল ২ তোমার জাঁকজমকরূপ ঝুরতি টুপি কেড়ে নিয়ে ফুরতি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঈশ্বর গুপ্ত পরবর্তী কালেও ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করেছেন। কারণ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বণের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আন্দোলন করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত তখন তাতে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করলেও তাঁর স্বজাতিপ্রীতি-স্বধর্মপ্রীতি চিরকালই অটুট ছিল। নব্যবঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম স্বধর্ম্মপ্রীতিরই রক্ষণশীল মনোভাবেরই প্রকাশ। এই গোঁড়ামির মনোভাবটি তাঁর হয়তো পরে ছিল না। নব্যবঙ্গের অন্যতম মাধবচন্দ্র মল্লিকের সঙ্গেও তাঁর একবার বিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছিল ১৮৩১-এর অক্টোবর মাসে। স্বধর্ম্মপ্রীতির অত্যুৎসাহে তিনি সম্ভবত একবার অসত্যের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। ১৮৩১-এর জুন মাসে হিন্দু কলেজের "প্রাক্তন ছাত্র রাধানাথ পাল 'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। মাধবচন্দ্র মল্লিক ঐ স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রভাকর জানায় গঙ্গাচরণ সেন রাধানাথ পাল এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক স্কুলের একটি সভায় "প্রস্তাব করিলেন যে যে কএকজন মেম্বার হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষী ও দুঃসাহসিক কর্ম করিয়া ধর্ম নষ্ট করে তাহাদিগের সহিত আমার কোন বিষয়ের অংশ রাখিব না…"প্রভাকরের এই

সংবাদের প্রতিবাদে মাধবচন্দ্র মল্লিক ৮ই অক্টোবর একটি কঠোর পত্র প্রকাশ করেন সমাচার দর্পণে।১৭ এই দীর্ঘ পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিকের একটি উক্তি সুপরিচিত হয়েছে—

"...অতএব হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থ উপায় যে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারী মতের মুরুব্বি প্রভাকর সম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাঁহার মত অর্থাৎ হিন্দুধর্মের সপক্ষ ইহা তাঁহার সম্বাদপত্রে তূরীবাদ্যের ন্যায় প্রকাশ করাতে কি তিনি আমারদিগকে মিত্রতা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাঁহার ভরসা থাকে তবে তাহা নিতান্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোনো ঘৃণা বস্তু না।"

ঈশ্বর গুপ্ত যতদিন প্রথম পর্যায়ে প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন, ততদিন তিনি হিন্দু কলেজের নানা সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু ২১এ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত সংবাদতিমির নাশকের একটি প্রবন্ধে 'কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের উৎপত্তি' সংবাদ প্রভাকরের বিবরণে মনে হয় সম্পাদকত্ব ত্যাগ করবার প্রাক্কালে তাঁর মতামতের উগ্রতা কিছু হ্রাস পেয়েছিল। সমাচার চন্দ্রিকার খবরে বোঝা যায় ঈশ্বর গুপ্ত ছেড়ে দেওয়ার পরে প্রভাকর ধর্মসভা বিরোধী হয়েছিল। কিন্তু এই খবরে দেখা যায় ঈশ্বর গুপ্তের নিজের মতামতেই কিছু পরিবর্তন এসেছিল।

'সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্ম পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল। নচেৎ তাহাতে মুন্সীয়ানা বা বিদ্যাবুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিকদিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দু সমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোকি নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধর্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি তাহার তাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জামি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরুব্বির যোগ্যতা।'

এই পরিবর্তনের কারণ কি সঠিক বলা যায় না; তবে অনুমান করা যায় হয়তো হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর যে বিবাদ হয়েছিল, এটা তারই ফল।

চন্দ্রকুমার ঠাকুরের হাতে মানানসার ভার দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ প্রভাকর তাঁরই পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হত। সম্ভবত তিনি তরুণ ঈশ্বর গুপ্তকে (তখন তাঁর বয়স কুড়ি পূর্ণ হয়নি) কিছু বলে থাকবেন। এই ঘটনার শেষ পরিণাম হয়তো ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকত্ব ত্যাগ।

যে মাসে তিনি সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেছিলেন, সেই মাসেই সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সম্ভবত এটা ঈশ্বর গুপ্তের থাকার সময়েই হয়েছে। ডিরোজিও নব্যশিক্ষিতদের কাছে যে সব মুক্তবুদ্ধি দার্শনিকদের মতামত তুলে ধরতেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন টম পেইন। এদেশে তখন টম পেইনের রচনার যথেষ্ট চাহিদা ছিল। চাহিদা বুঝে আমেরিকার জনৈক পুস্তক প্রকাশক টম পেইনের 'এজ অব রিজন' শতাধিক কপি এদেশে পাঠান। পাঁচ টাকা দিয়েও এক এক খণ্ড বই বিক্রী হতে লাগল। সেই দামেই বই কয়েক দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল।১৮

পাদ্রী আলেকজাণ্ডার লিখেছেন এই সময়ের নানা আন্দোলনের মধ্যেও একটি বিষয়ে সকলের মধ্যে মিল ছিল—খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিদ্বেষ সকলেই পোষণ করত। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে শিক্ষা দেন নি, যেমন দেননি হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে। আবার রক্ষণশীল যারা, তাঁরাও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি, বলাই বাহুল্য, কোনো অনুকূলতা পোষণ করতেন না। ডাফ চেয়েছিলেন স্থির বিশ্বাসের অভাবের সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে। এ কথাও ঠিক যে এই সময়ে ডিরোজিওর ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।১৯ টম পেইনের ধর্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিকে দুই দলই ব্যবহার করেছিল। ডাফ লিখেছেন২০—

Here the evel genius of Paine was again resuscitated. Passages from his Age of Reason were often translated verbatim in the Bengali and inserted in the native newspapers. The editor of one of these published a seperte pamphlet attacking

the Bible on the score of its alleged inconsistencies. A copy of it he transmitted to me, with his compliments, challenging a reply. I found it to consist chiefly of patched extracts from Paine, clothed in a Bengali garb.

এই পত্রিকা সম্পাদক হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সমসাময়িক পত্রিকার সাক্ষ্য ২১—

Some one soon after took the trouble to translate some part of Tom Paine's Age of Reason into Bengalee and to publish it in the Prabhakur, calling upon the missionaries and upon the venerable character by name to reply to it.

তখনকার দিনে পত্রিকায় লেখকদের নাম থাকত না। সুতরাং প্রভাকরে এই অনুবাদ ঠিক কে করেছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বলা কঠিন। তবে নব্যবঙ্গ এবং খ্রীষ্ট ধর্ম বিরোধী আন্দোলনে ধর্মসভাপন্থী ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা দেখে মনে হয় এই অনুবাদ হয়ত তাঁরই। তখন বাংলা-লিখিয়ে এবং এই আন্দোলনে উৎসাহপূর্ণভাবে বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশ্বর গুপ্ত। ভবানীচরণের নিজেরই পত্রিকা ছিল; তা ছাড়া তিনি তখন যথেষ্ট প্রবীণ। ঈশ্বর গুপ্তের বয়স কম। স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ডাকে নিজের রচনা পাঠিয়ে দেবার মতো উৎসাহ সেই বয়সেই স্বাভাবিক। এই রচনাটি আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু লঙের বিবরণ দেখা যায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পেইনের অনুবাদটি পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল।২২

In 1834 a book had appeared against Christianity chiefly a translation of Paine's Age of Reason.

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদনা ত্যাগ করলে প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কি হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ১৮৩২-এর জুলাই মাসে আন্দুলের জগন্নাথ প্রসাদ

মল্লিক 'সংবাদরত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা ধর্মসভাপন্থী ছিল, এটুকুই জানা যায়। মতামতের কোনো নিদর্শন নেই।

নব্যবঙ্গ আন্দোলনের সময় সংবাদ প্রভাকরের প্রথম প্রকাশকালে ঈশ্বর গুপ্ত রক্ষণশীল মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনোভাবের বহুল পরিবর্তন হয়।২৩ বলতে গেলে তিনি নব্যবঙ্গদলের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন। নব্য-বঙ্গদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভাতে (১৮৩৮) তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সভার সদস্যতালিকাতে তাঁর নাম ১৮৪২ এবং ১৮৪৩এ দেখতে পাই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁরা গোঁড়া রক্ষণশীল বলে পরিচিত তাঁদের কাউকেই এই সভার সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাই না। মাধবচন্দ্র মল্লিক এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁদের সহগামী বন্ধুদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তকেও জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য হতে দেখি, তখন আর সন্দেহ করবার উপায় থাকে না যে তাঁর মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। সম্ভবত জ্ঞানো-পার্জিকা সভার অন্যতম সদস্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এখানেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। কালেকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত। তার একটি মন্তব্য 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' উদ্ধৃত করেছিল২৪—

The Probhakar must be noticed as one of the better issues from the Native Press. Its earlier numbers contain much well-managed and biting satires while its very later ones give to the Public the moral essays and addresses delivered in the Tattwabodhiny Sabha, a private society of immaterialists, arises out of the Brahmo Sabha. These are beautifully written ; they are the better moralizings of a select few of the followers of Ram Mohun Roy who disclaims idolatry and profess a species of Theophilanthropism which

indeed is the *ne-plus-ultra* of the Present Hindoo Philosoply—not unamiable but powerless.

রক্ষণশীল নয় বলেই ঈশ্বর গুপ্তের উপর মিশনারিদের বিরাগও আর নেই। উদারনৈতিক বলে ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির দ্বারা সমাদৃত হতে আরম্ভ করেছেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই।২৫

The Chundrika rose into notice on the shoulders of the Subha and cannot fail, in some measure to participate in the effects of its prostration. The Editor has now a powerful rival in the Probhakar which is supported by the influence of the liberal party and is edited by a Native of the Medical tribe who has few superiors as a Bengali writer.

১৮৩৮ থেকেই ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের নতুন অধ্যায়। উগ্র রক্ষণশীলতা চলে গিয়েছিল। যাঁদের বিরুদ্ধে একদা তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই তাঁর বন্ধু ও শুভার্থী হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর 'পার্সিকিউটেড' নাটক নিয়ে তিনি তীব্র কটূক্তি করেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে ১২৫৪ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে তিনি লিখেছিলেন২৬,

"বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্য বর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন।"

কবিতাতে স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ পরায়ণতার বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণমোহনকে নিয়ে বিদ্রূপ করলেও গদ্যরচনায় বহুবারই তিনি তাঁর সম্বন্ধে সংযত উল্লেখ করেছেন। তবে কতকগুলি বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত দৃঢ় আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন। স্বদেশ স্বজাতি এবং স্বধর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত চিরকালই গভীর মমতা পোষণ করতেন। লেক্সলোসি আইন তিনি সমর্থন করেন নি। সেই উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন, ২৭

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এইক্ষণে রেবরেণ্ড কে এম বানরজি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ইনি হিন্দু কলেজে সেং এইচ এস ভি ডোরেজু নামক

কিরিঙ্গি সাহেবের নিকট শিক্ষা করিয়া নাস্তিক হইয়াছিলেন. কোন ধর্ম্মই মান্য করিতেন না, পটলডাঙ্গায় আপনার বাটীতে গোমাংস ও মটন আহার করিতেন, প্রতিবাসি কোন ব্রাহ্মণের বাটির প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেন, তথায় গোহাড় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য দ্রব্যাদি ফেলিয়া দিতেন, তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া একদিবস তাঁহাকে গুরুতররূপে প্রহার করেন তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা ও অন্যান্য পরিবারেরা তাঁহাকে বাটি হইতে তাড়াইয়া দেন, কৃষ্ণমোহন স্বজাতি সমাজ ত্যক্ত হইয়া কোন স্থানে আশ্রয় না পাইয়া পরিশেষে মিশনারিদিগের বিধর্ম্ম মঠে গমন পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই বিবরণ যদ্যপি সত্য হয় তবে সাধারণে অবশ্য এমত বিবেচনা করিবেন যে বানরজি মহাশয় ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে খ্রীষ্টান হয়েন নাই।"

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ নিয়ে ১৮৩০ এর মতোই একটি চাঞ্চল্য হয়েছিল। হিন্দু ভিন্ন হিন্দু কলেজে কেউ পড়তে পারবে না, এই নিয়মটির পরিবর্তনের আয়োজন হতেই ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন[২৮]—

"নাগরিক হিন্দু বালকবৃন্দের ইংরেজী শিক্ষার যে এক প্রধান স্থান ছিল সম্প্রতি সে স্থানের অগ্রে অদ্য বর্ণের সংযোগ হইল, সুতরাং সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা আর তথায় বালক প্রেরণে সাহসী হইতে পারেন না, আমরা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম অনেক ধনিলোকেরা হিন্দু কলেজ হইতে অবিলম্বে আপনাপন সন্তানদিগের ছাড়াইয়া অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন, আমারদিগের এই প্রভাকরের জন্মকালীন 'ড্রোজু সাহেবি' হেঙ্গামায় একবার হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিতে হইয়াছিল, এইক্ষণে ২২ বৎসরের পর পুনরায় "মুসলমানি" "খ্রীষ্টানি" এবং "জারজী" এই ত্রিদোষ জন্য এই লেখনীকে আবার করসদনে নৃত্য করাইতে হইল।"

ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি মমতার বিষয় ছিল মাতৃভাষা। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে মাতৃভাষা চর্চায় ঔদাসীন্য দেখে তিনি ব্যথিত হয়ে "ইয়ং বেঙ্গল" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন : [২৯]

"যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, "ইয়ং বেঙ্গল" যুবকদলেরা স্বদেশের কল্যাণ করি বলিয়া সর্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে

হয় ? তাহারদিগের ভাষার শিক্ষাগুরু মহাশয়ের নিকট 'পরম কল্যাণীয়" পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা ? তাহা সন্দেহের বিষয় : অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা এবং ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাঁহারদিগের মঙ্গল চেষ্টার আদিসূত্রেই দোষ পড়িতেছে, ঐ মহাশয়েরা বিলক্ষণ সুধীর ও সুসভ্য এবং অনেকাংশে প্রতিজ্ঞাপালক বটেন কিন্তু এপথে কিঞ্চিৎ সুদৃষ্টি হইলে আমরা তাঁহাদিগের দ্বারা আশার অতীত কত অধিক ফল প্রাপ্ত হইতাম···উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি এ বৎসর টৌনহলে অতিশয় সদ্বক্তৃতা পূর্ব্ব বড় ২ ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবু যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নিমিত্ত বঙ্গভাষায় ঐরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন তবে অস্মৎ পক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত···"

ইয়ং বেঙ্গলদের সম্বন্ধে এই আক্ষেপোক্তিতে আর সেই নির্বিচার বিদ্বেষ নেই। স্বদেশ ও সমাজে তাঁদের বিদ্রোহের তাৎপর্য ঈশ্বর গুপ্ত যেন পরিণত বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছেন। তাঁদের আন্দোলনের অসম্পূর্ণতার দিকটি তিনি স্থিরতর বিচারণার সাহায্যে তুলে ধরেছেন। বাংলাভাষার সাহায্যে আধুনিক চিন্তা সম্পদকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী কালে বঙ্গদর্শন সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করায়।

পাদটীকা

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড পৃ ১১২

২। দ্রষ্টব্য 'সমাচার চন্দ্রিকা' ৯ মে ১৮৩১, সোমবার প্রেরিত পত্র—'হিন্দু কলেজের বিষয়ে বাঙ্গালা সম্বাদপত্র মধ্যে কেবল চন্দ্রিকা ইদানীং প্রভাকর ইংরাজী পত্র জনবুল এই পত্রত্রয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ শুনিতে পাই ইণ্ডিয়া গেজেট এবং হরকরা এবং অন্যান্য পত্র প্রকাশক মহাশয়রা তদ্বিষয়ে কি কারণ চুপ করিয়া আছেন কিছুই বুঝিতে পারি না....."

৩। স-সে-ক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১০

৪। হিন্দু কলেজ পরিচালক সভার (২৩ এ এপ্রিল ১৮৩১ এর সভার) কার্যবিবরণ (পাণ্ডুলিপি) পৃ ৪১

৫। ঐ পৃ ৪২-৪৩

৬। স-সে-ক, ২য়, পৃ ১৫

৭। হিন্দু কলেজ পরিচালক সভার কার্যবিবরণ (পাণ্ডুলিপি) পৃ ৫১

৮। ঐ পৃ ৬২

৯। ঐ পৃ ৭১

১০। স-সে-ক, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩১

১১। স-সে-ক, ঐ পৃ ২৩২

১২। ইস্ট ইন্ডিয়ান ডিরোজিওর কর্মত্যাগের পর এবং এনকোয়ারার প্রায় একই সময়ে ১৭ই মে প্রকাশিত হয়।

১৩। Woolstacraft, *Sketches of Hindu Youth* (Orient Peal, 1834) বইতে এ সময়ের নবাবঙ্গের কিছু পরিচয় পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

১৪। Bentinck Papers　দ্রষ্টব্য A.F.M. Salahuddin, *Social Ideas and Social Change in Bengal*, 1965, pp. 43-44

১৫। মন্মথ নাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৩২৪, পৃ ৫০-৫৩। এই ঘটনাটি ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৩তে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছিলেন। পরে দ্রষ্টব্য।

১৬। স-সে-ক, ২য় খণ্ড পৃ ১১৬, সমাচার দর্পণ ১৯ নবেম্বর ১৮৩১এ উদ্ধৃত।

১৭। স-সে-ক, ২য় খণ্ড পৃ ৪১-৪২। এর মূল ইংরেজিটি ছিল খুবই জোরালো — **"Does he think to be friendly with us by trumpeting in his paper that we are the promoters of his cause in the Hindoo religion ? Such hopes, we assure him are fruitless for if there be anything under heaven that either I or my friends look upon with the *most abhorrence* it is Hindooism. And if there be anything that we regard as the best instrument of evil it is Hindooism..."**

১৮। ***The Bengal Harkaru and Chronicle.*** **Monday Jan, 23 1832** সমাচার দর্পণ থেকে উদ্ধৃত সংবাদ। **Works of Tom Paine—We understand that some time since a large number of works of Tom Paine not for short of a hundred, was sent for sale to Calcutta from America...**

১৯। Alexander Duff, *India and India Mission*, 1840 Appendix

২০। পূর্বোক্ত গ্রন্থ

২১। *The Bengal Harkaru and Chronicle*, পূর্বোক্ত সংখ্যা

২২। Long, Descriptive Catalogue, Tract Sociotiy's Tract no. 38

২৩। ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় সংবাদ প্রভাকর পুনরুজ্জীবিত হয় ১৮৩৯, ১০ই আগষ্ট। তখন পত্রিকা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হত। ১৮৩৯এর ১৪ই জুন সংবাদ প্রভাকর দৈনিকে পরিণত হয়।

২৪। Friend of India, Fearuary 13,1840

২৫। ঐ November 8,1838

২৬। Ramchandra Ghosh, *Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjee L. L. D. CIE. Missionary scholar and, patriot*, Caloutta 1893, p.53। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন বইয়ের উপকরণ প্রধানতই তিনি কৃষ্ণমোহনের নিকট থেকেই সংগ্রহ করেছেন।

২৭। সংবাদ প্রভাকর, ৮ই ডিসেম্বর ১৮৫৩

২৮। সংবাদ প্রভাকর ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩। দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ১ম খণ্ড, ১৯৬২, পৃ ৩৩৭

২৯। সংবাদ প্রভাকর ১২ই এপ্রিল ১৮৭৮

———

বিশপ্ স্টাব্স্

সুবোধ কুমার মজুমদার

মেকলে-কার্লাইলের প্রভাবে ইংলণ্ডের ইতিহাস চর্চা যখন প্রায় সাহিত্যের অঙ্গীভূত, সাহিত্যের শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গনে কণ্ঠ তার যখন প্রায় রুদ্ধ হতে বসেছে, ঠিক সেই ক্ষণটিতে ক্লাসিক্সে সুপণ্ডিত, মধ্যযুগবিশারদ ঐতিহাসিক উইলিয়ম্ স্টাব্স্-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি অচিরেই প্রমাণ করলেন যে, নিছক সাহিত্যগুণ থাকলেই ইতিহাস যথার্থ ইতিহাস হয়ে ওঠে না : ইতিহাসের আলোচনা যদি মূল উপাদান-ভিত্তিক না হয়, যদি আকরগ্রন্থাদি ইতিহাসবিদের নাগালের বাইরেই থেকে যায় – তাহলে ইতিহাস পাঠের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা স্টাব্স্ উপলব্ধি করেছিলেন এবং দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ইংলণ্ডের ইতিহাস-চর্চার পুরোভাগে থেকে, সার্থক অধ্যাপনা ও মূল্যবান গবেষণা সহযোগে তিনি ইতিহাস সাধনাকে সহস্রগুণ সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে অক্সফোর্ডে ইতিহাস-চর্চার যে আদর্শ পীঠস্থানটি গড়ে ওঠে তার পঠন-পাঠন ও গবেষণা-রীতি তুলনামূলক বিচারে তৎকালীন অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অপেক্ষা উচ্চতর মানের ছিল। অক্সফোর্ডকে সারা ইংলণ্ডে ইতিহাস গবেষণার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার দুরূহ প্রচেষ্টায় স্টাব্স্ তাঁর ঐতিহাসিক বন্ধুদ্বয় গ্রীন ও ফ্রীম্যানের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তিন মহারথীর সম্মিলিত সাধনায় অক্সফোর্ড বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাস-আলোচনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হ'ল।

স্টাব্স্ যদিও সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বনেদী বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে প্রবেশ অধিকার পেয়েছিলেন, তথাপি তাঁর সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক ক্ষমতা ওখানকার গড়পড়তা অধিকাংশ অভিজাত শ্রেণী-সম্ভূত ছাত্রের তুলনায় নিতান্ত অনুজ্জ্বল ছিল।

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা উইলিয়ম্ মরলে স্টাব্স্ ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত Knaresborough-তে সামান্য আইন ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। আর পুত্র উইলিয়ম্ স্টাব্স্ বাল্যকালে রিপন গ্রামার স্কুলে

পাঠ সুরু করেন। কিন্তু ১৮৪২ সালে পিতার অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। দারিদ্র্য ও হতাশার ছায়া নামল সমস্ত পরিবারটির উপর। মা. মেরী এ্যান্, ছ'টি অপোগণ্ড শিশুর ভরণপোষণের চিন্তায় দিশেহারা হলেন। কোন রকমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করেছেন স্টাব্‌স্. এমন সময়ে পরিবারের এক বিশিষ্ট বন্ধুর সুপারিশে তিনি অক্সফোর্ডে ঢুকতে পারলেন। অক্সফোর্ড তখন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ওখানকার ছাত্রাবাসে থেকে যাতে কোনক্রমে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন এজন্য তিনি স্বেচ্ছায় সারভিটারের* কাজ নিয়েছিলেন। ক্রাইষ্ট্ চার্চে পড়ার সময় স্টাব্‌স ছিলেন অতিমাত্রায় লাজুক ও মুখচোরা ছাত্র। বড় ঘরের ছেলেরা এই দরিদ্র ছাত্রটিকে ঠিক অবজ্ঞা না করলেও, বোধহয় কৃপাদৃষ্টিতে দেখত। তাঁর সঙ্গে মেলামেশাও কেউ বড় একটা করত না। তাই ছাত্র-জীবন তাঁর নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছে। একমাত্র নেশা ছিল বই পড়া এবং অবসর কাটাবার একমাত্র স্থান কলেজ লাইব্রেরী। কি ভাবে আইনের পুরানো দলিল পড়তে হয়, ছোট বেলায় তিনি তা পিতার কাছে শিক্ষা করেছিলেন। এই শিক্ষাকে ছাত্র-জীবনে তিনি কাজে লাগালেন। লাইব্রেরীতে বসে দীর্ঘ সময় মধ্যযুগীয় দলিল দস্তাবেজ, চার্টার, ধর্মীয় সনদ প্রভৃতি পড়তে প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। তরুণ ছাত্রটির এই অদ্ভুত নেশা দেখে বিস্মিত হতেন অধ্যাপকেরা। তাঁরা তখন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ সম্বন্ধে গবেষণা করে এই ছাত্রটি একদিন অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হবে। নিদারুণ অর্থ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও স্টাব্‌স্ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে পড়াশুনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর সাধনা যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ ১৮৭৮ সালে ট্রাইপোজ পরীক্ষায় স্টাব্‌স্ ক্ল্যাসিক্‌স্-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন। (কিন্তু ক্ল্যাসিক্‌স্-এ সুপণ্ডিত হলেও অঙ্কশাস্ত্রে তিনি ছিলেন নিতান্ত কাঁচা; গণিতে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।) স্নাতক হবার পর দুবছর কাল স্টাব্‌স্ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নিযুক্ত ছিলেন। তারপর ১৮৫০-এ ফেলোশিপ্ ছেড়ে দিয়ে

* আগেকার দিনে অক্সফোর্ডে কোন গরীব ছাত্র menial duties করতে রাজী হলে তাকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হত। এরূপ ছাত্রকে সারভিটার বলা হ'ত।

এসেক্‌সের অন্তর্গত নেভন্‌স্টক্ কলেজের চ্যাপেলে ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে অবস্থান কালে মধ্যযুগ সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৫৮ সালে তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ ***Registrum Sacrum Anglicanum*** প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের এই বিখ্যাত দলিলটি সম্পাদনা করতে গিয়ে তাঁকে অসংখ্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুঁথিপত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এর দ্বারা চার্চ-ইতিহাসের এক মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হ'ল: যে-সব ধর্মযাজক ইংলণ্ডে তাঁদের ধর্মরাজ্য চালিয়ে গেছেন এটি হচ্ছে তাঁদেরই ধারাবাহিক ইতিহাস। গ্রন্থটি মূলতঃ পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যেই লেখা। সাধারণ পাঠকের কাছে ধর্ম বিষয়ক অসংখ্য খুঁটিনাটি বোধগম্য হ'ল না। কয়েক বছর পরই স্টাব্‌স্‌ রোল্‌স্‌ সিরিজের সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মধ্যযুগ বিশারদ হিসাবে তাঁর যে স্থায়ী মর্যাদা তার মূলে আছে রোল্‌স্‌ সিরিজের অন্তর্গত কয়েকটি বিখ্যাত সংযোজন। যথাস্থানে এগুলির আলোচনা করা যাবে। ১৮৬২ সালে আর্চ্চ বিশপ লাংলির আনুকূল্যে লামবেথের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন তিনি। কিন্তু ইংলণ্ডের পণ্ডিত সমাজ বড়ই রক্ষণশীল —নূতন কোন প্রতিভাকে সহসা স্বীকৃতি দেবার মত উদার মনোভাব তাঁদের কোন কালেই ছিল না। তাই সেই বছর স্টাব্‌স্‌ যখন অক্সফোর্ডে "Chichele প্রফেসার অব মডার্ণ হিস্ট্রি" পদের প্রার্থী হলেন তখন তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হ'ল। চার বছর পর তিনি যখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারিকের পদটির জন্য আবেদন পত্র দেন, তখনো অনুরূপ ভাবে তাঁকে পুনরায় ব্যর্থ হতে হয়।

পর পর দু'বার এভাবে ব্যর্থতার গ্লানি সহ্য করে স্টাব্‌স্‌ ভেঙ্গে পড়েন নি। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে তিনি গবেষণা চালিয়ে গেলেন। ১৮৬৪-৬৫সালের ভিতর তাঁর দু'খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হ'ল—প্রথমটি ***Itinerarium Regis Ricardi*** এবং দ্বিতীয়টি ***Epistolae Cantuarienses 1187-89***। প্রথম রিচার্ড সম্পর্কে এই দুই দলিল প্রকাশিত হবার পর স্টাব্‌স্‌-এর পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার করার দুঃসাহস আর কারও থাকল না। ১৮৬৬ সালে তাঁকে অক্সফোর্ডে 'রিজিয়াস্‌ প্রফেসার অব মডার্ণ হিস্ট্রি' পদটি দেওয়া হল।

একটানা ১৮ বছর (১৮৬৬ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত) সগর্বে ও স্বমহিমায় তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে স্টাব্‌স্‌ পুনরায় ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। প্রথমে চেস্‌টার ও পরে অক্সফোর্ডের বিশপ হিসাবে তিনি কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকে সরে দাঁড়াবার ফলে ক্ষতি হ'ল ইতিহাস শাস্ত্রের, ক্ষতি হল ইতিহাসসেবী অসংখ্য ছাত্রের। জীবনের বাকি ষোলটি বছরে স্টাব্‌স্‌ উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণা পুস্তক রচনা করেন নি। এই সময়ে তাঁর একমাত্র পুস্তক যেটি প্রকাশিত হ'ল তা মৌলিক গবেষণা বিষয়ক নয়। অধ্যাপক হিসাবে স্টাব্‌স্‌ বিভিন্ন সময়ে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি একত্রে একখণ্ডে গ্রথিত করে তাঁর 'সেভেনটিন্‌ লেক্‌চারস্‌' বইটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাস বিষয়ক কোন গুরুগম্ভীর আলোচনা নেই। হাল্কা ভঙ্গিতে লেখা এই রচনাগুলিতে আমরা মানুষ স্টাব্‌স্‌-এর এক সুন্দর রেখাচিত্র পাই। স্টাব্‌স্‌ স্থানে স্থানে পাঠকের সঙ্গে নির্দোষ হাসি তামাশায় যোগ দিয়েছেন, চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখতে চান নি এবং সেই জন্যই বিষয়বস্তু নির্বাচনে অহেতুক সতর্কতা অবলম্বন করেন নি বা দুরূহ তত্ত্বালোচনায় পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চান নি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে এমন একটা সহজ, সাবলীল ও আটপৌরে ভাব আছে যা পড়লে মনে হয় লেখক সারাজীবন দুরূহ ইতিহাস গবেষণায় নিযুক্ত থেকে শ্রান্ত ও ক্লান্ত ; তাই জীবন সায়াহ্নে বিশ্রম্ভালাপের জন্য একটু অবকাশ চান। এই পুস্তক প্রকাশের পর বৎসরই স্টাব্‌স্‌ দেহরক্ষা করেন।

"রোল্‌স্‌ সিরিজের" সম্পাদনা এবং 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি' প্রণয়ন-বিশপ স্টাব্‌স এর এই দুই মহত্তম সারস্বত কীর্তি। ইংলণ্ডের 'মাষ্টার্‌ অব দা রোলস্‌' লর্ড রোমিলী ১৮৫৭ সালে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যার ফলে ইংলণ্ডের আদি পর্ব থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত যাবতীয় ঐতিহাসিক দলিলের সম্পাদনা কাজ সুরু হয়। 'সোরসেস্‌ এ্যাণ্ড ডকুমেণ্টস্‌ অব ইংলিশ হিস্ট্রি' প্রণেতা ডুফাস্‌ হার্ডির উপর প্রথমে সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। পরে এই কাজে সহায়তা করার জন্য স্টাব্‌স্‌-এর ডাক পড়ে। দীর্ঘদিন পুরাতন

পুঁথিপত্র অধ্যয়ন করে স্টাব্স্ যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাতে এই ধরণের সম্পাদনা কাজে তাঁর দক্ষতা প্রায় অবিসংবাদী ছিল। ১৮৬৪ সালে স্টাব্স্-এর প্রথম গ্রন্থ 'দ্য আইটিনারি অব কিং রিচার্ড দ্য ফার্স্ট' এবং এই সিরিজে তাঁর শেষ গ্রন্থ 'উইলিয়ম অব মালমসবেরী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুদীর্ঘ ২৬ বছরের নিরলস সাধনায় স্টাব্স্ সবশুদ্ধ উনিশটি মূল্যবান দলিল টীকা ভাষ্য সহকারে প্রকাশ করেন। কলা কুশলী ঐতিহাসিকের অপূর্ব গ্রন্থনায় মূল্যবান তথ্য-সমৃদ্ধ মধ্যযুগীয় দলিলগুলি নবরূপ ধারণ করল। প্রতিটি দলিলের প্রস্তাবনায় সে যুগের বাতাবরণ রচনা করতে গিয়ে সুদীর্ঘ ভূমিকায় অবতারণা করেছিলেন। এই ভূমিকাগুলি একত্রে সংযোজিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় স্টাব্স্-এর মৃত্যুর পর।১ তাঁর লেখনীর যাদুগুণে ডানষ্টান জীবন লাভ করলেন, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রতিভাবান এক ধর্মযাজক হিসাবে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটল। প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান তিনি দেন এবং দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের পতন সম্বন্ধে এমন সব সম্ভাব্য কারণ দর্শান যা স্বতন্ত্র এক আলোচনার সূত্রপাত করল। দ্বিতীয় হেনরীর উপর অনুচ্ছেদটি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে। ই এআলোচনাটি "রোজার অব হোভডেন" নামক ক্রনিকালটির অন্তর্গত।২ অপর একটি ক্রনিকাল, "ওয়ালটার অব কভেনট্রী"-তে রাজানাশা জন ও শক্তিমান পোপ তৃতীয় ইনোসেনট্-এর দ্বন্দ্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।৩ কত গভীর জ্ঞান থাকলে বিষয়বস্তু এমন সুবিন্যস্ত ও রচনা এত সজীব ও চিত্রধর্মী হয়ে ওঠে স্টাব্স্-এর মধ্যযুগীয় ক্রনিকালগুলি তারই প্রমাণ। মনে হয় আমরা যেন এক চিত্রশালায় প্রবেশ করেছি, লেখক যেখানে মধ্যযুগের কয়েকটি জীবন্ত চিত্র পর পর আমাদের দেখিয়ে চলেছেন। মেইটল্যাণ্ড আক্ষেপ করেছেন এই ভেবে যে, ইতিহাসের চিত্রাঙ্কনে যিনি এত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যিনি কাহিনী বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর সবরকম যাদু প্রয়োগ করতে জানতেন, তিনি কেন সারাজীবন "ইনস্টিটিউশনের" গবেষণায় ব্যাপৃত থাকলেন? রাজবৃত্ত আলোচনায় বা জীবনীকার হিসাবে তিনি কি আরও

বেশী সফল হতে পারতেন না ? রোলস্ সিরিজের সম্পাদনায় স্টাব্‌স্ গভীর ভাবে Maurer, Waitz, Pauli, Libermann প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরাই এধরণের সম্পাদনা কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন। Manumenta Germaniae-তে যখন রোলস্ সিরিজের অংশ বিশেষ ছাপা হচ্ছিল তখন জার্মান বিশেষজ্ঞরা স্টাব্‌স্-এর এই প্রচেষ্টার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তাঁরা জানতেন মধ্যযুগের ঐতিহাসিক দলিলগুলির উপর এত দখল বোধহয় আর কোন ইংরাজ পণ্ডিতের নেই।

নিজস্ব ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বা ইতিহাস দর্শন সম্বন্ধে স্টাব্‌স্ স্বতন্ত্রভাবে কিছু লিখে যান নি। তবে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা থেকে এমন কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করা যায়, যা তাঁর ভাবনা বা দৃষ্টিকোণকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। ১৮৬৭ সালে রিজিয়াস্ প্রফেসার হিসাবে স্টাব্‌স্ যে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "I desire to introduce myself to you, not as a philosopher, nor as a politician but as a worker at history"। বিনয় সহকারে স্টাব্‌স্ নিবেদন করেছেন যে, তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত নন দর্শনশাস্ত্রে তাঁর কোন অধিকার নেই। এমন কি তিনি একজন রাজনীতিবিদও নন। তিনি হচ্ছেন ক্লিওর মন্দিরে এক দীন পূজারী। দর্শন কথাটি সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর আপত্তি ছিল। বাক্‌লের 'সভ্যতার ইতিহাস' যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, ইতিহাসের দর্শন আছে কি না তাঁর জানা নেই এবং সেই জন্যই বাক্‌লের সব সিদ্ধান্তকে তিনি স্বীকার করতে পারেন না। ইতিহাসের ইমারত গড়ে তোলার কাজে স্টাব্‌স্ নিজেকে সাধারণ দিনমজুরের একজন বলে মনে করতেন। নিজেকে ঐতিহাসিক বলে প্রচার করতে তাঁর কুণ্ঠা বোধ হ'ত ; এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "I am afraid even to advertise myself as a teacher।" আদর্শ কর্মী হিসাবে তাঁর দাবি যে কত যথাযথ ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই তা জানা আছে। সারা জীবনে তিনি যত লিখে গেছেন একমাত্র মেইটল্যাণ্ডকে বাদ দিলে, আর কেউ ততটা লিখেছেন কিনা সন্দেহ। স্টাব্‌স্ ছিলেন সব্যসাচী। এক হাতে তিনি ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, অন্য হাতে সেই সংগৃহীত তথ্যকে সাহিত্যগুণে রঞ্জিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

সংগ্রহ ও সৃষ্টি কার্য চলেছে একই তালে। ইতিহাস সৃষ্টি করতে গিয়ে স্টাব্স্ কারও কাছে কিছু গোপন রাখেন নি। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে আঙ্গিক ও কলা কৌশল পর্যন্ত, ইতিহাস চর্চার ব্যবহারিক দিকের সব কিছুই অকপটে তিনি পাঠককে জানিয়েছেন। দক্ষ প্রযোজক তিনি; উৎকৃষ্ট নাটক পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হন নি। দর্শককে নিয়ে গেছেন মঞ্চের পিছন দিকে যেখানে রয়েছে ক্যানভাসে আঁকা দৃশ্যপট ও দড়িবাঁধা ষ্টেজ-সরঞ্জাম।

প্রথমে নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি কেমন যেন অস্পষ্ট থাকত, তারপর কয়েকবার দৃশ্য পরিবর্তনের পরই লক্ষ্য করা যেত যে, তারা কেমন জীবন্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে, অস্পষ্টতার আবরণ ভেদ করে কেমন ধীরে ধীরে একটি সুপরিকল্পিত সুগঠিত ও নিটোল এক কাহিনী রূপ নিচ্ছে—যে কাহিনীর সুঘনান্বিত বেশ অভিনয় শেষেও দর্শকের মনকে আবিষ্ট করে রাখে।

১৮৬৬ সালে রিজিয়াস্ প্রফেসার নিযুক্ত হবার পরই, অধ্যাপক হিসাবে স্টাব্স্ যে বক্তৃতাটি দেন সেটি হচ্ছে 'এইটিন্ লেকচারস্ অন কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি ফ্রম ট্যাসিটাস টু হেনরী দা সেকেণ্ড'। বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস সম্বন্ধে স্টাব্স্-এর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা গেল। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি 'সিলেক্ট চার্টারস ও কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি' লিখে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্থায়ী আসন করে নিলেন।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত স্টাব্স্-এর কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সারস্বত কীর্তি বলে বিবেচিত হয়। জুলিয়াস সীজারের আক্রমণ থেকে ট্যুডার রাজাদের আগমন কাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের আনুপূর্বিক বিবরণ এই গ্রন্থে তিন ভল্যুমে পাওয়া যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কোন আলোচনা এই গ্রন্থে নেই। তবে জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিক যথা, ধর্ম ও রাষ্ট্র, আইন ও বিচার-ব্যবস্থা, সমর শাস্ত্র ও কূটনীতি সবই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন লেখক। হেনরী হ্যালাম ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'ভিউ অব দা স্টেট ইন্ ইউরোপ ইন দা মিড্ল্ এজেস্' নামক পুস্তকটি রচনা করেন। এর অষ্টম পরিচ্ছেদে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের বিবর্তন কাহিনী আলোচিত হয়। 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি' শব্দটির সঙ্গে ইংরেজ পাঠকদের

পরিচয় সেই প্রথম। প্রায় দশ বৎসর পর হ্যালাম তাঁর বিখ্যাত বই 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি ফ্রম দা এ্যাক্সেশন অব হেনরী দা সেভেন্থ টু দা ডেথ অব জর্জ্জ দ্য সেকেণ্ড' প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে শাসনতন্ত্র বিষয়ে ইংরাজ পাঠকের কৌতূহল বহুগুণ বেড়ে গেল। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হ'ল এবং অনেক তরুণ গবেষক এই বিষয়ে গবেষণায় এগিয়ে এলেন। উনবিংশ শতকের প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক হ্যালম ছিলেন লিবারাল-হুইগ আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এবং সেই বিচারে তিনি মেকলের যোগ্য উত্তরসূরী। সে যুগে হ্যালামের বই যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে। বইটি ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য ছিল। পার্লামেণ্টের সদস্যরা বইটি সর্বদা হাতের কাছে রাখতেন এবং সুবিধামত এর অংশ বিশেষ বক্তৃতায় ঢুকিয়ে দিতেন। তার চেয়েও বড় কথা রাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর স্বামী বইটি আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী গীজো নাম করা ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি এই বই-এর একটি ফরাসী অনুবাদ প্রণয়ন করেন।

হ্যালামের বইটির একটি বড় অভাব এই ছিল যে, এর থেকে ইংলণ্ডের মধ্যযুগ সম্বন্ধে পাঠক কিছুই জানতে পারত না। ঐতিহাসিক মহলে মধ্যযুগ তখনও নিতান্ত অবহেলিত। আধুনিক যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহের আরও প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ১৮৬৩ সালে আরস্কিন মে দুই ভল্যুমে তৃতীয় জর্জ্জের পরবর্তী কালের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস রচনা করলেন।

স্টাব্‌স্‌ যে সময়ে 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি' লেখায় মন দেন সে সময়ে মধ্যযুগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বই ছিল না। ১৮১৮ সালে হ্যালামের সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদটিই ছিল তাঁর সামনে একমাত্র পথপ্রদর্শক। স্টাব্‌স্‌ দেখলেন ইংলণ্ডের আদি ও মধ্যযুগের বিস্তীর্ণ এক উর্ব্বর ভূখণ্ড তাঁর সামনে অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। জমি জরিপ ও হলকর্ষণের কাজ তখনও বাকি। এই দুঃসাহসিক কাজে নেমে সোনার ফসল তুলতে বদ্ধ পরিকর হলেন ঐতিহাসিক স্টাব্‌স্‌। পর পর তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হ'ল ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৮-এর মধ্যে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় স্টাব্‌স্‌ তাঁর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে

বলেছেন —'Constitutional history has a point of view, an insight and a language of its own ; it reads the exploits and characters of men by a different light from that shed by the false glare of arms and interprets positions and facts in words that are voiceless to those who have only listened to the trumpet of fame. The worlds heroes are no heroes to it and it has an equitable consideration to give to many whom the verdict of ignorant posterity and the condemning sentence of events have consigned to obscurity or reproach.'

তারপরই বলেছেন ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের বিবর্তন কাহিনী তিনটি শক্তির অভিঘাতেই সম্ভব হয়েছে যথা লোকচরিত্র, বৈদেশিক প্রভাব ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদি। এরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ; একটি অপরটির মুখাপেক্ষী। কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে কল্পনা করা যায় না।

কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রির প্রথম খণ্ডে স্যাকসন বিজয় থেকে নরমান বিজয় পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬৬ থেকে ১২৭২ পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে ১২৭২ থেকে ১৪৮৫ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তিন খণ্ডে লেখা এই বিরাট গ্রন্থ আশাতীত সফলতা লাভ করেছিল। বিদগ্ধ পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে সাধারণ পাঠক—সর্বশ্রেণীর লোকেরা লেখককে অভিনন্দন জানালেন। মধ্যযুগ সম্বন্ধে অপর এক বিখ্যাত পণ্ডিত মেইটল্যাণ্ড প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, I did not read it because I was set to read it or because I was to be examined in it or because I had to teach history or law. I found it in a London club and read it because it was interesting on the other hand it was so interesting and I was so little prepared to criticise or discriminate that perhaps I fell more completely under its domination

that those who have passed through schools of history are likely to fall.»

কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রির তিনটি মহৎ গুণ আছে। প্রথম কথা, মধ্য যুগের মূল ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে লেখকের নিখুঁত ও প্রগাঢ় জ্ঞান সমস্ত বইটির মূল্য অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। স্টাব্‌স্‌ পুঁথি মিলিয়ে, দলিল পরীক্ষা করে ও পাঠ নির্ণয় করে ইতিহাস রচনা করতেন। যদিও তিনি সর্বদা মৌলিক প্রমাণ পত্রের (primary sources) উপর জোর দিতেন, ইতিহাস রচনা কালে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রমাণ পত্রকেও (secondary sources) তবু অবহেলা করেন নি। বিরুদ্ধ সমালোচকেরা বলেন স্টাব্‌স কেবল ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত দলিলগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন—ইংলণ্ডের বহুস্থানে তখনও যে প্রচুর অনাবিষ্কৃত দলিল ছিল সেগুলি কাজে লাগাতে পারেন নি। অভিযোগটি সত্য হলেও, স্টাব্‌স্‌-এর এই অক্ষমতা প্রকারান্তরে এক আশীর্বাদ। অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো স্টাব্‌সকে সারাজীবনই অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত, কোন কিছু লিখে যাওয়া হয়ত ভাগ্যে ঘটে উঠত না। এতবড় দুর্ঘটনা যে ঘটেনি সেজন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ।

কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রির দ্বিতীয় মহৎ গুণ স্টাব্‌স্‌-এর সতর্কতা। যুক্তই কোন ঐতিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি সর্বদা সাবধান ও সতর্ক হয়ে নিজ মত ব্যক্ত করতেন। অনেক সময়ে জটিল বিষয়ে সুস্পষ্ট মত না দিয়ে প্রশ্নটি সন্তর্পনে এড়িয়ে যেতেন। শ্রীমতী হেলেন ক্যাম তাঁর প্রবন্ধে তাই স্টাব্‌স্‌কে 'a perfect ledger' আখ্যা দিয়েছেন। মধ্যযুগের গোলক ধাঁধাঁয় পথ না হারানোর এটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ উপায়। আমাদের খুব সৌভাগ্য যে বিতর্ক সাপেক্ষ বিষয়ে স্টাব্‌স্‌ জোর গলায় নিজের মতকে অভ্রান্ত বলার চেষ্টা করেন নি। স্যার চার্লস ফার্থ (যিনি পরে অক্সফোর্ডে রিজিয়াস্‌ প্রফেসার অব মডার্ণ হিস্ট্রি হয়েছিলেন) লিখেছিলেন যে, ক্লাশে পড়াবার সময় অধ্যাপক স্টাব্‌স্‌ বলেছিলেন যে তাঁর বই-এর বহু সিদ্ধান্তকেই 'hypothesis rather then facts' হিসাবে দেখা উচিত। ইতিহাস গবেষণায় অধ্যাপকের দৃষ্টি কত সত্যসন্ধ ছিল, চিত্ত কত নিরভিমান ছিল, কথাগুলি তাই প্রমাণ করে। কোন এক পত্রে স্টাব্‌স্‌ তাঁর এক

বন্ধুকে লেখেন—"History knows that it can wait for more evidence and review its older verdicts. It offers an endless series of courts of appeal and is ever ready to reopen closed cases."

তৃতীয় গুণ এর অভিনব গঠন বিন্যাস। কলাকুশলী ঐতিহাসিক এখানে নিপুণ হস্তে দুটি বিপরীত পদ্ধতি একই সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। এক হাতে ভেঙ্গেছেন ও কাটা ছেঁড়া করেছেন, অন্যহাতে আবার সেলাই করেছেন, জোড়া দিয়েছেন। প্রথমে লাসকাটা ঘরে সমস্ত শাসনযন্ত্রের কাঠামোকে তিনি শাণিত অস্ত্র দিয়ে কেটেছেন; তারপর কাটা অঙ্গের সম্পূর্ণ পরিচয় জানার পর তাদের জোড়া দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্লেষণী ও সৃজনী—এই উভয় শক্তির এমন একত্র সমাবেশ অন্য আর কোন লেখকের মধ্যে হয়েছে কিনা জানা নেই।

স্টাব্‌স্‌-এর এই বই প্রকাশের পর একশত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর জীবদ্দশাতেই এর কিছু কিছু অংশ পুনর্লিখিত হবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল। নিজের লেখার প্রতি মমত্ব বশতই হোক বা অন্য আর কোন কারণেই হোক স্টাব্‌স্‌ একবার যা লিখতেন, পরে তাকে আর ঢেলে সাজাবার কথা ভাবতেন না। নূতন গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অংশ বিশেষ পণ্ডিত মহলে আর স্বীকৃত হচ্ছিল না। এগুলো স্যাক্সন ও নরমানদের সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন তা পুনর্বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে ইংলণ্ডের সমাজ জীবন টিউটনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, এমন মত জার্মান পণ্ডিতদের প্রিয় হলেও ইংলণ্ডের পণ্ডিত সমাজ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত পেটিট্ ডুটেল্‌স আধুনিক গবেষণার ভিত্তিতে স্টাব্‌স্‌-এর মতামত খণ্ডন করে তিন খণ্ডে "স্টাডিজ এ্যাণ্ড নোটস সাপ্‌লিমেণ্টারী টু স্টাব্‌স্‌' কনস্টিটিউশনাল হিষ্ট্রি" লেখেন। স্টাব্‌স্‌-এর প্রথমে দুই খণ্ড এখন ছাত্রদের আর তেমন কাজে লাগে না। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা এখনও পুরোমাত্রায় বর্তমান। ঐতিহাসিক যতই স্যাক্সন ও নরমান আমলের চোরাবালি পার হয়ে আধুনিক যুগের শক্ত জমির দিকে পা বাড়িয়েছেন, ততই তাঁর দৃষ্টি হয়েছে স্বচ্ছ, ব্যাখ্যা

অভিনব ও বর্ণনা অতুলনীয়। পঞ্চদশ শতকের ইতিহাস চর্চায় বইটির কি স্থান সে সম্বন্ধে মন্তব্য করে অধ্যাপক S. B Chrimes বলেছেন, "It is a great pioneering work and is still the indispensable starting point not only for constitutionl matters but also for political and social history". ৭

লাঙ্কাষ্ট্রিয়ান আমলের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে স্টাব্‌স্‌ যে ধারণা পোষণ করতেন তা আজ নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু গোলাপের যুদ্ধের পটভূমিকায় তিনি ইংলণ্ডের সমাজ জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তার কি কোন তুলনা আছে? ইতিহাসের অনেক জটিল তথ্য পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি এমন সব সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ উক্তি করেছেন, হীরক খণ্ডের মত যার জ্যোতি, তার সংগ্রথিত রচনাকে আলোকিত করেছে। তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর রচনা শৈলীতে এমন একটি ঔদার্য ও ঋজুতা আছে যার নহনা পাঠকের মনকে আবিষ্ট করে রাখে। ইতিহাস আলোচনায় তাঁর ভাষায় মুক্ততা এসেছে, আবেগের উচ্ছ্বাস এসেছে; স্বরের উচ্চাবচতা ধ্বনিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস-রচনার মাপকাঠিতে এটা ত্রুটি বলে গণ্য হয় কিন্তু তথ্যের কঙ্কালে তিনি যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন—স্টাব্‌স্‌-এর এই গৌরব নিত্য স্মরণীয়। পঞ্চদশ শতকের ইংলণ্ডের সমাজ জীবন সম্বন্ধে স্টাব্‌স্‌-এর আলোচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি: 'The most enthusiastic admirer of medieval life must grant that all that was good and great in it was languishing even to death; and the firmest believer in progress must admit that as yet there were few signs of returning health. The Sun of the Plantagenets went down in clouds and thick darkness; the coming of the Tudors gave as yet no promise of light; it was 'as the morning spread upon the mountains,' darkest before the dawn···yet here as everywhere else, the dawn is approaching. Here as everywhere else the evil is destroying itself and the remaining good lying deep

down and having yet to wait long before it reaches the surface, is already striving towards the sunlight that is to come. The good is to come out of evil ; the evil is to compell its own remedy ; the good does not spring from it, but is drawn up through it. In the history of nations, as of men, every good and perfect gift is from above ; the new life strikes down in the old root ; there is no generation from corruption. ৮

ইংলণ্ডের ছাত্র সমাজ গ্রীস রোমের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত ল্যাটিন দলিলগুলি সযত্নে পড়ত কিন্তু সাধারণ ভাবে ইংলণ্ডের মধ্যযুগের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন মূল দলিল বা আকর গ্রন্থাদি পাঠ করত না। তাদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। দুর্বোধ্য ল্যাটিনে বিরচিত মধ্যযুগীয় দলিল পড়তে পারে এমন ছাত্রের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। এই অভাব দূর করার জন্য ষ্টাব্স্ 'সিলেক্ট চার্টারস' প্রণয়ন করেন। কনস্টিটিউশনাল হিষ্ট্রি প্রকাশিত হবার কয়েক বছর আগে এটি প্রকাশিত হয়। প্রধানত শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধার্থে সীজারের আক্রমণ থেকে প্রথম এডওয়ার্ডের আমল পর্যন্ত প্রধান শাসনতান্ত্রিক দলিলগুলি একত্রে সন্নিবেশিত করেন। বইটিতে একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে যার সাহায্যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন দলিলগুলিকে এক সূত্রে গাঁথতে প্রয়াসী হয়েছেন ঐতিহাসিক।

এতগুলি পুস্তক রচনা করে স্টাব্স্ ঐতিহাসিক হিসাবে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রইলেন। তবু এক বিষয়ে তাঁর একটি দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল যা তাঁর ছাত্রদের দৃষ্টি এড়ায় নি। টাউট, রাউণ্ড ও কার্থ, তাঁর তিন যশস্বী ছাত্র। টাউট পরবর্তী জীবনে ডিকশনারি অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফির পাতায় স্টাব্স্-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে গুরুকৃত্য করে গেছেন। এঁদের মতে স্টাব্স্ সুবক্তা ছিলেন না, তাই অধ্যাপক হিসাবে তিনি খুব সফল হতে পারেন নি। ক্লাশে পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি অনর্গল পড়ে যেতেন। তাঁর বক্তৃতা ছাত্রদের পরীক্ষা পাশের সহায়তা করে না- কাজেই ক্লাশরুম ফাঁকাই থাকত। কোন রকম 'মেড ইজীতে' স্টাব্স্-এর বিশ্বাস ছিল না।

সস্তা হাততালি ও বাহবাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে জনপ্রিয় বক্তৃতা দেবার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। বক্তৃতার মান, ছাত্রদের দাবিতে, নীচু করার কথা কোন কালেই তিনি ভাবতে পারেন নি। রিজিয়াস্ প্রফেসার হিসাবে বছরে দু'বার তাঁকে পাবলিক লেকচার দিতে হ'ত। সাধারণ শ্রোতাদের ইতিহাস বিষয়ে কৌতূহলী করে তোলাই এজাতীয় বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল। শোনা যায়, স্টাব্স্ এই কাজটিকে বড় বেশী ভয় করতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে স্টাব্স্ নিরহঙ্কার ও আত্মভোলা মানুষ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সে আমলের অপর দুই বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রীন ও ফ্রীম্যানের নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। এঁরা দুজন স্টাব্স্কে সর্বদা অগ্রজের সম্মান দিতেন। ১৮৬৬ সালে স্টাব্স্ যখন অক্সফোর্ডে রিজিয়াস্ প্রফেসার পদ লাভ করেন তখন গ্রীন খুশী হয়েছিলেন; তিনি বলেছিলেন যে, এতদিনে একজন প্রকৃত ইতিহাসবিদ ইতিহাস বিষয়ে অক্সফোর্ডের প্রধান অধ্যাপক হচ্ছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, সে বছর কেম্ব্রিজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন একজন খ্যাতনামা ইংরাজ সাহিত্যিক চার্লস কিংসলে) এবং অক্সফোর্ডে চার্চ ইতিহাসের চেয়ারে একজন দার্শনিক অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্টাব্স্ যে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন গ্রীন, স্বনাম ব্যবহার না করে, স্যাটারডে রিভ্যু পত্রিকায় তার সমালোচনা করেন। এতে যেমন প্রশংসা ছিল তেমনি মনে জ্বালা ধরে এমন বিরূপ মন্তব্য কম ছিল না। এই সমালোচনার কাটিং বহুদিন সযত্নে স্টাব্স্ তাঁর নিজের কাছে রেখেছিলেন। ১৮৭৮ সালে গ্রীনের বিখ্যাত বই 'হিষ্ট্রি অব দি ইংলিশ পিপ্ল' প্রকাশিত হয়। এই বই-এর উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল, **'Dedicated to two dear friends—My masters in the subject of English History—E. A. Freeman & W. Stubbs'**। স্টাব্স বলেছিলেন জীবনে তিনি অনেক সম্মান পেয়েছেন; কিন্তু বন্ধুর দেওয়া এই সম্মানই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ সম্মান, যা হৃদয়ের মণি কোঠায় তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন হিসাবে আগলে রাখবেন। ফ্রীম্যান বয়সে সামান্য বড় হলেও স্টাব্স্কে

গুরু বলে মানতেন। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির কি দুস্তর প্রভেদই না ছিল! রাজনীতিতে রক্ষণশীল ছিলেন স্টাব্‌স্‌ কিন্তু ইতিহাস রচনায় কোথাও সেই মত প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। অন্যদিকে ফ্রীম্যান র‍্যাডিকাল আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সর্বদা সেই আদর্শকে জোর গলায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন। স্টাব্‌স্‌ অভ্যস্ত ছিলেন সংক্ষিপ্ত ভাষণে, ফ্রীম্যান বাগাড়ম্বর ও অতি কথনে। স্টাব্‌স্‌-এর প্রকৃতি ছিল নিরুত্তাপ ও নির্মোহ, ফ্রীম্যান ছিলেন প্রচারধর্মী ও বাদবিতণ্ডা প্রিয়। ফ্রীম্যান বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাবন্ধিক ছিলেন, অন্যদিকে স্টাব্‌স্‌ কোন বাদবিতণ্ডায় অংশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কোন কমিটির মেম্বার থাকতে চাইতেন না, কোন সরকারী খেতাবের প্রত্যাশী ছিলেন না এবং গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলতেন সারা জীবনে তিনি একটি পুস্তকেরও সমালোচনা লেখেন নি।

প্রায় ৭০ বৎসর হতে চলল জ্ঞানতপস্বী স্টাব্‌স্‌ দেহরক্ষা করেছেন। মনে প্রশ্ন জাগে, এযুগের ছাত্ররা কি আজও সেই পূর্বেকার নিষ্ঠা নিয়ে স্টাব্‌স্‌-এর বিখ্যাত বইগুলি পড়ে থাকেন? আমাদের দেশে স্টাব্‌স্‌-এর বই ক্ল্যাসিক্সের সম্মান পাচ্ছে। তাঁর নাম অজানা নেই কারও কাছে। তাঁর বই এর ভূয়সী প্রশংসাও হয়ত শোনা যাবে, কিন্তু কষ্ট করে তাঁর বই আদ্যোপান্ত পড়েছেন এমন একজনেরও হয়ত সন্ধান মিলবে না। স্টাব্‌সকে এখন সচরাচর পাওয়া যাবে ছাত্রদের পরীক্ষার খাতায়, যেখানে তাঁর কোন বিখ্যাত উক্তির ভুল সংশোধনের নিমিত্ত তাঁকে স্মরণ করা হয়। এক সময়ে 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি' অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা cult-এ পরিণত হয়েছিল। স্টাব্‌স্‌-এর সিদ্ধান্তগুলি সেখানে একটা গোঁড়ামীতে দাঁড়িয়ে যায় যার বিরুদ্ধাচরণ করা দুঃসাহসিকতা বলে গণ্য হ'ত। অক্সফোর্ডে বর্তমান যুগের ছাত্রদের মধ্যে স্টাব্‌স্‌-এর প্রতি এজাতীয় অন্ধ আনুগত্য অন্তর্হিত হয়েছে।

স্টাব্‌স্‌ ভিক্টোরীয় যুগের অখণ্ড শান্তি ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন এবং লিবারাল ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মনে করতেন ইংলণ্ডের পৃথিবীব্যাপী বিজয় অভিযান ও সামাজিক অগ্রগতির মূলে আছে তার প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। এই সম্মোহিত দৃষ্টির বশীভূত হয়ে তিনি পার্লামেণ্টের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং

এখনকার সমালোচকদের মতে তাঁর সম্মোহিত দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্য ধরা পড়ে নি। টি. এফ টাউট তাঁর গুরুকে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, অতীতের আলোচনায় তিনি বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছিলেন, তাই তার ব্যাখ্যা objective নয়।৯ টাউট কিন্তু একটি জিনিষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। প্রত্যেক যুগে মানুষ বিশেষ বিশেষ একটা সমস্যা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়। স্টাব্‌স্-এর যুগে পার্লামেণ্ট ও শাসনতন্ত্র নিয়ে লোকে বেশী মাথা ঘামাত ; তাই ঐতিহাসিকের লেখায় ঐ বিষয়টিই বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। রচনাতেও ছাপ পড়েছিল ভিক্টোরীয় ভাবধারার। টাউটের সময় মানুষের কৌতূহল ও অনুসন্ধান স্পৃহা ভিন্নমুখী হ'ল। ফলে তাঁর গবেষণায় কনস্টিটিউশনের বদলে এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনই প্রাধান্য পেল। যে কারণে টাউট মধ্যযুগের 'এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হিস্ট্রি' নিয়ে আলোচনা সুরু করেন ব্যারাক্লোর মতে সেটিও খুব objective নয়।১০ তাঁর মতে ঐতিহাসিক দেশ-কাল, স্বার্থ প্রবণতা অনুসারে নূতন নূতন প্রশ্নের অবতারণা করেন। সেই সব প্রশ্নের প্রকৃতি বদলায় যুগের সঙ্গে এবং উত্তরের প্রকৃতি বদলায় নূতন প্রশ্নের উত্থাপনে। শাশ্বত সত্য ঐতিহাসিকের নাগালের বাইরেই থেকে যেতে বাধ্য।

এখনকার দিনে স্টাব্‌স্-এর রচনা পড়ার একটা নিঃসন্দেহ উপকারিতা আছে। মেইটল্যাণ্ড বলেছেন 'To read him is a training in justice'। যত দূর সম্ভব রাগদ্বেষশূন্য মনে ভূতার্থ কথনে ব্রতী হয়েছেন। সমদৃষ্টি নিয়ে তিনি সব প্রশ্নের বিচার করতে চেয়েছেন এবং সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন যাতে নিজের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-তাঁর বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে। হেনরী ও বেকেটের কলহে তিনি অংশ নেন নি অথবা ফ্রীম্যানের মত এ্যাংলো-স্যাক্সন্ কনস্টিটিউশনকে ইংরাজ প্রজ্ঞার পরাকাষ্ঠা বলে নন্দিত করেন নি। তিনি নিজে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজনীতিতে ছিলেন চরম রক্ষণশীল। তবু তাঁর কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন না আসন্ন পার্লামেণ্টারী নির্বাচনে লেখক কোন দলকে সমর্থন করবেন। এক ভাষণে স্টাব্‌স্ বলেছিলেন, "It is not my work to make men Whigs or Tories···but to make the Whigs good and

sensible Whigs and the Tories good, wise and sensible Tories, to teach them to choose their weapons and to use them fairly and honestly."১১ গভীর ধর্মবোধ ও ন্যায় নিষ্ঠা তাঁকে এই সমদৃষ্টির অধিকারী করেছিল।

নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন অনুসন্ধান প্রণালীর আলোকে ও নবাবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে স্টাব্‌স্‌-এর অনেক সিদ্ধান্তই আজ ভেঙ্গে পড়েছে। তবু তিনি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যান নি। প্রতিবছর এত গবেষণা পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে যে তার সঙ্গে তাল রাখা পণ্ডিত গবেষকদের পক্ষেও অসম্ভব। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায় সম্পর্কে এত খুঁটিনাটি আলোচনা হচ্ছে যা স্টাব্‌স্‌ এর আমলে কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু এ যুগে যে জিনিষের অভাব দেখা দিয়েছে সেটি হ'ল একটি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির। এখনকার ঐতিহাসিক ফ্যাক্টের অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়ে কতগুলি গাছই দেখেছেন, গভীর অরণ্যানীর নিবিড় শোভা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। এইরূপ অবস্থায় আধুনিক পাঠক যখন হাজার হাজার জার্নাল পিরিওডিক্যালে পথ হারিয়েছেন, যখন অসংখ্য বই-এর স্তূপে তাঁর ইতিহাস জিজ্ঞাসা সমাধিস্থ হতে বসেছে, তখন যদি তাঁর হাতে স্টাব্‌স্‌-এর একখণ্ড ইংলণ্ডের ইতিহাস তুলে দেওয়া যায় তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি শান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচবেন। কেননা এই বই-এ তিনি ইংলণ্ডের অখণ্ড সত্তাকে আবিষ্কার করবেন, অনুভব করবেন জাতির হৃদস্পন্দনকে, জানতে পারবেন সেই মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শকে যা যুগযুগ ধরে ইংরাজ জাতিকে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেছে।

পাদটীকা

(১) Historical Introductions to the Rolls Series—Stubbs, Edited by Arthur Hassall, London. 1902.

২) Chronicle of Roger Hoveden—Historical Introductions p. 173

(৩) Collections of Walter of Coventry. p 439

(৪) Seventeen Lectures—Stubbs, p. 15

(৫) Seventeen Lectures—Stubbs, p. 1

(৬) Maitland—Collected Papers, vol iii, p. 503

(৭) Fifteenth Century—S B. Chrimes (article published in History, Edited by Cobban, vol xlviii, p. 16)

(৮) Constitutional History of England—Stubbs vol iii, p. 613 and 614.

(৯) Tout—Chapters in Administrative History, p. 2

(১০) Barraclough—History in a changing world, p.p. 21-22.

(১১) Seventeen Lectures-Stubbs p. 35.

গ্রন্থপঞ্জী

(1) T. F. Tout's article in the Dictionary of National Biography.

(2) Richard Lodge's Article in Chambers Encyclopaedea of English Literature.

(3) Maitland's article in English Historical Review (1901,) reprinted in his Collected Papers, vol iii. (Cambridge 1911)

(4) Helen Cam's article 'Stubbs Seventy year after' (Cambridge Historical Journal, vol ix, 1948)

(5) Gooch—History and Historians in the 19th Century.

(6) Petet Dutaillis—Studies and notes, Supplementery to Stubbs' Constitutional History (3 vols.)

(7) J. G Edwards—William Stubbs (Historical Association, 1952)

(8) Hale—The Evolution of British Historiography from Bacon to Namier (London, 1967)

ভারত সন্ধানী উইলিয়ম এডাম

চিত্তব্রত পালিত

কোন দেশ বা সমাজের ইতিহাস রচনায় উপাদান হিসেবে দিক্‌নির্দেশক ব্যক্তিবিশেষের জীবনকথা অপরিহার্য্য বলে বর্তমানে বিবেচিত। কারণ কেবল মাত্র ঘটনাপঞ্জী এবং তার বিশ্লেষণ গবেষককে একটি বিশেষ যুগ সম্বন্ধে যতটা সচেতন করে, তৎকালীন কোন মণীষীর জীবনচর্চার নিরিখে তার অনেক বেশী অবহিত হওয়া যায়। প্রায় কালের সাগর পাড়ি দিয়ে আসা যায় বললেই চলে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ যদি বাংলা-দেশের স্বর্ণযুগের চিন্ময়রূপ হন তবে শুধু তাঁদের রচনা থেকে সেই চিন্ময়বঙ্গের রূপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয় না। রচনার গভীরে যেতে হলে তাঁদের কর্মসাধনারও পরিচয় নিতে হয় প্রতি পদক্ষেপে।

জীবনী রচনা এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়। তবু জীবনীর আলোকে ভারত সন্ধানের প্রয়াসে এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। চরিতকথাকে গালগল্প ধরে নিয়ে পাশে ঠেলা বিদগ্ধ সমাজে অপ্রতুল নয়। উইলিয়াম এডাম ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে ক্রান্তিকারী পুরুষ ছিলেন কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তিনি বাইরের মানুষ হিসেবে আমাদের হিসেবেরও বাইরের একথা ভাবা অন্যায় হবে। তাহলে অবিস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার প্রমুখ সকলকেই অস্বীকার করতে হয়।

এডামের নির্বাচন অন্য কারণে। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশক জুড়ে তাঁর অবস্থিতি। বাংলাদেশের আচারে বিচারে সমাজে সভায় তখন পালাবদলের হাওয়া লেগেছে। দেশ কোন নতুন দিকে মোড় নিতে পারে এই অস্থির চিন্তা তখন শুধু রামমোহনের রাত্রির ঘুম কেড়ে নেয় নি, উত্তেজিত করতে শুরু করেছে নব্যবাংলার ভবিষ্যৎ যুবসমাজকে। এই সময়ের সমাজ বিবর্তন এবং চিন্তানায়কদের কর্মধারা সম্বন্ধে আমাদের গৌরববোধ খুব প্রবল। তাই যথার্থ মূল্যায়ণের জন্য কোন দরদী বিদেশীর চোখে একালকে দেখা

বিশেষ তাৎপর্য্যময় এবং এডামের প্রয়োজন এইখানে। আমাদের দেশে সরকারী নথিপত্র দেখে বিদেশী দৃষ্টিকোন বিচারের এবং সকল ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের যে এক দুর্বলতা আছে, এডাম, জর্জ টমসন, হেয়ার ও সিল্ক বাকিংহামের কর্মসাধনার আলোচনা তার ঘোর অনেকটা কাটিয়ে দিতে সক্ষম। বেসরকারী সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সরকারী দলিল পর্য্যালোচনা করলে দেশের যথার্থ পরিস্থিতি এবং ব্রিটিশ তথা বিদেশী মনোভাব সম্বন্ধে আমরা সঠিক জানতে পারি।

এডামের সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, তিনি একজন বিদেশী হিসেবে শুধু আমাদের দেশকে দেখেন নি, দেশকে ভালবেসেছেন। আমাদের সমাজ তথা রাষ্ট্রচিন্তায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর কর্মধারাকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করেছেন। আমাদের আত্মার আত্মীয় হিসেবে তাঁর ভারত সন্ধানের প্রয়াস তাঁকে আমাদের ইতিহাসে স্থান করে দিয়েছে।

উইলিয়াম এডামের ভারতপ্রবাসকাল ১৮১৮ সন থেকে ১৮৩৮ সন পর্য্যন্ত কুড়ি বছরে তিনি প্রথমে মিশনারি, পরে সাংবাদিক এবং শেষে সরকারীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক পর্য্যায় থেকে অন্য পর্য্যায়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটতে থাকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক ভাবধারা ভারতীয় চেতনা-মুক্তির অভিযানে একাত্ম হয়ে যায়। ১৮৩৮ সনের শেষে এডাম আমেরিকা যান এবং ১৮৪১ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে যে আত্মিক যোগ তাঁর ঘটেছিল, কি আমেরিকা কি ইংল্যাণ্ড কোথাও তা ছিন্ন হয় নি। ভারতে যে মত ও পথের তিনি প্রবক্তা ছিলেন, আমেরিকাতে তাঁর বক্তৃতামালায় সেই ভারতচিন্তাই প্রধান স্থান পেয়েছে। স্বদেশে ফিরে ভারত হিতৈষী সমিতি এবং সাময়িকপত্রের মাধ্যমে ভারতের বহুমুখী সমস্যা এবং শাসনতান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে জনমত গঠনে সচেষ্ট এবং বিলেতে নব্যবঙ্গের সহযোগী হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য্য। তাঁর সমগ্রজীবনকে এইভাবে ভারত, আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের পটভূমিতে তিনভাগে ভাগ করা যায় এবং সাধারণসূত্র যদি কিছু গ্রহণ করা হয়, তবে তা হবে তাঁর নিরলস ভারত সন্ধান।

উইলিয়ামের জন্ম স্কটল্যাণ্ডের ডানফার্ম লাইনে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে

ব্যাপটিস্ট মিশনারী সম্প্রদায়ে যোগদান এবং ১৮১৮ সনের ১৯শে মার্চ এদেশের শ্রীরামপুরে পদার্পণ। মিশনারীর কাজে ইস্তাফা দিয়ে অতঃপর তিনি কলকাতায় বাস করতে আরম্ভ করেন এবং বাংলা ও সংস্কৃত চর্চায় মেতে ওঠেন। ঠিক এই সময়েই রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে নাটকীয় ভাবে তাঁর যোগাযোগ হয়। বাংলায় বাইবেল অনুবাদের কাজে রামমোহনের সহযোগী হিসেবে যে পরিচয়ের শুরু তার ফলশ্রুতি সুদূর প্রসারী হয়।১ এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী'তে লিখেছেন, "১৮২০ সালে রামমোহন রায় যীশুর উপদেশাবলী নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া Baptist সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারী মিষ্টার উইলিয়াম এডাম খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগপূর্বক একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন।"২ অন্যত্র, "এই উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টীয়দিগের সহিত রামমোহন রায়ের ঘোরতর বাগযুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপর্যুপরি Precepts of Jesus, Appeals to the Christian Public, Bhraminical Magazine প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী ছিলেন। এক্ষণে খ্রীষ্টীয়গণও বিরোধী হইলেন। রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীয় অভীষ্ট পথ পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। মিশনারি-গণ আপনাদের প্রেসে তাঁহার লিখিত ইংরাজীগ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি ধর্মতলাতে 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নামে একটি প্রেস স্থাপন করিলেন। হরকরা নামক তদানীন্তন ইংরাজী সংবাদপত্রের অফিসগৃহের উপর তলায় তাঁহার বন্ধু এডামের জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। আচার্যরূপে অ্যাডামের ভরণপোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় সন্তানগণ ও বন্ধুগণসহ তাঁহার উপাসনালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে বন্ধুবর অ্যাডামের জন্য রামমোহন রায় দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ইহা তিনি নিজে দিয়াছিলেন কি চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিতে পারি না, বোধহয় ইহার অধিকাংশ তাঁহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।"৩

রামমোহন কর্তৃক এডামের ধর্মান্তর সাধন রামমোহনের ধর্মবিজয় হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এডামের স্বাধীন চিন্তাধারা, কুসংস্কারহীনতা

এবং সত্যকে হৃদয়ে উপলব্ধি ক'রে তাকে যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা—এসবই উপেক্ষিত থাকে। রামমোহন এডামের মধ্যে একজন সমানধর্মাকেই দেখেছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হয়ে ওঠে। একজন খ্রীষ্টশিষ্য তাঁর সম্প্রদায় ছেড়ে একেশ্বরবাদকে ঘোষণা করতে তাঁর পাশে এসে না দাঁড়ালে, ব্রাহ্মধর্মের বিবর্তন এত সহজ হত কিনা সন্দেহ। এডামের ইউনিটেরিয়ান ভজনালয়ের রূপান্তর হিসেবেই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসভা গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মসভার কর্মপদ্ধতি আদিতে এডামের অনুসৃত রীতিতেই পরিচালিত হত। এবিষয়ে Miss Collet-এর রামমোহন জীবনীর (৩য় ভারতীয় সংস্করণ) টীকাকারদের অভিমত উল্লেখ করা চলে। তাঁদের বক্তব্য, রামমোহন তাঁর ধর্মচিন্তার বাস্তব রূপায়নে ইউনিটেরিয়ান চার্চের দৃষ্টান্ত সামনে রেখেছেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রস্তুতিপর্বের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাঁর অবদান তাই অবিস্মরণীয়।[৪]

রামমোহন রায় এডামের এতই গুণগ্রাহী ছিলেন যে উইলে তাঁর অর্থ সংস্থান পর্যন্ত করে যান।[৫] এডামও তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে রামমোহনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। বলেছেন, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব তাঁকে সর্বদাই গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। স্বকীয়তায় জ্যোতির্ময়, ধীমান্ এক কর্মযোগীকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন রামমোহনের মধ্যে। কর্মে ও চিন্তায় অখণ্ড মুক্তির একান্ত সাধক বলে তাঁকে মনে হয়েছে এডামের।[৬]

ভারতপ্রবাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে এডাম সাংবাদিক। রামমোহনের ধর্মচিন্তা ও কর্মচিন্তার শরিক হিসেবে এডাম ক্রমশঃ ক'লকাতার সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কোন হিন্দু অবৈতনিক বিদ্যালয়ের অর্থসংগতির জন্য এডামের দানের কথা উল্লেখ করেছেন সংবাদ কৌমুদী (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩২)।[৭]

১৮২৫ সালে Bengal Chronicle-এর সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকতার শুরু। ১৮২৭ সালের জানুয়ারিতে Calcutta Chronicle-এর সম্পাদক। ঐ পত্রিকাকে বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে একাধারে স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক হিসাবে প্রায় নবজীবন দান করলেন। পত্রিকার সাফল্য তৎকালীন বিস্ময়ের কারণ ছিল, কিন্তু সরকারবিরোধী মন্তব্যের জন্য, বিশেষ করে Stamp Act-এর সমালোচনা করার জন্য সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে

Calcutta Chronicle বন্ধ হয়ে গেল ১৮২৭ সালের জুন মাসে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাহানিতে ক্ষুব্ধ হয়ে এডাম সরকারের মুখ্যসচিব Lushingtonকে প্রতিবাদপত্র লিখলেন। জনস্বার্থের প্রয়োজনে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আইনানুমোদিত শালীন এবং শিষ্ট ভাষায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করে করে দিয়ে এডাম কৈফিয়ৎ দাবী করলেন সরকারী আচরণের।৮

এডাম যে বিনীত প্রতিবাদ জানালেন রামমোহন ব্যতীত কোন এ দেশীয় এর আগে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিয়ে এভাবে সাংবিধানিক যুক্তিযুক্ততার প্রশ্ন তোলেন নি। এডাম এবং সিল্ক বাকিংহাম এবিষয়ে আমাদের দেশে অন্যতম পথিকৃৎ। নির্ভীকতা এবং সৎসাংবাদিকতার যে আদর্শ সামনে রেখে এডাম এই কর্মক্ষেত্রে নেমেছেন, কখনও তিনি তার থেকে বিচ্যুত হন নি। এরপর তিনি India Gazette সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে দেখা দিলেন ১৮৩১ সালে।৯ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সুপরিচিত সংবাদপত্র বেঙ্গল হরকরার সঙ্গে এর নীতিগত পার্থক্য সহজেই প্রকট হল। হরকরার সরকারী আনুগত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইণ্ডিয়া গেজেটকে নির্ভীক সমালোচনা এবং গঠনমূলক চিন্তার জন্য প্রায় বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া যায়। ১৮৩৩ সনে হরকরা প্রিন্স দ্বারকানাথের হাতে চলে যায় এবং ইণ্ডিয়া গেজেট তার সঙ্গে যুক্ত হয়, যদিও একটি ত্রি-সাপ্তাহিক সংস্করণ এডামের অধীনে চলতে থাকে। এডামের এই স্বল্পকালীন সম্পাদকত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইণ্ডিয়া গেজেট বহুল প্রচারিত হয়। তাঁর কথা উল্লেখ করে ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক J. Stocqueler লেখেন "The India Gazette is ultra-radical in its politics, it centers largely upon the consideration of questions connected with the government of the country undeterrd by the fear of the displeasure of the authority or any anxiety for the applause of the multitude; its literary taste is severe, its sources of intelligence numerous and its mechanical getting up

not inferior to the most respectable London journals."১০

সম্পাদক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা উপরের সম্মানপত্র থেকেই অনুমেয়। জাতির মানসগঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে ভারতীয় রামমোহন সচেতন ছিলেন, এদেশীয়দের মধ্যে তাঁর কিছু সহযোগীও ছিলেন। কিন্তু বিদেশী এডামের দৃষ্টিতে ভারতের সমস্যা এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের চেষ্টা ভূমিকায় উল্লিখিত কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু এডামের পরিচালনাধীন Bengal Chronicle এবং Calcutta Chronicle-এর সংখ্যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, সেইজন্য India Gazette-এর এডামের সম্পাদকীয়র কিছু নমুনা দেওয়া সমীচীন। বিশেষ বিশেষ সংস্কারের দাবীতে দেশকে সচেতন করে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য আবেদন জানিয়ে এডাম কলম ধরেছেন। সাংবাদিকের কর্তব্য নির্দেশ করেছে India Gazette (জানুয়ারি ২, ১৮৩২) এইভাবে: "It is not the duty of a journalist either abjectly to follow public opinion or impetuously to dictate to it. He can continue..... to throw any light on questions of public interest and importance to strengthen the hands of a good government or to point out what is wanting to improve and correct its adnimistration."১১

বিলেতের Refrom Bill-এর সাফল্য কামনা করে এডামের সম্পাদকীয় (জানুয়ারি ২, ১৮৩২): রিফর্ম বিল সম্পর্কে ভারতবাসী মাত্রেই উৎসাহিত। কারণ এই বিল ভারত সংস্কারেরও ঘোষণাপত্র। কোম্পানী শাসনের নৈরাজ্য এবং তৎসৃষ্ট এদেশীয় সমৃদ্ধির প্রতিকূল সমস্ত বাধার অবসান এতে সূচিত হয়েছে।

এই লেখা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে Hindu Theophilanthropic Societyতে প্রদত্ত কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভাষণকে স্মরণ করিয়ে দেয়; "I would be the first person to reprobate the narrow

and shortsighted policy of our Merchant—Princes—our joint stock sovereigns to advocate the abolition of their salt and opium monopoly in order that the natives may participate in the benefit of an unfettered commerce....."[১২]

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে India Gazette-এর সম্পাদকীয় (জানুয়ারি ৫, ১৮৩২) ঘোষণা করেছে যে শিকল তারা ভাঙবেই। "There are none that are more strongly convinced than we are of the dangers of a free press under a gagging law—dangers to which the conductors of the Press ought to be most feelingly alive, as it is they who are principally exposed to them. Still, however, there is to us an indescribable pleasure in rattling our chains, arising possibly from the hope that we many one day succeed by this means in sapping them asunder".

ব্রিটিশ জনমতকে সতর্ক করে India Gazette লিখেছে (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩২), "It will be hazardous experiment indeed to make India a mere colony, not only pouring her treasures into the lap of England but dependent also upon England for every product of art necessary either to her internal improvement or external defence and that too at a time when she is acquiring an increasing capacity both of production and self-government."

৩রা এপ্রিল, ১৮৩২-এর সম্পাদকীয়তে দেশের আন্দোলনের দিশাহারা-ভাব দেখে ক্ষোভপ্রকাশ ক'রে বলা হয়েছে—পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও ঐকান্তিকতার অভাবে দেশহিতের অনেক মহৎ সঙ্কল্পই ব্যর্থ হয়ে যায়। কোন এক বিশেষ দাবীতে স্থিরলক্ষ্য হয়ে জনমত গড়ে না তুলে, বিভিন্ন

দাবীতে পৃথক ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফলে আন্দোলন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

উইলিয়ান এডাম আমাদের আন্দোলনের ধারাকে যেভাবে তিরস্কার করেছেন, জর্জ টমসনকেও তাই করতে হয়েছিল ১৮৪৩ সনে।[১৩]

১৯শে এপ্রিল, ১৮৩২ সনের সম্পাদকীয় আমাদের দাবীকে প্রবল করে তুলেছে শক্ত কলমে সরকারি নিষেধ উপেক্ষা করে। অনভিজ্ঞ বিদেশীর চেয়ে স্থানীয় কর্মচারীর শ্রেষ্ঠতার উল্লেখ ক'রে এডাম জানালেন, এদেশীয়দের শুধু সরকারী পদে নিয়োগের আবেদন করাই যথেষ্ট নয়, শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার অধিকারও দাবী করা উচিত।

ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসেবে গেজেটের সম্পাদকীয় (২০শে মে, ১৮৩২) : "Who will say that such a man as Rammohon Roy in such a capacity is not eminently qualified to benefit his country ? Or that his election to a seat in the legistative councils of the Government would not stimulate the ambition of his countrymen and in due time produce worthy competitors for the same high honour."

এডামের সাংবাদিক জীবনের জের অনেক দূর টানা হল। কিন্তু কজন স্বদেশী আমাদের চেতনামুক্তির উষাকালে আমাদের নিরুচ্চার আশা আকাঙ্ক্ষাকে এরকম বাণীমূর্ত্তি দিতে পেরেছেন ? এডামের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ কৃতজ্ঞ।

এডামের জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হল ভিন্নতর রূপে। আমরা আগেই দেখেছি এডাম ইংল্যাণ্ডের Reform Bill কে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতেরও Reform Bill বলে। উদারনৈতিক সরকারের প্রতিভূ হিসেবে যখন বেন্টিঙ্ক আমাদের দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন ভারতের শাসনসংস্কার আসন্ন জেনে এডাম দিশারী হবার জন্য আবেদন করলেন বেন্টিঙ্কের দরবারে। এডামের মতে নতুন শাসকের প্রথম করণীয় শিক্ষাসংস্কার। "It is assured that Government

is desirous of encouraging education amongst all classes of its subject as a means of improving their condition by a better knowledge of the arts of life that minister to human wants without ...moral force, which education only can create. Government, however benevolently administered, is but the will of the strongest which finds no response where physical power does not reach and lagislation however wisely devised is but a dead letter..." ১৪ক

ভারতের চেতনামুক্তির পথনির্দেশ করতে গিয়ে এডাম দৃঢ়মত হলেন যে, দেশের ঐতিহ্যের ভিত্তি ধরে নাড়া দিলে কোন আরোপিত সংস্কারের ভারই সে বইতে পারবে না। তাই এডামের মতে, দেশীয় ঐতিহ্যের পরিচিত পটভূমিতে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সমৃদ্ধির পথে।১৪খ

এডাম ভারতের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পেরেছেন এবং দেশের উন্নতি এবং দশের উন্নতির মধ্যে মৌল প্রভেদ তাঁর গবেষক দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এখানেই তাঁর মৌলিকত্ব এবং দৃষ্টির গভীরতা। ভারত উদ্ধার করতে গেলে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানতে হবে—সাধারণ মানুষের গতি-প্রকৃতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্থা সংস্থান—সবই জানতে হবে। দেশ বলতে এর সমষ্টিগত রূপই বোঝায় এবং সংস্কারের বীজ এই জমিতেই বুনতে হবে।

এডামের আবেদন নিষ্ফল হয় নি। বেন্টিঙ্ক তাঁর কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং এডামকে চিনতেও তাঁর ভুল হয় নি। ১৮৩৫ সনের ২০শে জুনের Minutes-এ এডামকে ভারতসন্ধানে নিযুক্ত করে তিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "There happens to be an individual, peculiarly qualified for this undertaking, Mr. Adam. This gentleman came to India seventeen years ago as a Missionary and has latterly been that Editor of the

India Gazette. With considerable ability, he possesses great industry and a high character for integrity. His knowledge of the languages and his habits of intercourse with the Natives give him peculiar advantage for such an enquiry".১৫

শুরু হল এডামের ভারতসন্ধান। যোগ্যতা, নিষ্ঠা, পরিশ্রমের ত্রিবেণীসঙ্গম প্রথম বৈজ্ঞানিক ভারত অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি তাঁর Report on the State of Venercular Education তিনপর্বে সমাপ্ত হল ১৮৩৮ সনে। ভারতের আত্মার উদ্ঘাটন হয়েছে এই রিপোর্টে। রামমোহন, নব্যবঙ্গ এবং তৎকালীন সাংবাদিক ফসল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাচলের যে রূপ ফুটে ওঠে, সেটা যে সম্পূর্ণ নয়, এমন কি যথার্থও নয়, সে কথা অনুভব করা যায় এডামের বিবরণীর পাতা ওলটাতে গিয়ে। সশিষ্য রামমোহন তৎকালীন জনসমুদ্রের ঢেউ মাত্র। তার তলায় যে গভীর অতল সমুদ্র নিথর হয়ে রয়েছে তার খবর এডামই আমাদের দিয়েছেন। এবং ঢেউয়ের ওঠা পড়াই যে দেশের প্রগতির একমাত্র পরিমাপ যন্ত্র নয় সেদিকেও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংখ্যা তথ্যনির্ভর বস্তুভিত্তিক এই বিবরণী সেকালের দর্পণ এবং এডামের বিস্ময়কর পথিকৃৎ গবেষক মনেরও। বহু পরে Hunter-এর 'Statisitical Account of Bengal' ছাড়া এর সমান্তরাল কোন কাজই বিরল। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার ধারা—তার পরিচালন ব্যবস্থা—পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা, মক্তব, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়ের চরিত্র—ভাষা মাধ্যম—ছাত্রসংখ্যা, ছাত্রপ্রকৃতি, ছাত্রবৃত্তি-শিক্ষক-পৃষ্ঠপোষক সমাজ—অঞ্চলবিভাগের অনুপাতে শিক্ষা কেন্দ্রের অপ্রতুলতা—এসব তথ্যই তিনি পরিবেশন করেছেন এই যুগান্তকারী বিবরণীতে। গ্রামবাংলার পল্লীতে পল্লীতে তাঁর পদক্ষেপ ঘটেছে—নিজে তথ্যসংগ্রহ এবং পরীক্ষা করেছেন। দেশের স্বরূপ জেনে একাগ্র হয়ে ভারত সন্ধানে ব্রতী কর্মযোগী এডাম তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। সমসাময়িক চিন্তানায়কদের থেকে এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। দেশসেবীকে দেশের প্রাণকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চলে না। এই যোগসূত্র থাকলেই আন্দোলন প্রাণবন্ত

হয়, সামান্য ফুৎকারে নিভে না গিয়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। এডাম পথনির্দেশ করেছেন কিন্তু সহযাত্রী পান নি। তাই আমাদের দেশে আন্দোলন পিছিয়ে গিয়েছে। এডাম বাণীর চেয়ে কাজ বড় মনে করেছেন, কিন্তু বাণীকে মানুষ মনে রেখেছে, কাজকে যতটা নয়। তাই এডামের কাছে আমাদের ঋণ স্মরণ করে তাঁর অবিস্মরণীয় বিবরণী পাঠে আমরা খানিকটা গ্লানি মোচন করতে পারি।

এডাম তাঁর অক্লান্ত গবেষণার ফল হিসেবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন দৃপ্ত ভঙ্গীতে।

"The native mind at the present day although it is asleep, is not dead. It has a dreamy sort of existenc in separating, combining and recasting in various forms, the fables and speculations of past ages." (P. 276-77)১৬

এ মনকে জাগিয়ে দেবার উপায় জানলাগুলো খুলে দেওয়া, ঘরছাড়া করে দেওয়া নয়। তিনি জানালেন, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা এই যে, প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকেই আদল ফিরিয়ে বর্তমানের উপযোগী ক'রে তোলা যেতে পারে সবচেয়ে সহজে, নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে এবং ফলপ্রদরূপে। এভাবেই একমাত্র দেশবাসীকে শিক্ষিত করা যেতে পারে সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রস্তুতি হিসাবে।

অভ্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার বাতায় ঘটাবার কোন প্রয়োজন নেই। ভাষার মাধ্যম তো নয়ই। বরং ইংরেজীর সর্বস্তরে প্রচলন উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে। শিক্ষা মুষ্টিমেয়র জন্য নয়। শিক্ষা সর্বজনীন হওয়া একান্তই কাম্য। "It is impossible for me fully to express the confirmed conviction I have acquired of the utter impracticability of the views of those ..who think that the English language should be the sole or chief medium of conveying knowledge to the natives."

শিক্ষার গঙ্গাবতরণ যুক্তিকে সমালোচনা করে এডাম যে বক্তব্য পেশ

করেছেন সে কথা সামনে রেখে বর্তমান পটভূমিতে পুরানো প্রসঙ্গের পুনর্বিচার চলতে পারে। তাঁর মতে, এই পরিকল্পনায় এদেশীয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, উপরের স্তরকে নীচের স্তরের যোগ্যতার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়, যে স্তর সর্বশেষ ধাপ থেকে উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি।

উচ্চশিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শিক্ষক এবং বর্ণপরিচয়হীন চাষীর সংযোগ হবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার থেকে ধাপে ধাপে উপরে উঠে এলে। যে যোগসূত্র দেশের পক্ষে অপরিহার্য্য, প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে যার শুরু তাকে এডামের সময় থেকে উপেক্ষা করে আজ পর্য্যন্ত দেশের মূল অংশকে আমরা দূরে ঠেলেছি। মাথাভারী শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকে এতদিনে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে মাতৃ-ভাষায় গ্রাম্য পরিবেশ ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার খসড়া রচনার দিকে। কালের বিচারে এডামই হয়ত বিজয়ী বলে বিবেচিত হবেন। তাঁর সময়ে শাসকগোষ্ঠীর কাছে এডাম শিরোপা পান নি। মেকলে জয়ী হয়েছেন। ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমপ্রসারের প্রস্তাব বেন্টিঙ্ক শাসনে গৃহীত হয়েছে। 'Our work is to educate the schoolmasters for the next generation,' মেকলের এই নীতিই শিক্ষার গতি নির্ধারণ করেছে। এডামের আমূল সংস্কার প্রকল্প ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল এবং সেই সঙ্গে অর্থসংগতির বাইরে।

পরবর্তী শাসক অকল্যাণ্ড এবিষয়ে দ্বিমত নন যদিও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেন নি। "The first step must be to diffuse wider information and better sentiments amongst the upper and middle classes."১১ এইভাবে শিক্ষা একটি বিশেষ শ্রেণী বা সমাজকে ব্রিটিশ রাজের কৃতজ্ঞ সেবকে পরিণত করার জন্য প্রবর্তিত হল, সর্বজনীন জ্ঞানপ্রসারের জন্য নয়। মাধ্যম ইংরাজী, বিষয় পাশ্চাত্যবিদ্যা, স্তর উচ্চশিক্ষা, শিক্ষার্থী উচ্চমধ্যবিত্ত। এডামের পিছনে দেশের চিন্তানায়করা এসে দাঁড়ান নি। গোষ্ঠীর বাইরে তাঁদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি প্রসারিত হয় নি। কিন্তু এডামের প্রকল্প যে দিবাস্বপ্ন ছিল না, তার প্রমাণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসক টমাসনের প্রচেষ্টা। এডামের বিবরণীর

সার গ্রহণ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে মালা তিনি গাঁথলেন, তা তাঁর এবং এডামের গলার হার হয়ে রইল।

শিক্ষা কমিশন তার খতিয়ানে এডামের বিবরণীর মূল্যায়নে ভুল করেন নি। তাদের ভাষায় 'One of the ablest reports ever written in India' এই দলিল ' from the accuracy of its information, the candour, sense and statesmanship of its author is among the most valuable and interesting publications extant on education in India."১৮ এখনও এডামকে আমরা কাজে লাগাতে পারি যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধুন্ধুমারে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের অগ্রাধিকার আমরা বিস্মৃত না হই।

এডামের ভারতপ্রবাসের দুঃখময় দিনগুলি (আমাদের কাছে অবিস্মরণীয়) শেষ হল। ভগ্ন হৃদয় এডাম পাড়ি জমালেন সুদূর আমেরিকায়, বস্টনে, ১৮৩৮ সনের শেষে। কিন্তু ভারতজিজ্ঞাসা তাঁর মেটেনি। তাই বস্টনে তাঁর ভারত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে এডাম ভারতের দাসপ্রথার সমস্যা তুলে ধরেছেন ইংলণ্ডের দাসবিরোধী আন্দোলন থেকে একে আলাদা করে তিনি দেখেন নি। এই প্রসঙ্গে এডাম বলেছেন, "My primary design is to cooperate with a Society which has lately been established in England, called the British India Society, the objects of which are to collect and communicate information respecting India to excite an interest in the welfare of its people and to promote measures for their protection and improvement. By the force of circumtances I have been separated both from India and England, but my thoughts are constantly reverting to both countries and I shall be in some measure satisfyng 'equally the affections of my heart and my convictions of duty in

contributing my aid to give a right direction to the efforts of that association." ১৯ক "There will be this advantage also···that if slavery in India···is the least of the evils under which that country groans, you will be better able by this to judge of the greater evils under which it suffers." ১৯খ তিনিই উচ্চকণ্ঠে পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন যে ১৮৪১ সনেও ব্রিটিশ ভারতে দাসপ্রথা এবং ব্যবসায় প্রচলিত আছে। "It exists probably as extensively and to a great extent in as exaggerated a form as it did lately in the West Indies; that it has been and is legalised and nourished and supported by the East India Company's Government."২০

এডাম আগেই বলেছেন দাসপ্রথা ব্রিটিশ কুশাসনের নিম্নতম পরিমাপ ধরে নিয়ে অন্যদিকের বিচারে বসতে হবে। ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন এডাম এই সূত্রে। তাঁরই ভাষায়, এদেশীয় শাসন ও সমাজব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীন বহিরাগত ইংরেজ জাতি সত্য, ন্যায়, নীতি বিসর্জন দিয়ে এদেশীয়দের অধিকার এবং ভূখণ্ড আত্মসাৎ ক'রে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। রাজস্ববৃদ্ধির পথে অন্তরায় যাবতীয় দেশীয় ব্যবস্থা উপেক্ষা ক'রে, বিচারবিভাগের সহযোগে রাজস্ব বিভাগ সামান্য ভূম্যধিকারীর চিরাগত অধিকারেও হস্তক্ষেপ করেছে এবং করের উপর কর বসেছে। মালিকানার অনিশ্চয়তা এবং অধিকার লোপ বাংলাদেশের মানুষকে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছে। দেশের জ্ঞানপীঠগুলিও সরকারী শোষণে এবং অবহেলায় স্তিমিত প্রায়।২১

ভারতে আইনের শাসনে যে কথা ঘোষণা করা সম্ভব হয় নি, আমেরিকার স্বাধীন মাটিতে দাঁড়িয়ে এডাম তাই জানিয়ে দিলেন। বিশেষ ক'রে তাঁর বিবরণীর অবহেলা তাঁর মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, উদ্ধৃতির শেষ ছত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের সমস্যার উদ্ঘাটনে তৎকালীন কোন ভারতীয় কলমও এতটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নি।

আমেরিকার দিনগুলিও একে একে ফুরিয়ে গেল। এবার ঘরে ফেরার দিন। এডাম এলেন স্বদেশে ১৮৪১ সনে। কিন্তু অবসরের আনন্দ উপভোগ তাঁর অদৃষ্ট লিপি নয়। আর তাঁর প্রতি কর্মোদ্যোগে ভারত সন্ধানও অনিবার্য্যভাবে যুক্ত হয়ে যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় "তিনি ইংলণ্ডে গিয়াও ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ সনের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর সুখদুঃখ ইংলণ্ডের লোকের গোচর করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভা জর্জ টমসন, উইলিয়ম এডমিস, মেজর জেনারেল ব্রিগ্‌স্ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। এবং ১৮৪১ সালে British India Advocate নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আডাম সাহেব তাহার সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত হইলেই রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি পত্রযোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বোধহয় প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেও ত্রুটি করেন নাই।"[২২]

"রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম-সাহেবের সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা ছিল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনেক কাজ করিতেন। তাঁহার ভবনে মধ্যে মধ্যে যুবকদলের সম্মিলন হইত।"[২৩]

পূর্বপরিচয়ের ভিত্তিতে এডাম এবং নব্যবঙ্গের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হল এবং এদেশের অভিযোগ ওদেশে প্রচারের দায়িত্ব নিলেন উইলিয়াম এডাম। এর পরিচয় পাওয়া যায় গোবিন্দ বসাককে লেখা রামগোপাল ঘোষের ১২ই আগষ্ট, ১৮৩৮ সনের এক চিঠিতে—"I had several interviews with him previous to his departure and his earnest proposal was that we might set about collecting information which should guide the public and public measures."[২৪]

জর্জ টমসন এবং উইলিয়াম এডাম ভারতের হয়ে ইংলণ্ডে সাংবিধানিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং প্রসার ঘটান। পরিণত বয়স পর্য্যন্ত এডাম ভারতসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তার প্রমাণ ১৮৪১ সনে তাঁর সম্পাদনায় ঐ

সোসাইটি-র পক্ষে East India Year Book-এর প্রকাশ। ভারত সম্পর্কিত তথ্য এবং সমস্যা এতে তুলে ধরা হয়েছে। ইংলণ্ডে সোসাইটির কার্যকলাপ এবং এডামের প্রচেষ্টার পরিচয় British India Advocate-এর অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়।২৫ক Year Book-এর কপি কলকাতার National Library-তে আছে।২৫খ

ভারতে বিদেশী ধর্মান্তরকারী যত এসেছেন, প্রকৃত মিশনারি সেই তুলনায় বিরল। রেভারেণ্ড উইলিয়াম সেই বিরল গোষ্ঠীর অন্যতম। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেকালের প্রখ্যাত সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী লিখেছেন, "Mr. Adam was one of the few European philanthropists who befriended us, putting us in the way of progress at a time when Europeans used to make as much out of the country···as they could and leave.—as great as David Hare, though unrecognised. He advocated the rights of the natives when the idea of native rights seemed ludicrous. He was the Robert Knight of the Anglo Indian Press at its commencement."২৬ এ শ্রদ্ধাঞ্জলি এডামের প্রাপ্য।

পাদটীকা

১। Bengal, Past and Pesent, 1914 Rev. William Adam—article by S. C. Sanyal pp 251. Note : "The following particulars of him I have found among manuscripts left by the late Mr. E. S. Wengor in the Serampure College Library, which I publish by the kindness of Dr. George Howells, the Principal of the College."

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ, ভাদ্র ১৩৬২, পৃঃ ৬২

৩। ঐ পৃ: ৯৭

৪। S. D. Collet, Life and Letters of Raja Rammohon Roy. 3rd Indian Edition by D. K. Biswas and P. C. Ganguli. p. 245.

৫। Ibid p. 211. Note Adam's letter dated Oct 14, 1826.

৬। W. Adam, A Lecture on the Life and Labous of Raja Rammohon Roy, Calcutta 1879 Edition, pp. 22-25

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড পৃ: ৪৩

৮। B PP 1914, pp. 258-50.

৯। Ibid p. 260

১০। Ibid p. 28

১১। India Gazette এর যাবতীয় উদ্ধৃতি National Library-তে রক্ষিত ১৮৩২ সনের মূল পত্রিকা থেকে গৃহীত। N L Ref no : No. 221

১২। B. B. Majumder, Indian Political Thought pp. 278-279

১৩। Raj Jogeshur Mitter : Speeches of George Thompson pp. 29 and 39.

১৪। (ক) এবং (খ) B PP 1914 p. 262

১৫। A. N. Basu edited Adam's Report on the State of Vernacular Education, C. U. 1941 Introduction p. LXVI

১৬। Ibid, Extracts from the Original Report with pages indicated occur now onwards.

১৭। Ibid Introduction p. LI

১৮। Ibid : Intro p. LVI

১৯। ক ও খ W. Adam : The Law and Custom of Slavery in British India, London. pp. 6-7

২০। Ibid pp. 6-7

২১। Ibid pp. 235-236.

২২। শিবনাথ শাস্ত্রী ; রামতনু লাহিড়ী পৃ১৪৭

২৩। ঐ পৃ১৪৬

২৪। R. G. Sanyal, A General Biography of Bengal Celebrities, p. 46

২৫। (ক) Bengal Hurkaru, May 29 & 31, 1841

২৬। (খ) National Library Ref No : p. 873

২৭। B PP 1914 : Concluding Remarks.

লালা লাজপত রায়ের আত্মকথা

অনুবাদক : কিরণ মৈত্র

[ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লালা লাজপত রায় একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর সম্বন্ধে নূতন ভাবে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁর আত্মকথা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে লালা লাজপত রায় বিদেশ যাত্রা করেন এবং যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯১৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। এই ক-বছর ভারতের বাইরে যে সকল ভারতীয় বিপ্লবী আমেরিকা ও জাপান থেকে জার্মানীর সাহায্যে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করছিলেন লাজপত তাঁদের অনেকেরই সংস্পর্শে আসেন।

সাধারণের কাছে লাজপত রায় সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক বলেই পরিচিত। এখনও সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলতে গেলেই লোকে লাল-বাল-পাল বলে আরম্ভ করেন। বাল এবং পাল সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন কিনা সে কথা এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু লাল যে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই ক্ষুদ্র 'আত্মকথায়'।

যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার সময় 'আত্মকথার' পাণ্ডুলিপি লালা লাজপত রায় তাঁর বন্ধু শ্রীযুত সি. ডব্লু. হিউবন-এর কাছে রেখে আসেন। ইচ্ছে ছিল প্রয়োজন বোধে চেয়ে নেবেন। কিন্তু সে চাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। ১৯২৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৪৩ সালে শ্রীযুত হিউবন্ পাণ্ডুলিপিটী শ্রীযুত ক্রাঙ্কলিন. এফ. হপান-এর মধ্যস্থতায় নু্য ইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগারে জমা দেন। সর্ত থাকে যে, ভারত স্বাধীন হলে তার জাতীয় অভিলেখাগারে পাণ্ডুলিপিটী ফেরত দেওয়া হবে। নু্য ইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ১৯৫৩ সালে সেই সর্ত পালন করেন।]

১৪ই নভেম্বর [১৯১৪ সাল] ইংলণ্ড থেকে রওনা হয়ে ২১ শে নভেম্বর নু্য ইয়র্ক পৌঁছলুম। জাহাজে সঙ্গে যাচ্ছিলেন সস্ত্রীক অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু এবং তাঁর সহকারী শ্রীযুত সেন একদলে এবং আরেক দলে

ছিলেন অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, শিবপ্রসাদ গুপ্ত,১ এবং তাঁর সেক্রেটারী সুরজ নারায়ণ। ন্যুইয়র্কে আমি, শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও তাঁর ভৃত্য এক সঙ্গে একই হোটেলে অথবা একই ঘরে থাকতাম। অধ্যাপক সরকার আলাদা থাকতেন। তাঁর গতিবিধি এবং কার্যকলাপ আমাদের কাছে রহস্যময় লাগতো, কেন না তাঁর জীবনযাত্রায় যে উঁকি মারবো তার উপায় ছিল না।

আমার আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অধ্যাপক সরকার আমাকে চক্রবর্ত্তীর২ বাড়ীতে নৈশ ভোজনে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে গিয়ে তিন জনের সঙ্গে আলাপ হল। স্বামী ভূমানন্দ, চক্রবর্ত্তী এবং তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার স্ত্রীনা—তিনি জাতিতে জার্মান। একজন গোঁড়া স্বদেশ প্রেমিকের বাড়ীতে ভূমানন্দকে দেখে অবাক হলাম। ওকে বরাবরই আমি গুপ্তচর বলে সন্দেহ করতাম। তিনজনের কাউকে আমার পছন্দ হল না। ভূমানন্দ অবশ্য অনাহূত অতিথি ছিলেন। ঘরটি বড়ই নোংরা ছিল। বলতে কি কাঁটাচামচ পেয়ালা পিরিচগুলো দেখে আমার রীতিমত গা ঘিনঘিন করছিল। খাবারও তেমন মুখরোচক ছিল না। চক্রবর্ত্তী ও তাঁর অংশীদারের কথাবার্ত্তা ও চালচলন আমার মোটেই ভালো লাগেনি। যদিও তাঁরা আমার প্রতি খুব সন্তুষ্টশীল ছিলেন এবং আমাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন। দুচারটে সাধারণ কথা ছাড়া কোনরকম রাজনীতি আলোচনায় উৎসাহ দেখালুম না। অধ্যাপক সরকারকে কথাটা এক সময় জানিয়ে ফেললুম যে, জায়গাটা এবং এদের সঙ্গ ঠিক সুবিধের লাগছে না, সুতরাং তাড়াতাড়িই সেখান থেকে চলে এলাম।

কিছুদিন পর আমার সম্মানার্থে আমেরিকার হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন—হিন্দু ছাত্র এবং অন্যান্য হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান—এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করে। সভায় অনেক আমেরিকাবাসী ও স্থানীয় হিন্দুদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। লক্ষ্য করার বিষয় ছিল যে, একমাত্র বাঙ্গালী ছাড়া পাঞ্জাবী অথবা মারাঠী অর্থাৎ আর কোন হিন্দুস্থানী উপস্থিত ছিল না। ন্যুইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি ভবনে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক বসু সভায় কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্তা বসু

সম্ভবতঃ শেষপর্যন্ত ছিলেন। সভাপতির আসনে ছিলেন চক্রবর্ত্তী। ইংরেজ বিদ্বেষ দিয়েই তিনি বক্তৃতা সুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক সুরেই বলে গেলেন। মাঝে মাঝে তিনি একেবারে জার্মান ঘেঁষা হয়ে পড়েছিলেন। আমার বক্তৃতায় আমি নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বললাম :

"আমি একজন ভারতীয় দেশ প্রেমিক এবং দেশের মুক্তিই আমার কাম্য। জার্মানদের প্রতি কোনরকম সহানুভূতি অথবা বিদ্বেষ আমার নেই। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্বয়ং-শাসিত অংশ হিসাবে থাকবো তবুও অন্য জাতির শাসনের অধীনে যাবো না"।

চরম মুহূর্ত্ত এলো যখন স্যানা বক্তৃতা দিতে উঠে "জন বুলের" একটি মাটীর প্রতিমূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করলেন। তিনি ঐটি সঙ্গে এনেছিলেন তখনকার দ্বন্দ্বের প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যে। দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ ছিলেন। তাঁরা এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। সভান্তে ধন্যবাদ প্রস্তাব এবং প্রশস্তির উত্তরে আমি স্যানার এই দুর্ব্যবহারের জন্যে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। নিজেকে তাঁর মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। দর্শকদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন গুপ্তচর ছিল। সেবারের ভ্রমণে চক্রবর্তীর সঙ্গে সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ।

এর অল্পদিন পরেই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি কসমোপলিটন ক্লাবে পাঞ্জাবী এবং মারাঠীরা আমাকে নৈশ ভোজনে আমন্ত্রণ জানায়। ওরা সবাই ঐ ক্লাবেরই বাসিন্দা। দুজন পাঞ্জাবী—সুচত সিং এবং দিলীপ সিং গিল—আমাকে আগে থেকেই জানতো। বাঙ্গালীদের উপর ওদের খুব রাগ।

বাঙ্গালীরা অবশ্য ওদের গুপ্তচর বলতো। সুচত সিং সম্পর্কে যে ওদের উক্তি নির্ভুল তাতে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। আবদুল আজিজ নামে একজন মুসলমানও ঐ ভোজসভায় ছিল।

ওর সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। দিলীপ সিং গিলকে আমার আরও বেশী দুষ্টপ্রকৃতির মনে হল। সে দেখতে বেশ সুপুরুষ আর আমেরিকান

মহিলাদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। ভাগ্যগুণে বেশ বিলাসিতার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছিল। মহিলারা পাল্লা দিয়ে অঢেল উপহার দিয়ে যাচ্ছিল ওকে।

বাঙ্গালীদের তুলনায় মারাঠিরা ছিল বেশ গোবেচারী। ওদের বেশীর ভাগই গোখলে পন্থী। আমার প্রতি ওরা বেশ সদয় এবং সম্ভ্রমপূর্ণ ছিল।

আমার ঘরে এসে অনেক বাঙ্গালী আমার সঙ্গে দেখা করে ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতেন। তাঁদের উদ্ভট বক্তব্যে উৎসাহ দিতাম না। পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতাম যে, যদিও ইংরেজদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই বা তাদের যুদ্ধজয়ের প্রার্থনাও আমি করি না, তবুও জার্মানদের প্রতি কোন আস্থা আমার নেই এবং তাদের কিংবা তাদের নিযুক্ত কোন দালাল মারফৎ ভারতের মুক্তি আসবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। সব সময় এই মতবাদে আমার বিশ্বাস ছিল যে, বিদেশীদের সাহায্যে স্বাধীনতা পাওয়া অর্থহীন।

প্রায় এই সময়ে গদর পার্টির দুজন পাঞ্জাবী যুবক আমার সঙ্গে দেখা করে। তারা ভেবেছিল আমি ভেতরে ভেতরে হয়ত বিপ্লবী, বাইরে নিয়মতন্ত্রবাদীর মুখোস পরে আছি। জানতে পারলাম ওরা ইয়োরোপে যাচ্ছে। একজনের নাম কেদারনাথ; আরেকজনের নাম সম্ভবতঃ ঋষিরাম। কিছুদিন পরেই অধ্যাপক সরকার বরকতুল্লারও সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সঙ্গে বহুবারই আমরা দেখা করেছি। তিনি বললেন, শীঘ্রই ভারতের এক বিপ্লব আসছে। তিনি আরো জানালেন যে, সব কিছুই প্রস্তুত, দিনক্ষণও ঠিক হয়ে আছে। কাবুলের আমীরও যে এদের সঙ্গে আছেন, এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিতে যে কোন ভয় নেই তাও বললেন। কারণ তিন মাসের মধ্যেই ভারত স্বাধীন হচ্ছে। আমি তাঁকে "বাগলোল" [মাথা মোটা] আখ্যা দিলাম। উনি যা বললেন তার প্রতি আমার এক বিন্দু বিশ্বাস নেই, এ কথা আমি জানালাম। ভারতে আমীর কিম্বা জার্মান শাসন আমার কাম্য নয়। ব্রিটীশ শাসনকেও আমি কতখানি ঘৃণা করি, তাও বললাম। আমি বিশ্বাস করি না যে, বর্তমান অবস্থায় বিদেশী

আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষ নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে ; এমন কি, যদি ইংরেজ বিতাড়নও কোনক্রমে সার্থক হয়ে ওঠে। তিনি আমাকে কাপুরুষ বললেন এবং আমার ওপর কোন আস্থা রাখতে চাইলেন না। যাহোক, আমাদের প্রীতির ভেতর দিয়েই ছাড়াছাড়ি হল। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আমার খুবই নীচু ধারণা হলেও তাঁর দেশপ্রেম ও চরিত্র সম্পর্কে উচ্চ ধারণাই হল। এর পরেও তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি আর আলোচনা করেন নি।

৩০ শে কিংবা ৩১শে ডিসেম্বর আমরা অর্থাৎ আমি এবং শিবপ্রসাদ গুপ্ত বস্টনের পথে রওনা হই। সেখানকার সব হিন্দুদের সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়। আমাদের প্রতি তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধার অভাব ছিল না। দেখেছি প্রায় সব বাঙ্গালীদেরই বিপ্লবের দিকে ঝোঁক। একবার মাত্র স্বামী পরমানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাও নববর্ষের দিনে ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের আহুত এক সম্বর্দ্ধনা সভায়। পরস্পর শুভেচ্ছা জানানো ও দু'চারটি মামুলী কথা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হয়নি। ফ্লাইয়র্কে পৌঁছবার পরক্ষণে পর অধ্যাপক সরকার তাঁর আমেরিকার বন্ধুদের জন্যে ব্রেসলেন হোটেলে যে নৈশভোজনের আয়োজন করেন, তাতে আমাকেও আমন্ত্রণ জানান। সেখানে মেসার্স জন কুইন, বার্ক কোচরেন (প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য এবং বিখ্যাত আইরিশ বক্তা), জার্মান অধ্যাপক কিনো মায়ার, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, এঁরাও ছিলেন। যতদূর মনে হয়, আরো দু' একজন ছিলেন ; যাদের নাম ঠিক মনে পড়ছে না। কিনো মায়ার-এর সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। শুধু মিঃ কোচরেন-এর বাড়ীতে আরেকবার দেখা হয়েছিল। মিঃ কুইন ভাড়াগাড়ীতে সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

বস্টনে জীবনে এই প্রথম দেখা হ'ল বোম্বাইবাসী রুস্তম রুস্তমজীর সঙ্গে। রুস্তমজী সস্ত্রীক আমরা যে হোটেলে থাকতাম সেখানেই ছিলেন। তিনি শিবপ্রসাদ গুপ্তের কাছে তাঁর আর্থিক দুর্গতির কথা জানিয়ে বললেন যে, হোটেলের বহু পাওনা তাঁর শোধ হয়নি। তার পরই শিবপ্রসাদ

গুপ্তের কাধে হাত পেতে বসলেন ; কিন্তু গুপ্ত তাঁকে হতাশ করলেন। পরে ১৯১৫ সালে আবার আমেরিকায় ফিরে এসে শুনলাম যে, রুস্তমজীর খাই খরচা যোগাতো ব্রিটীশ সরকার এবং তাঁর কাজ ছিল ইংরেজের পক্ষে, যুদ্ধ প্রচার।

২১শে নভেম্বর থেকে ৩রা অথবা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯১৫ সাল) পর্যন্ত যতদিন ম্যাইয়র্কে ছিলাম যতদূর মনে পড়ে, অধ্যাপক [ই. আর. এ] সেলিগম্যান ও অধ্যাপক [ফেলিস] এডলার ছাড়া আর কোন জার্মান অথবা জার্মান-আমেরিকানের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এঁদেরকেও আমার কখনো গোঁড়া জার্মান বলে মনে হয়নি। গোঁড়া জার্মান নয় এই জন্যেই বলছি তাঁরা ব্রিটিশ ভক্ত ছিলেন না। ম্যাইয়র্ক ছেড়ে আসার শেষ সপ্তাহে ওয়ালটার লিপম্যান আমায় হার্ভার্ড ক্লাবে নৈশভোজনে আমন্ত্রণ করেন। 'নিউ রিপাব্লিক' কাগজের কর্মীদের সঙ্গেও তাঁদের প্রাত্যহিক মধ্যাহ্ন ভোজনে সম্ভবতঃ বার দুয়েক মিলিত হয়েছি। দেখলাম তাঁরা সকলেই মিত্র শক্তির পক্ষে। অধ্যাপক এইচ. আর ম্যাসি ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে ; তাঁরা নৈরাশ্যবাদী। অধ্যাপক সেলিগম্যানের সৌজন্যে বহু শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও দানবীরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। এর ভেতর কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। যাবার দিন ভোরবেলায় ওয়াশিংটন রওনা হব এমন সময় হেরম্বলাল গুপ্ত এসে হাজির। তাড়াহুড়োতে ওকে আর ঘরে নিয়ে বসালাম না। সোজা ট্যাক্সিতে পেনসিলভেনিয়া ষ্টেশনে নিয়ে চললাম। কথায় কথায় জানলাম গুপ্ত জার্মান সরকারের বিশ্বস্ত লোক। খবর নিচ্ছিলেন আমি তাঁদের সহায়তা করবো কি না। আমি সরাসরি না বলে দিলাম। মিডলওসেস্ট-এর কোথাও আবার দেখা করবেন বলে তিনি আমায় কথা দিয়ে বিদায় নিলেন। ম্যাইয়র্কে বিখ্যাত ইংরেজ নেতা মিঃ কিয়ার হার্ডির ছেলে ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওঁরা বহুবার আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন।

১০নং ওয়াশিংটন (ডি সি), অ্যাটলান্টা (জি সি) এবং নিউ অরলিন্স-এ কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেনি। ২১শে ডিসেম্বর

থেকে জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এক পক্ষকাল বস্টনে থাকার সময়েই আমি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' লিখতে সুরু করি। উল্লেখ করার মতো দুজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। অধ্যাপক জে. উড ও আরেকজন জাপানী অধ্যাপক যাঁর নাম ঠিক মনে আসছে না (সাকী-ই হবে বোধহয়)। অধ্যাপক উড ও স্যাইয়র্কের মিঃ জন কুইন আমাকে ওয়াশিংটন-এর জন্যে খানকয়েক পরিচয় পত্র দেন।

মার্চের কোনও এক সময় চিকাগো পৌঁছেছিলাম। এক বোর্ডিং হাউসে থাকতাম। ঘরটি ভাড়া করেছিলাম। চিকাগোতে হিন্দুস্থান আমেরিকা এসোসিয়েশনের কে. কে. বসু এবং ডাঃ খানচাঁদ বলে এক পাঞ্জাবী যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এক জার্মান প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ অনুষ্ঠানে কিছু বলবার জন্যে চাঁদ আমাকে অনুরোধ করে। কিন্তু রাজী হলাম না। একদিন সন্ধ্যেবেলা অচেনা এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক এসে ঐ একই অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাঁকেও হতাশ করলাম। খানচাঁদও তখন উপস্থিত ছিল কিনা মনে নেই, যদিও সন্দেহ হচ্ছিল খানচাঁদই ওকে উসকিয়েছে। আমার বিশ্বাস তিনি জাতিতে জার্মান; আমি না-ই বলে দিলাম। লোকটি পাঁচ মিনিটের বেশী ছিল বলে মনে হয় না। আপনাকে বড্ড বিচলিত দেখাচ্ছে বলে উনি চলে গেলেন।

এখানেই হেরম্ব গুপ্তর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়। অনেকক্ষণ ধরে উনি আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। অবস্থার গুরুত্বটা বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে আমার পেছনে উনি আদা জল খেয়ে লেগেছিলেন। হেরম্ববাবু বললেন জার্মানরা আমাকে তাঁদের দলে পাবার জন্যে উন্মুখ এবং যে কোন সর্তে তারা আমার পরামর্শমত কাজ করতে রাজী। আমার অবস্থাটা ওকে বুঝিয়ে বললাম এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়াতে অস্বীকার করলাম। তবে পরামর্শ দিলাম জার্মানদের কাছ থেকে ওঁরা যা অর্থ পাচ্ছিলেন তা থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখার। ঐ অর্থে শিক্ষার খাতে ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় পলাতক রাজনৈতিক ও আশ্রয় প্রার্থীদের জন্যে উপনিবেশ স্থাপন করতে ব্যয় করাই ছিল উদ্দেশ্য। চিকাগোতে অধ্যাপক বিনয় সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে যা কথাবার্তা হ'ল

তাতে বুঝলাম যে, তাঁর সঙ্গে বহু গণ্যমান্য জার্মান-এর আলাপ আলোচনা হয়েছে।

চিকাগোতে দেখা হওয়ার অনেক পরে লস-এঞ্জেলস-এ গুপ্তর সঙ্গে আবার দেখা। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই তাঁর এই বিশেষ আগমন। আমাকে দলে ভেড়াবার এই তার শেষ চেষ্টা। তিনি চাইলেন আমাকে দিয়ে এক স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র সই করিয়ে নিতে। ঘোষণপত্রের উদ্দেশ্য ছিল ফ্ল্যাণ্ডার্স-এ যুদ্ধরত ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তোলা। আমি সরাসরি না বলে দিলাম।

শেষবারের মতো তিনি আমাকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে বললেন জার্মান নেতারাও তাঁদের আমেরিকাস্থ কনস্যুলেটকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে যেমন করেই হোক আমাকে দলে টানতে। আমি যা চাইব তাই ওরা করতে রাজী আছেন। এবারও আমি তাদের প্রস্তাব বাতিল করে আগে যা বলেছিলাম তাই—অর্থাৎ ভবিষ্যতের আখের তৈরীর পরামর্শ দিলাম। পারলে টাকা কিছু সরিয়ে রেখে কাজটা আমার ঘাড়েই চাপাবেন সেরকম ইঙ্গিত দিয়ে গুপ্ত বিদায় নিলেন। কিছুদিন পর তিনি বেনামীতে 'তার' ক'রে জানালেন যে কাজটা সম্ভব হ'ল না। আমেরিকা ছেড়ে জাপান যাবার প্রাক্কালে গুপ্তের সঙ্গে শেষ দেখা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রামচন্দ্রই ৩ আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে ওকে বুঝিয়েছে।

লস্ এঞ্জেলস-এ যত হিন্দুর সঙ্গে দেখা হয়েছে—সবাই বিপ্লবী। আমার প্রতি তাদের মনোভাব অনেকটা করুণা-মেশানো-সম্ভ্রম গোছের। আমার অতীত দেশপ্রেম ও দেশসেবাই ওঁদের সম্ভ্রমের কারণ এবং করুণা উদ্রেক করছে আমার বিপ্লব ভীতি; কেন না ওরা বিশ্বাস করতে পারে না আমার বিপ্লব বিরোধী কথার পেছনে কোনরকম মানসিক দায় আছে।

(ক্রমশঃ)

পাদটীকা

১। উত্তর প্রদেশের ব্যবসায়ী। লাজপত রায়ের বন্ধু ও সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক।

২। কলকাতার অধিবাসী। পুরো নাম চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী। ১৯১০ সালে আমেরিকায় যান। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। সানফ্রানসিস্কো বিচারে এক বছরের জেল হয়।

৩। ভূপালের অধিবাসী। ১৯০৭ সালে আমেরিকায় যান। ১৯০৯ সালে জাপানে আসেন। তারপর আবার ১৯১৪ সালে আমেরিকায় যান ও গদর পার্টিতে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে আফগানিস্থানে আসেন।

৪। কলকাতার অধিবাসী। প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক আগেই জার্মানী যান। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বার্লিন কমিটীতে যোগ দেন ও ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯১৯ সালে সিঙ্গাপুরে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। ইংরেজরা তাঁকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়। চিকাগো বিচারে তাঁর জেল হয়।

৫। পেশোয়ারের অধিবাসী। ১৯০৭ সালে জাপান যান। ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে আমেরিকায় পৌঁছান ও গদর পার্টিতে যোগ দেন। হরদয়াল আমেরিকা ছাড়ার পর পার্টির নেতা হন। সানফ্রানসিস্কো বিচারের সময় রাম সিং নামে এক সহকর্মী তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন।

YOUR PRESS IS 25 NOW!

AUTO-PRINT & PUBLICITY HOUSE
49, BALDEOPARA ROAD, (Manicktola)
CALCUTTA-6
TEL : 35-2959

Calcutta Historical Society

PUBLICATIONS

I. **Bengal Past & Present** : bi-annual journal being published since 1907. In addition to articles on aspects of history of modern India and Asia by eminent scholars, it publishes shorter notes, review articles, review of recent publications and documents of interst and importance.

Annual Subscription (Indian) Rs. 20.00
(Foreign) £ 3. 10
$ 8·00

II **H. J. Little—House of Jagat Seth.** With Introduction by Prof. N. K. Sinha : an Indispensible book for teachers and students and for all interested in 18th century Bengal

	Indian	Foreign
Price	Rs. 15.00	20-sh.

III Diamond Jubilee and Jubilee Supplement Numbers of Bengal Past & Present — Priced at 15·00 and Rs. 10 each.

With best compliments of

MAHARAJA COSSIMBAZAR CHINA CLAY MINES P. LTD.

138, CANNING STREET,
CALCUTTA-1

Post Box No 353

Gram Coscolmin Phone 22 4418

With Compliments from

UNIVERSAL EMPORIUM

KHAGOL - PATNA

(LEADING DEPARTMENTAL STORE)

নব পর্যায়

৩য় খণ্ড

৮ম সংখ্যা

ভাদ্র-কার্তিক ১৩৭৭

ইতিহাস

সম্পাদক :

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

নব পর্যায় তৃতীয় খণ্ড ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৫

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

অমলেন্দু দে

শোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩ কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	১৫১
নিষিদ্ধ বই বেলা দত্তগুপ্ত	১৬৭
সিবাস্টিয়ান মানরিকের চোখে বাংলাদেশ সাড়া দত্ত	১৭৪
লালা লাজপত রায়ের আত্মকথা অনুবাদক-কিরণ মৈত্র	১৯০
কর্ণসুবর্ণ সুধীর রঞ্জন দাস	২১১

CALCUTTA UNIVERSITY

ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড | কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৫ | ৩য় সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশ চন্দ্র মজুমদার

(১০)

ঢাকায় গিয়ে আমি ইতিহাস গবেষণা পুনরায় আরম্ভ করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার অল্প কিছুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে আমার প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১৯১৪ সাল)। এই সময় আমি এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলাম এবং এর কিছুদিন পরেই স্যার আশুতোষ আমাকে সোসাইটির কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত করেন। আমার মতো এত অল্প বয়সে কাউন্সিলের সভ্য বড় কেউ হননি। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল ছাড়াও আমি Journal of Indian History, Indian Historical Quarterly, Journal of The Bihar and Orissa Research Societyতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঢাকায় যাওয়ার পূর্বে আমার পি. এইচ. ডির থিসিস Corporate life in ancient India নামে ছাপা হয়।

ঢাকায় যাওয়ার পর হার্টগ সাহেব বললেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে একটি গবেষণা কেন্দ্র হয়ে ওঠে সেজন্য আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে পথপ্রদর্শকরূপে কিছু বই লিখতে হবে। এর ফলে ১৯২৪ সালে Early History of Bengal নামে ছোট একখানি পুস্তিকা আমি প্রকাশ করি।

হার্টগ সাহেব নিজে এর প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন। এর প্রায় কুড়ি বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সম্পাদনায় যে History of Bengal, Vol. I প্রকাশিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিকে তার সূচনা বলা চলে। ১৯২৭ সালে আমার আর একখানি বই—Outline of Ancient Indian History and Civilisation প্রকাশিত হয়। এই বইখানি পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে Ancient India নামে বাহির হয়। এর প্রায় তিন চারটি সংস্করণ হয়ে গেছে এবং এখনও এর চাহিদা আছে।

এই সময় আমার মনে হয় যে, গতানুগতিকভাবে এ রকম গবেষণা না করে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে গবেষণা করা দরকার। অনেক দিন নানা বিষয়ে চিন্তা করে স্থির করি যে প্রাচীন যুগে ভারতের বাইরে ভারতবাসীরা যে সব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লেখা খুবই প্রয়োজন এবং এই বিষয়টিই আমি নির্বাচন করি। একাজে প্রথম বাধা হল যে যে-সব দেশে ভারতীয় উপনিবেশগুলি ছিল, যেমন, মালয়, কাম্বোডিয়া, জাভা, সুমাত্রা—এদের সম্বন্ধে যা কিছু আকর গ্রন্থ সবগুলিই ফরাসী অথবা ডাচ ভাষায় লেখা। সুতরাং এই দুটি ভাষাই আমি শিখতে আরম্ভ করি। ঢাকায় এ ভাষা শেখাবার কোন লোক ছিলেন না। এই দুটি ভাষার ব্যাকরণ ও সহজ সহজ কয়েকটি বই কিনে আমি ভাষা শিখতে সুরু করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমি ছোট ছোট কয়েকটি বই সংগ্রহ করি যার বাঁ দিকের প্রতি পৃষ্ঠায় ফরাসী অথবা ডাচ এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ ছিল। এই রকম কয়েকটি বই পড়ে এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে আমি সরাসরি ফরাসী ও ডাচ পড়তে আরম্ভ করি। প্রায় দু'বছরের চেষ্টায় এই ভাষায় বই পড়তে পারতাম ; কিন্তু উচ্চারণ না জানায় কথা বলতে পারতাম না। কলকাতাতেও এ সময় এই ভাষার বই বা পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য ছিল। এ সকল বাধা সত্ত্বেও আমি 'চম্পা' নামে (বর্তমান ভিয়েটনাম রাজ্য) হিন্দু উপনিবেশের প্রথম খণ্ড লিখতে আরম্ভ করি এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে

এটি প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ভাগে ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, শিল্পকলা প্রভৃতির আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে যেসব সংস্কৃত লিপি পাওয়া গেছে সেগুলি ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করি। তখন এদেশে এসব বইএর কোন আদর ছিল না। লাহোরের মতিলাল বেনারসী দাস এই বই প্রকাশ করার ভার নেন। দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁর দোকান পুড়ে যায়। এই সঙ্গে চম্পা বইটির সমস্ত কপি নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে বহু বৎসর যাবৎ 'চম্পা' আর বাজারে পাওয়া যায় না।

এর পর আমার মনে হল এ বিষয়ে আরও ভালকরে পড়াশোনা করা দরকার ; কিন্তু তার জন্য ভারতের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। হার্টগ সাহেবকে আমার সঙ্কল্পের কথা বলায় তিনি আমাকে প্রথমে ইউরোপে যাওয়ার উপদেশ দিলেন। আমি বললাম যে, জীবনে আর হয়তো দ্বিতীয়বার যাওয়া হবে না ; সুতরাং ইউরোপ ঘুরে আমি একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাব এবং সেখান থেকে দেশে ফিরব। তিনি আমাকে পুরো বেতনে দশ মাসের ছুটি মঞ্জুর করলেন এবং এই বিষয়ে বিদেশ থেকে বই কেনবার জন্য লাইব্রেরী ফণ্ড থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দিলেন।

(১১)

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে আমি বিলাত যাত্রা করি। প্রথমে কয়েক মাস লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশোনা করি। সেখান থেকে হল্যাণ্ড যাই। কেননা জাভা সম্বন্ধে সমস্ত বই ও পত্রিকা সেখানে আছে এবং জাভার পুরাতন জিনিসগুলির একটি বড় মিউজিয়ামও আছে সেখানে। ভারতবর্ষে পুরাতত্ত্ববিভাগে ভোগেল (Vogel) নামে একজন সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন। সম্ভবতঃ (আমার ঠিক মনে নেই) তিনি কিছুদিনের জন্য ডিরেক্টর জেনারেলও হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ ছিল। তিনি তখন অবসর গ্রহণ করে লাইডেনে (Leiden)

ছিলেন। লাইডেনের কার্ণ ইনস্টিটিউট (Kern Institute) একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এখানেই যে-সব জিনিস আমার জানা দরকার তার অনেক উপকরণ আছে। ভোগেলকে চিঠি লিখে আমার ইচ্ছা জানালে তিনি সাদরে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন এবং লাইডেনে একটি ডাচ পরিবারে আমার থাকার ব্যবস্থাও করেদিলেন। এতে আমার ডাচ শেখারও বেশ সুবিধা হল।

কয়েক মাস আমি লাইডেনে ছিলাম। একজন যুবক তখন সেখানে গবেষণা করতেন; তার নাম C. L. Fabri। তখন তিনি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেছেন এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও সামান্য আলোচনা করতেন। এক-দিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, গম ধাতুর অতীতকাল গগাম না হয়ে জগাম হয় কেন? পরবর্তীকালে তিনি ভারতে এসে খুবই নাম করে-ছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার মনে তখন সন্দেহ ছিল এবং এখনও আছে। পণ্ডিত নেহরুর কৃপায় দিল্লীতে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সে-সময় বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে শুনেছি।

কার্ণ ইনস্টিটিউট থেকে আমি আমার গবেষণার বিষয়ে অনেক নোট করি। সেখান থেকে লণ্ডনে এসে কিছুদিন থেকে আমি প্যারিসে যাই। প্যারিসে একটি বড় লাইব্রেরী আছে। দু'একদিন সেখানে গিয়েই ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ফরাসীদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মধ্যে প্রভেদ বেশ বুঝতে পারলাম এবং এই দুই জাতির চরিত্র সম্বন্ধেও এর থেকে কিছু পরিচয় পেলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমি একটি ছোট এ্যাটাচি কেস নিয়ে যেতাম। তার মধ্যে আমার খাতাপত্র ও অভিধান থাকত। কিন্তু আমার আসা বা যাওয়ার সময় কেউ তা খুলে দেখত না। প্যারিসের লাইব্রেরীতে ঢোকা এবং ফেরার সময় কেস খুলে কি আছে না আছে সব পরীক্ষা করা হত। এ দেখে আমার মনে হল লণ্ডনের লোকেরা সাধারণতঃ সৎ এবং বই চুরি করে না। কেবল প্যারিসের কথা বলি কেন; আমি নিশ্চিত জানি আমাদের দেশে লণ্ডনের মত ব্যবস্থা থাকলে লাইবেব্রীর বহু বইই অদৃশ্য হয়ে যেত। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের

লাইব্রেরীর অবস্থা দেখেছি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কথা শুনেছি। বহু কড়াকড়ি করা সত্ত্বেও প্রতি বছর অনেক বই চুরি যায়। বইএর মাঝের অংশ ছুরি বা সূক্ষ্ম ব্লেড দিয়ে বেমালুম কেটে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যে বিনা পরীক্ষায় এ্যাটাচি কেস নিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাতে বোঝা যায় যে সে দেশে এভাবে বই চুরি যায় না।

এর আর একটি প্রমাণ পেয়েছিলাম অক্সফোর্ডে। সেখানে এক কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি যে ছাত্রেরা নিজেরাই বই নিয়ে যাচ্ছে; কেবল একটি খাতায় নিজের নাম ও বইএর নাম লিখে রাখছে। কে কি বই নিল বা রাখল তা দেখবার জন্য কোন কর্মচারী নেই। আমার তখনই মনে হল ঢাকায় এ রকম ব্যবস্থা থাকলে বছরে অন্ততঃ হাজার দু'হাজার বই যে চুরি যেত তাতে কোন সন্দেহই নেই। এর আর একটি দিকের কথাও মনে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য মোট ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এর একটা প্রধান অংশ (আমার ঠিক মনে নেই; অন্ততঃ দশ পনর হাজার টাকা) দারোয়ান, বেয়ারা এবং কর্মচারী নিয়োগ করে বই চুরি বন্ধ করার জন্যই ব্যয় হত। এই টাকাটা যদি বই কেনার জন্য খরচ হত তাহলে লাইব্রেরীতে অনেক নতুন বই আসত। আমাদের দেশে শিক্ষিত জনের মধ্যেও এই ধরণের নীতি জ্ঞানের বড়ই অভাব।

লণ্ডনে এর আর একটি দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম; তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। একবার লণ্ডন টাওয়ার দেখতে যাওয়ার সময় পা পিছলে পড়ে যাই। ফলে আমার ডান হাতটি কাঁধের কাছে মচকে যায়। সেটি সারানর জন্য হাসপাতালে যেতে হয়। যে হোটেলে ছিলাম সেখানে আরও কয়েকজন ভারতীয় মেডিক্যাল ছাত্র ছিল। তারা উপদেশ দিল—"দেখুন এই হাসপাতালের কোন বাঁধাধরা ফি নেই। যার যেমন আয় সেই অনুপাতে এরা ফি দাবী করে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে দেশে কত মাইনে পান। আপনি তার অর্ধেক বলবেন।" হাসপাতালের ব্যবস্থাটি এমন যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল যে তাদের এই পরামর্শ আমার কাছে আদৌ সমীচীন মনে হয়নি। আমাকে মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করতে ঠিক ঠিকই উত্তর দিলাম যে, একহাজার টাকা মাইনে পাই; এছাড়া প্রোভোস্টের আড়াইশ' টাকা ভাতা আছে।

হিসেব করে ওরা বলল কি বাবদ আমাকে ছ' শিলিং দিতে হবে। তখনকার ছ'শিলিংএর মূল্য ছিল দেড় টাকা বা তার কিছু বেশী। এর জন্য মিথ্যা বলা যে কতদূর অসঙ্গত তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ যখন ভেবে দেখি যে, এই ব্যবস্থায় প্রকৃত গরীব লোকের কত সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ডাক্তারী ছাত্রদেরও এ বিষয়ে নীতির কোন বালাই ছিল না।

প্যারিসের কথায় আবার ফিরে আসি। সেখানে আমার পুরাতন বন্ধু মহম্মদ শহীদুল্লার সঙ্গে দেখা হল। তিনি অনেক দিন প্যারিসে ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন। বিদেশে গিয়েও কয়েকটি ভারতীয় প্রথা তিনি মেনে চলতেন। প্রথমতঃ দেখতাম যে, তিনি সর্বদাই একটি বদনা সঙ্গে নিয়ে যেতেন। প্যারিসের বাইরে যেতে হলেও বদনাটি নিতেন। দ্বিতীয়তঃ, মুরগীকে জবাই করা হত না বলে তিনি তার মাংস খেতেন না। শহীদুল্লা খুব অমায়িক এবং সাদাসিধা ধরনের মানুষ। ওদেশী ছাত্রেরা তাঁকে খুব পছন্দ করতেন।

পরে বহুবার আমি প্যারিস গেছি এবং এর কাছাকাছি অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। এই স্মৃতি কথায় তার উল্লেখ করতে চাই না। সময় এবং সুযোগ হলে ভ্রমণ কাহিনী লেখবার ইচ্ছা আছে; তখন এগুলি লিপিবদ্ধ করব। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভার্সাই এবং নেপলিয়নের স্মৃতি বিজড়িত অনেক স্থান আমি দেখেছি। লুভ্‌রের বিখ্যাত মিউজিয়াম এবং Place de la' concorde-এর কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

(১২)

প্যারিস থেকে ইটালি, জার্মানী, বেলজিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ঘুরে হল্যাণ্ডে আসি এবং সেখান থেকে জাহাজে যবদ্বীপে পৌঁছই। যবদ্বীপ খুব ছোট জায়গা। দেখতে ঠিক বাংলা দেশের মতো—সুজলা, সুফলা,

শস্যশ্যামলা। এখানকার বিখ্যাত বরবদুর স্তূপ, শৈব লারা জোংরং মন্দির এবং আরও অনেক মন্দির দেখলে এখনও প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যবদ্বীপ থেকে বলিদ্বীপে যাই। এখানে এখনও হিন্দুধর্ম প্রচলিত আছে (অন্ততঃ সে সময়ে ছিল)। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে গিয়ে দেখেছি নৈবেদ্যের থালা মাথায় করে মেয়েরা মন্দিরে আসছে; ধূপ-ধুনা জেলে পুরোহিত আরতি করছেন। ভারতবর্ষ থেকে আসছি শুনে পুরোহিত (পদন্ত) আমাকে খুব আপ্যায়ন করলেন। কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকও তিনি আওড়ালেন। মন্ত্রগুলি সুপরিচিত; তবে তাঁর উচ্চারণ পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরণের। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র বলিদ্বীপেই হিন্দুধর্ম প্রচলিত আছে দেখে আমি খুব মুগ্ধ হই। অন্য সব জায়গাতে হিন্দুধর্মের নিদর্শন আছে বটে কিন্তু বর্তমানে সেখানে হিন্দুধর্মের কোন প্রতিষ্ঠা নেই।

জাভায় ফিরে এসে প্রথমে আনামে যাই। এইখানেই ছিল প্রাচীন হিন্দু চম্পারাজ্য। আনামের অধিবাসীরা হিন্দুদের পরাজিত করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দেশ অধিকার করে। তখন এর নাম হয় আনাম। বর্তমান কালে এই দেশের উত্তর অংশ ভিয়েৎকং এবং দক্ষিণ অংশ ভিয়েৎনাম বলে পরিচিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রায়শই মুসলমান হয়ে গেছে। কয়েক হাজার হিন্দু অবশ্য এখনও আছে।

একদিন এক দুর্গমস্থানে রিক্সা করে মন্দির দেখতে চলেছি। পথে আর একটি রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমার রিক্সাটি উল্টে যায়। আমি গাড়ীর নীচে পড়ে যাই। দুই রিক্সাওয়ালা তখন ঝগড়ায় মত্ত; আমাকে উদ্ধার করার কথা কারুর মনে হয়নি। অল্প দূরে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল; সে আমাকে এসে তুলল এবং জল এনে ময়লা ধুয়ে দিল। আমি যে বিদেশী—এ বুঝতে পেরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'দেশ কোথায়?' বললাম, 'ভারতবর্ষ'। শুনেই মাথায় হাত ঠেকিয়ে যে বলল, La Patrie de Gandhi—অর্থাৎ গান্ধীর দেশ। ওদেশে তখন ফরাসীদের আধিপত্য থাকায় শিক্ষিত লোকেরা ফরাসী বলত।

আনাম থেকে আমি পার্শ্ববর্তী রাজ্য কাম্বোডিয়ায় যাই। প্রাচীন যুগে আঙ্কোরথোম ছিল প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজাদের রাজধানী। এর পাশে অনেক বড়

বড় শহর ও মন্দির তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল আঙ্কোরভাট (মন্দির) এবং বেয়নের মন্দির। প্রায় দশ পনর মাইল জুড়ে বিশাল বিশাল মন্দির ও প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে স্থানটি জনহীন প্রান্তর। অধিকাংশ মন্দির জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ফরাসী সরকার সেখানে একটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করেছেন। এর এক অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন এই সব মন্দিরে ঘোরাফেরা করা খুব বিপজ্জনক; কারণ জঙ্গলে খুব সাপ আছে। তিনি যে রবারের বুট পরেছেন দেখালেন—তা দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। ফরাসী সরকার অনেকগুলি মন্দির খুব ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এই সব মন্দির ও শহরের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার কয়েকখানি বইএ সেকথা লিখেছি। বড় বই ছাড়া Hindu Colonies in the Far East নামে ছোট একটি গ্রন্থে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এদের মোটামুটি বিবরণ জানতে পারবেন।

কাম্বোডিয়া থেকে মোটরে করে আমি শ্যামদেশে আসি। শ্যামদেশের বর্ত্তমান নাম থাইল্যাণ্ড। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা; পৌঁছতে তিনদিন লাগল। সকালে বেরিয়ে খাবার পাওয়া যায় এমন জায়গায় দুপুরে গাড়ী থামত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার যাত্রা এবং সন্ধ্যায় খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা আছে এমন কোন জায়গায় আশ্রয় নেওয়া। এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম অরণ্য প্রাথাৎ—সংস্কৃত অরণ্য প্রদেশের অপভ্রংশ। বিস্তীর্ণ এই অরণ্যভূমি কাম্বোজ ও শ্যামদেশ—এই দুটি দেশকে পৃথক করে রেখেছে। এ সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। বহুদিন শ্যাম কাম্বোজের অধীন ছিল। সে সময় কাম্বোজ সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর থেকে চীন সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কাম্বোডিয়া থেকে মলয় উপদ্বীপ হয়ে আমি সিঙ্গাপুরে আসি। সিঙ্গাপুরে একটি প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ছিল। যবদ্বীপ থেকে পলাতক একজন হিন্দু রাজা এই নগরী জয় করে এর নাম রাখেন সিংহপুর। বর্তমানে হিন্দু নিদর্শন এখানে কিছু নাই। তবে এটি একটি খুব বড় শহর এবং এখানে নানা জাতীয় লোকের বাস। সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজে রেঙ্গুনে আসি। কয়েকদিন সেখানেও কাছাকাছি কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখে জাহাজে ভারতে

ফিরে আসি। এপ্রিল মাসের শেষে আমি বিলাত যাত্রা করেছিলাম। প্রায় ন'মাস পরে ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরে এলাম।

(১৩)

দেশে ফিরে এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস আবার লিখতে আরম্ভ করলাম। প্রথমে দুই খণ্ডে সুবর্ণদ্বীপ নামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং মলয় উপদ্বীপের ইতিহাস লিখি। ইচ্ছা ছিল আরও দুই খণ্ডে কাম্বোজ দেশ ও ব্রহ্মদেশের ইতিহাস লিখব। কিন্তু পরে নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় এই দু'খণ্ড আর লিখে উঠতে পারিনি। তবে কাম্বোজ দেশের ইতিহাস আমি সংক্ষেপে লিখেছি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে স্যার উইলিয়াম মেয়ার বক্তা নিযুক্ত করেন। সেই সুযোগে কাম্বোজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে আমি কয়েকটি বক্তৃতা দিই (১৯৪৩ খ্রী:)। এগুলি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাম্বোজ দেশ নামে প্রকাশিত হয়। এর পর বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে "মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় হমোরেরিয়াম বক্তৃতামালা" দিতে আহ্বান করেন। সেই উপলক্ষ্যে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেগুলি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় Greater India নামে প্রকাশ করে। এছাড়া আমি Hindu Colonies in the Far East নামে ছোট একটি বইএ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস লিখি। এর মধ্যে ব্রহ্মদেশের ইতিহাসও আছে। সুতরাং এক হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দুরাজ্যের ইতিহাস লিখেছি বলা চলে। তবে কাম্বোজ ও ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে যে বিস্তারিত ইতিহাস লেখবার বাসনা ছিল তা আর কার্যত হয়ে ওঠেনি; যদিও এর সম্বন্ধে বহু উপকরণ অবশ্য আমি সংগ্রহ করেছিলাম। যেসব কারণে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করতে পারিনি এইবার তার উল্লেখ করব।

(১৪)

১৯২৯ সনের প্রথমে ঢাকায় ফিরে এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের দ্বিতীয় খণ্ড (সুবর্ণদ্বীপ) লিখতে আরম্ভ করি। এই বিষয়ে লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য হার্টগ সাহেব যে টাকা দিয়েছিলেন তা পূর্বেই বলেছি। এই টাকা দিয়ে আমি প্যারিসে অনেক বই কিনেছিলাম এবং আমার ফিরে আসার অল্প দিন পরেই সে বইগুলি এসে পৌছয়। আমিও এই বইগুলির সাহায্য নিয়ে সুবর্ণদ্বীপ লিখতে আরম্ভ করলাম। বইটি শেষ করতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল। আমার ইচ্ছা ছিল এই বিষয়টির গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি কেন্দ্র গড়ে তুলব। কেননা যে-সব বই আমি বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম তা এদেশে খুবই দুর্লভ। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে, এর প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর পরে যখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এই বিষয়টির পঠন পাঠন আরম্ভ করি তখন বই-এর অভাব খুবই অনুভব করেছিলাম। তখন দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐবিষয়ে আর কোন চর্চা হত না। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মর্মে একটি চিঠি লিখলাম যে, ঐ বই কিনতে যা খরচ হয়েছিল আমরা তার দ্বিগুণ দাম দিতে প্রস্তুত আছি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন সেগুলি বিক্রি করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাতে রাজি হন নি। ফলে এখনও সে বইগুলি ঢাকাতেই আছে; কিন্তু সেখানে এগুলির বিশেষ কোন ব্যবহার হচ্ছে বলে মনে হয় না।

ঢাকায় যে গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছিলাম সেটিও কার্যে পরিণত করতে পারিনি। কারণ এ বিষয়ে গবেষণার জন্য মাত্র একজন ছাত্র রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে আমার কাছে কাজ আরম্ভ করেছিল। সে-ও কিছুদিন পরে অন্য চাকরি পেয়ে ঢাকা থেকে চলে যায়। তবে সে এখনও এ বিষয়ে চর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং কয়েকটি বইও লিখেছে। তার নাম হিমাংশুভূষণ সরকার—এখন খড়্গপুর কলেজের অধ্যক্ষ। আর কোন ছাত্র এ বিষয়ে গবেষণার জন্য আগ্রহী না হওয়ার কারণ যে এর জন্য প্রথমেই ফরাসী ও ডাচ ভাষা শেখা দরকার এবং একারণেই অনেকে

পিছিয়ে যেত। সুতরাং আমার মনে হল যে, এ কাজটি প্রায় আমার ব্যক্তিগত হয়েই দাঁড়িয়েছে এবং এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য অন্য কয়েকটি বিষয় স্থির করা প্রয়োজন। এই সূত্রে বাংলার ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা আমার মনে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

(১৫)

আমি যে এর অনেক দিন পূর্বে একখানি বাংলার প্রাচীন ইতিহাস লিখেছিলাম সেকথা পূর্বেই লিখেছি। এখন কিন্তু কয়েকটি কারণে একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। এর মধ্যে দুটি কারণ আপাততঃ উল্লেখ করছি। প্রথমটি হল—সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত নামে একখানি গ্রন্থের পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে এনেছিলেন। এই গ্রন্থখানি ছোট হলেও এর মধ্যে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ আছে—যা এর পূর্বে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু বইখানি কবিতায় লেখা এবং প্রত্যেক শ্লোকের দুই রকম অর্থ হয়। এক রকম অর্থ ধরলে রামায়ণের রামচন্দ্রের কাহিনী; আর এক অর্থে পাল বংশীয় রাজা রামপালের কাহিনী। রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা উদ্ধার এবং রামপাল কর্তৃক পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার—এই দুটি ঘটনা অবলম্বন করেই এই দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকগুলি রচিত হয়েছে।

পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কি ভাবে সামন্ত চক্রের বিদ্রোহের ফলে নিহত হন ও তাঁহার ভ্রাতা রামপাল পিতৃরাজ্য বরেন্দ্র ভূমি থেকে বিতাড়িত হন এবং আবার অনেক সামন্তের সহায়তায় তা পুনরুদ্ধার করেন—এই ঘটনাটি নিয়েই রামচরিত লেখা হয়েছে। শ্লোকের মধ্যে এই বিদ্রোহ ও পুনরুদ্ধারের কথা অস্পষ্টভাবে—অনেকটা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের একখানি টীকায় সেটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় মূল কাব্যখানি পুরোপুরি পাওয়া গেলেও ঐ টীকার এক অংশ মাত্র শাস্ত্রী মশায় নেপালে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই অংশটুকুর মধ্যেও তিনি

এমন অনেক অর্থ বার করেন যা আদৌ মূল গ্রন্থ থেকে অনুমান করা যায় না। তিনি এই বইএর ভূমিকায় লেখেন যে রাজা মহীপাল খুব অত্যাচারী হওয়ায় বরেন্দ্রর জনগণ তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে কৈবর্ত জাতীয় দিব্য বা দিব্যোক নামে একজনকে রাজা নির্বাচিত করে। স্বদেশী যুগে এই বই নিয়ে খুব আন্দোলন চলতে থাকে। এবং দিব্য একজন মহাপুরুষে পরিণত হন। এমন কি প্রতি বৎসর দিব্যস্মৃতি উৎসব নামে একটি অনুষ্ঠান হত। সেখানে এই দেশপ্রেমিক দিব্যের নামে শ্রদ্ধাঞ্জলিও অর্পণ করা হত। শ্রদ্ধাস্পদ যদুনাথ সরকার এবং উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। কিন্তু রামচরিত পুঁথিতে এর কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

বাংলার ইতিহাসের এই অপব্যাখ্যা এবং জনগণের মনের ভ্রান্তধারণা দূর করতে হলে রামচরিতের একটি নূতন সংস্করণ সর্বাগ্রে প্রকাশ করা দরকার মনে করে আমি সেই কাজে হাত দিই। তখন ঢাকায় পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু দিন যাবৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহকারী ছিলেন এবং রামচরিত গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। তিনি আমাকেও সাহায্য করতে রাজী হলেন। আমি মূল গ্রন্থখানি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ঢাকায় নিয়ে এলাম এবং পণ্ডিত ননীগোপালের সঙ্গে একত্রে বসে পুনরায় এই গ্রন্থ পাঠ করলাম। ফলে অনেক নূতন তথ্য বেরল। একটি দৃষ্টান্ত দিই। এই গ্রন্থের টীকায় ছিল যে রামপাল কৈবর্তরাজকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী ধ্বংস করেন। মূল শব্দ কয়েকটি শাস্ত্রী মশায় পাঠ করেছিলেন 'ডমরমুপ-পুরমসাবীৎ' এবং এর অর্থ করেছিলেন যে কৈবর্তরাজের রাজধানী ডমর নামক নগরী রামপাল ধ্বংস করেন। আমি যখন এই জায়গাটি পাঠ করি তখন দেখি যে, শব্দ কয়েকটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে—'ডমরমুপপ্লবমলাবীৎ' অর্থাৎ, ডমর বা বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। সুতরাং এখানে রাজধানী ডমরপুরের কোন কথাই নেই। অথচ শাস্ত্রীমশায়ের বই প্রকাশিত হবার পর কিছুদিনের মধ্যে মালদহ জেলায় ডমরপুর আবিষ্কৃত হয়ে গেল। পণ্ডিত ননীগোপালও স্বীকার করলেন যে শাস্ত্রীমশায়ের পাঠে কিছু ভুল ছিল।

এই রকম ভুল দেখে আমি তাড়াতাড়ি এই বইটির একটি নূতন সংস্করণ করতে ব্যস্ত হলাম। যখন আমাদের কাজটি অনেকদূর এগিয়েছে তখন খবর পেলাম যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকও রামচরিতের একটি নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করছেন। রাধাগোবিন্দবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি তাঁকে 'ডনরন' দেখলাম এবং তিনিও আমার পাঠ স্বীকার করলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম যে, দুটি আলাদা সংস্করণ না করে যদি তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তাহলে আমরা তিনজনে একটি বই বার করতে পারি। বিশেষতঃ আমি অনেক কষ্টে পুঁথিখানি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মত করিয়ে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলাম। রাধাগোবিন্দবাবুর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনিও এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি বলল যে, এই বইটি তাদের সমিতি থেকেই প্রকাশ করা হবে। আমি অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করব বলেই এ কাজে হাত দিই। অযথা দুটি সংস্করণে শক্তি ও সময় ক্ষেপ না করে তিনজনে মিলে করলে কাজটি অনেক সহজে হবে—এই ভেবে এই প্রস্তাবে আমি সম্মত হই।

এর কিছুদিন পরে রাধাগোবিন্দবাবু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হয়ে চলে গেলেন। সুতরাং বই বার করতে অনেক দেরী হল। কারণ যে অংশের টীকা ছিল না সেই অংশের প্রায় প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে রাধাগোবিন্দবাবুর সঙ্গে ননীবাবুর মতভেদ হতে লাগল। যাই হোক প্রায় সাত বছর পরিশ্রমের পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মূলগ্রন্থ পড়ে শাস্ত্রীমশায়ের পাঠের আমরা তিনজনে মিলে যে ভুল মনে করলাম সেগুলি এই সংস্করণে দেখান হয়েছে। আর যে অংশের টীকা ছিল না সে অংশের টীকাও যোগ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠা ইংরেজী ভূমিকা আমার লেখা। তাতে আমি শাস্ত্রীমশায়ের বিভিন্ন মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমার মনে হয় এই কারণেই এর পরে দিব্য স্মৃতি উৎসব বন্ধ হয়ে যায়।

ঠিক এইরূপ আর একটি ব্যাপার ঘটল। বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার প্যারিসে বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী নামে একটি

পুঁথির সন্ধান পান এবং তার বিবরণ প্রকাশ করেন। এতে জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলা জয়ের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় লেখা আছে। যশোহরের প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল সৈন্যবাহিনী যিনি পরিচালনা করেন, এতে সেই অভিযানের পুরো বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় যে, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের শৌর্য ও বীরত্ব সম্বন্ধে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে তার বাস্তবিকই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এ সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের "A History of Mughal North East Frontier Policy" বইটি লেখার জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্যারিসের পুঁথিখানি রটোগ্রাফ করে নিয়ে আসি এবং কিছুদিন পরে ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক এই গ্রন্থের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এতে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায়।

এই সব কারণে বাংলা দেশের একখানি সর্বাঙ্গীন ইতিহাস লেখার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার সুযোগ পাই। যতদূর জানি ভারতের আর কোন প্রদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস এর পূর্বে পৃথক ভাবে লেখা হয়নি। কিন্তু এই বাংলার ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথা বলা প্রয়োজন। ১৯১২ সালে বাংলা দেশের প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে একখানি বাংলার ইতিহাস লেখবার জন্য প্রস্তাব করেন এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এর জন্য একটি পরিকল্পনা করতে বলেন। কলকাতার লাটভবনে এ সম্বন্ধে কয়েকটি সভার অধিবেশনও হয়; কিন্তু কি কারণে জানি না এ সম্বন্ধে কোন কাজই হয়নি।

কয়েক বৎসর পরে কলকাতার রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন যে যদি তিনি এই রকম কোন গ্রন্থ রচনা করতে পারেন তাহলে সেই গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। রাখালবাবুকে তিনি অনুরোধ করেন আর কয়েকজন ঐতিহাসিক মিলে একটি পরিকল্পনা করে যেন সেটি তাঁকে দেন। কিন্তু এ চেষ্টাও বিফল হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা কয়েকজন এই প্রস্তাবটি পুনরুজ্জীবিত করি। তখন ইতিহাসের এম. এ. পরীক্ষা উপলক্ষ্যে আমরা মাঝে মাঝে আচার্য যদুনাথকে ঢাকায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতাম। এই উপলক্ষ্যে ১৯৩৩ সালে তাঁকে এই প্রস্তাবের কথা বলি এবং তিনিও এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গেও তিনি এরূপ একখানি ইতিহাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যদি প্রয়োজন হয় তিনি এই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আমার সহযোগী ছিলেন ফজলুর রহমান। তিনি অক্সফোর্ডের স্নাতক। ঢাকায় ইতিহাস বিভাগে তিনি রীডারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মুসলিম হলের প্রোভোস্টও ছিলেন। ১৯৩৯ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বেই আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁর প্রথম কনভোকেশন বক্তৃতাতেও তিনি এই বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব দেন। তাঁর অনুরোধে আমি প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ লেখার কাজ আপততঃ বন্ধ করে বাংলার ইতিহাস লেখার কাজে বেশী সময় দেব আশ্বাস দিলাম। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই সময় কালিকারঞ্জন কানুনগো ছিলেন ইতিহাস বিভাগের একজন রীডার। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথা পূর্বেই বলেছি। নলিনীকান্ত ভট্টশালী নামে আর একজন ঐতিহাসিক ঢাকায় যাদুঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি এঁদের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে একটি পরিকল্পনা তৈরী করি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেটি গ্রহণ করে। আমার পরিকল্পনা ছিল তিন খণ্ডে এই ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ড হিন্দু যুগ, দ্বিতীয় খণ্ড মুঘল যুগের পূর্ব পর্যন্ত (১২০০-১৫৭৬) এবং তৃতীয় খণ্ড মুঘল যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭)। আমি প্রথম খণ্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হই এবং স্থির হয় যে আচার্য যদুনাথ সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনা করবেন। এই কাজের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় আমি তার

সভাপতি ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে ব্যয় বহনের আশ্বাস দিলেও একাজের জন্য চাঁদা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এক হাজার টাকা এবং বাংলা সরকার এক হাজার টাকা চাঁদা মঞ্জুর করেন। এই ভাবে বাংলার ইতিহাস লেখা সুরু হয়।

(ক্রমশঃ)

নিষিদ্ধ বই

বেলা দত্তগুপ্ত

'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম' কিংবা 'লো-লি-তা' নিয়ে সাহিত্যের দরবার ছেড়ে একেবারে ওল্ড বেইলী ও সুপ্রীম কোর্টের খাস দরবারে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু অবাধ সঞ্চরণের 'সবুজ আলো' পেয়েছে তারা। আপত্তিকর, জনমনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী মালমসলা থাকা সত্ত্বেও বহু বই নিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে সমাজে 'ইউ' মার্কা নিয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করে। তা করুক, সেটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নয় এবং কোন বাগবিতণ্ডামূলক সওয়াল জবাবের ভিতর যেতেই আমি অত্যন্ত নারাজ। আমি যে নিষিদ্ধ বই-এর কথা বলতে চাইছি তারা জাতে নৈকষ্য কুলীন—রাজদ্রোহাত্মক, 'এ' ক্লাস। কিন্তু একবার নিষিদ্ধকরা এই সব বই আর কোনদিনই আলোর মুখ দেখল না—সেটাই আমার পরম বিস্ময়। দেশ স্বাধীন হয়েছে; দেশে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং আরো হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব গোলাবারুদ ইত্যাদির বিবরণী দিয়ে লেখা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না বলেই আমার ধারণা। রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে সর্বদেশে সর্বকালে স্বাধীনতাধর্মী কবিতা, প্রবন্ধ, গান, গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তেজনামূলক প্রবন্ধও রচিত হয়েছে। চার্টিষ্ট আন্দোলনের সমসাময়িক কবিতাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যে অনেকখানি সে-কথা কে অস্বীকার করবে আজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩-৪৪ সালে, অবরুদ্ধ ফ্রান্সে 'এদিসিঁয় দ্য মিনুই'-এর মাধ্যমে 'লে কাইএ দ্য সিলঁস্' শিরোনামায় কয়েকটি যুগান্তকারী বই প্রকাশিত হয়; তার মধ্যে ভেরকরের সিলঁস্ দ্য লা মার, ('সমুদ্রের মৌন' নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে,এর দ্বিতীয় অনুবাদ ৺নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের) ও 'মার্স দ্য লেটিওল'। সে সময়, 'ফোরেজ' এই কলমী নামে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক লেখেন 'ল্যা কাইয়ে নোয়ার', 'আর্গন' ছদ্মনামে জাক দেবু ব্রিদেল লেখেন 'আঙ্গল্‌টের' আর 'মিজের ভোয়া'

নাম নিয়ে লেখেন ক্লোদ আভেলিন, 'ল্য তাঁ মর্ত'। প্রকাশ্যে এই সব বই ব্যবহারের সুযোগ ছিল না অথচ সুড়ঙ্গ পথে কত মানুষের কাছে পৌঁছেচে এসব বই, উদ্বুদ্ধ করেছে, সংগ্রামী করেছে তাদের। ফ্রান্সের স্বাধীনতা ফিরে আসার পরই সেখানকার মানুষ ফিরে পেয়েছে এসব বই। কিন্তু আমাদের দেশে ?

আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল কোনমতেই যেন সেই স্বাধীনতার আগুন অগণন মানুষকে না ছোঁয়। অন্যান্য অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস 'হত্যা' করার অত্যাচারটি ছিল। নজরুলের কবিতা, কবিতা সংকলন, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আরও অজস্র পুস্তিকা, দৈনিক, সাপ্তাহিক বাজেয়াপ্ত করা হয়। গান্ধীজির লেখা বইও বাদ যায়নি।

আজ দেশ স্বাধীন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্কে নানা ধরনের বই চোখে পড়ছে। গবেষণাপূর্ণ বইও লিখছেন ঐতিহাসিক মহল। এক্ষেত্রে, বিদ্যোৎসাহী, গবেষক এবং সমগ্র জনসাধারণের দাবী হওয়া উচিত যে ঐ সমস্ত বই রাহুমুক্ত করা। নজরুলের ও শরৎচন্দ্রের বই সম্বন্ধে বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে জানি। গান্ধীজির বইটির ভাগ্য আমার জানা নেই। ইতিমধ্যে যদি সেটি 'নির্দোষ' সার্টিফিকেট না পেয়ে থাকে তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত চেষ্টা করা উচিত যাতে বইটি উদ্ধার পায়। এ ছাড়া ১৮৯৮ সালের ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের ৯৯এ ধারা ও ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা অনুযায়ী ১৯৩০-৩৩ সনের সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলনের সময় একমাত্র বাংলা দেশেই যে শতাধিক বই ও পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয় সে সম্বন্ধে আর কোন খোঁজ করেননি সরকার স্বাধীনতা-উত্তর যুগে। বইগুলির রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই। তাছাড়া বইগুলি ফিরে পেলে আমরা এটাও দেখতে পারি সত্যি সত্যিই কতটা রাজদ্রোহাত্মক মাল মশলা তাতে ছিল, না জঙ্গী শিরোনামা দেখলেই 'ক এ কৃষ্ণ' দেখার মত মনোভাব হয়ে উঠত ব্রিটিশ-কংসের। বইগুলি হাতে এলে আরোও জানা যাবে যে 'এদিসঁয় দ্য মিনুই'র মত আমাদের দেশেও কত

গোপন ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। 'সমুদ্রের মৌন' হয়ত লেখা বা ছাপা হয়নি কিন্তু দেশকে ভালবাসার এক অপার সমুদ্র যুগপৎ মৌন ও মুখর হয়েছে এদেশে—সে কথা বিস্মৃত হওয়াও পাপ। তাছাড়া, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কত বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল তারও একটি আভাস পাওয়া যাবে এই নিষিদ্ধ বই-এর রাজ্যে প্রবেশ করলে। বিভিন্ন সংগঠনের অবদান কোনমতেই অ-গণ্য নয়।

নিষিদ্ধ বই-এর তালিকা :—

১। "রাজদ্রোহ"—জনৈক বিপ্লবী (১লা জুলাই ১৯৩০)

২। "দেশী সৈনিক ও পুলিশ কো নিয়ে যে কাংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি"—(হিন্দি) প্রফুল্ল সেন (৩রা জুলাই ১৯৩০)

৩। "বাংলার ছাত্রসমাজের প্রতি"—বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (সেক্রেটারী সাউথ ক্যালকাটা ষ্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন) ১০ই জুলাই ১৯৩০

৪। To The Warring People of India—Type-written Manifesto ১৫ই জুলাই ১৯৩০

৫। "বাংলার ছাত্ররা তোমাদের জেলের ভাই বোনদের মনে রেখো"—(পুস্তিকা) ২২শে জুলাই ১৯৩০

৬। "To the Students of Bengal"—Leaflet issued by Hem Chandra Ghosh, Secretary, B.P.C.C. ২৪শে জুলাই ১৯৩০

৭। "বাংলার ছাত্র বন্ধুগণের প্রতি"—(পুস্তিকা) ২৮শে জুলাই ১৯৩০

৮। "ভাই তরুণ, মনে রেখো আজ"—(লিথো পুস্তিকা) ৩১শে জুলাই ১৯৩০

৯। "বিদ্রোহী রাশিয়া"—অমূল্য চন্দ্র অধিকারী (মহামায়া প্রেস ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩০

১০। "মুক্তিযাত্রীর প্রবচন"—মহাত্মা গান্ধী (সজনীকান্ত দাস কর্তৃক প্রবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত ও সীতারাম সাকসেরিয়া কর্তৃক শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার ১৩২।১ হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত) ২৯শে আগষ্ট ১৯৩০

১১। "প্রলয় শিখা"—কাজী নজরুল ইসলাম (মহামায়া প্রেস) ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

১২। "ডনক্ক"—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৬ই অক্টোবর ১৯৩০

১৩। "নাগপাশ"—শশীভূষণ দাস (আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪ দীননাথ মিত্র লেন কলিকাতা)

১৪। "ভারতীয় গীতাঞ্জলি"—(হিন্দি) রূপ সিং (লক্ষ্মী প্রেস, চকবাজার দিল্লী)

১৫। "বাংলার তরুণ" (পুস্তিকা) ২২শে নভেম্বর ১৯৩০

১৬। "১৭ই নভেম্বর" ,,

১৭। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বক্তৃতা—(পুস্তিকা) প্রকাশক পরেশ দত্ত (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি) ২২শে নভেম্বর ১৯৩০

১৮। "বাংলার কথা"—রমণী রঞ্জন গুহরায় (বীণাপাণি আর্ট প্রেস, ৩০।১ দুর্গাচরণ মুখার্জি ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত এবং ২।২ বাগবাজার ষ্ট্রীটের বলাই মুখার্জী দ্বারা প্রকাশিত) ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩০

১৯। "Law and Order in Midnapur 1930 as contained in the Reports of the Non-official Enquiry Committee"—সজনী কান্ত দাস কর্তৃক প্রবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত ও দিনেশ চন্দ্র লোধ ২৩ নেবুয়া বাজার ষ্ট্রীট কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩০

২০। "The Message of Venom" (leaflet)—15.1.1931

২১। "ফাঁসির সত্যেন"—ব্রজবিহারী বর্মন রায় (১৯৩ কর্ন ওয়ালিস ষ্ট্রীট)

২২। "হিন্দু পুরু বলিদান অংক" (হিন্দি) হিন্দি কাগজ ১.১.৩১

২৩। The Hindu Socialist Republican Association Manifesto : The Philosophy of the Bomb (Leaflet in English) ২৮.১.১৯৩১

২৪। "দেশের ডাক"—(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংস্করণ) জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ৩১.১ ৩১

২৫। "রক্ত বিনা হে দেশভক্ত দেশ না স্বাধীন হবে"—(পুস্তিকা) ৩.২.৩০

২৬। "দেশ দশ চিত্রাবলী"—(হিন্দি ও ইংরেজী পুস্তিকা) ৩.২.৩০

২৭। "চলার পথে"—ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় (যুগবন্ধ প্রেস ৯৩।১ এক বৈঠকখানা রোড ৩.৩.৩০

২৮। "India" compiled by Jnananjan Niyogi ১৩.৩.৩০

২৯। "Workers, Students and Citizens of Calcutta"—কলিকাতার শ্রমিক ছাত্র ও নাগরিকগণ (ইংরেজী ও বাংলা পুস্তিকা) ১০.৪.৩০

৩০। (ক) Indian Republican Army (Eng. leaflet) signed—"By order President in Council, Indian Republican Army, Chittagong Branch beginning with the words "To the students and youths of Chittagong".

(খ) Indian Republican Army (English leaflet) beginning with the words "The Indian Republican Army Chittagong". 21.4.30

৩১। (ক) Manifesto of the Young Comrades League (Bengal) to the Youth of India—N. Sen. Secy. Young Comrades League 23, Mechua Bazar Street from Yugabarta Press 4, Chaku Khansama Lane, Cal. 21.4.1930

(খ) Political Resolutions of the First All Bengal Young Comrades' League Conference at Rajshahi, April 1930, 21.4.1930.

৩২। খুনী কর্ণেল বা আংরেজো কি নীচতা (হিন্দি পুস্তিকা) ২৪।৪।৩০

৩৩। ধন্দরা (বাংলা পুস্তিকা) ২৪।৪।৩০

৩৪। "ভারতের কাপড়ের ইতিকথা"—কিরণশঙ্কর রায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। ২৮।৪।৩০

৩৫। হর হাল (বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু) নৃপেন চৌধুরী ১।৫।১৯৩০

৩৬। Workers of Calcutta (Eng. leaflet) issued by the Calcutta Committee of the Communist Party of India. ১।৫।১৯৩০

৩৭। "বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী"—জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী ৯।৫।১৯৩০

৩৮। "বাংলার যুব বন্ধু ও শ্রমিক ভাইসব" পুস্তিকা ১২।৫।১৯৩০

৩৯। Indian War of Independence Pt. I & II (2nd Ed) Barrister Savarkar, Education Printing Works Lahore. ১৯।৫।৩০

৪০। সত্যাগ্রহীর গান ২৯।৫।৩০ (হিন্দি পুস্তিকা)—জগদীশ নারায়ণ তেওয়ারী (১১২ কটন স্ট্রীট, কলিকাতা।)

৪১। বাংলার যুব বন্ধুগণ—স্বাঃ—বিপ্লবীকর্মীগণ (২৯।৫।১৯৩০)

৪২। "ফিরিঙ্গিয়া" (হিন্দি পুস্তিকা)—মনোরঞ্জন প্রসাদ (২৯।৫।১৯৩০)

৪৩। "আগে চল, আগে চল ভাই"—বাংলা পুস্তিকা (৩১।৫।৩০)

৪৪। পুলিশ কর্মচারীদের। সে আপীল—হিন্দি পুস্তিকা—ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা (মন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি কলিকাতা) ১৪।৬।১৯৩০

৪৫। "ওওা রাজ্য কা অন্ত কৈও কর দো" (হিন্দি পুস্তিকা) ১৯।৬।১৯৩০

৪৬। ক) "ভাই তরুণ মনে রেখো" খ) "কাল বোশেখীর প্রথম দমকা বাতাস"।—বাংলা পুস্তিকা (২০।৬।১৯৩০)

৪৭। "খুনী ফরমান"—হিন্দি পুস্তিকা—সম্পাদক বক্তমণ্ডল (২৪।৬।১৯৩০)

৪৮। "মুক্তিগাথা" দ্বিতীয় খণ্ড, কাঁথি—বাংলা পুস্তিকা (১৬।২।১৯৩১)

৪৯। "Be Aware"—English Leaflet (২৭।২।১৯৩১)

৫০। "আগামী রক্ত বিপ্লব"—বাংলা পুস্তিকা (১৪।৩।১৯৩১)

৫১। The good fight he fought for India's Independence—English Leaflet (২০।৩।১৯৩১)

৫২। Where is Peace—English Leaflet (২১।৩।১৯৩১)

৫৩। "E Order No 2 February 15,1931 To Action"—English Leaflet (২১।৩।১৯৩১)

৫৪। 'Friend'— English Leaflet (২১।৩।১৯৩১)

৫৫। "শান্তি না সাজা"—বাংলা পুস্তিকা (২৩।৩।১৯৩১)

৫৬। "দেশের মুক্তি"—অমূল্যকুমার গোস্বামী (রাণীগঞ্জ তরুণ প্রেস)।

৫৭। Our Right of Revenge—English Leaflet (২৬।৩।১৯৩১)

৫৮। বিপ্লবী স্মরণে– বাংলা পুস্তিকা (২৬।৩।১৯৩১)

৫৯। An Appeal to the Youths of India from the Hindusthan Socialist Republican Army and the Communist Party, Bengal Branch—English Leaflet (1.4.31)

৬০। "শোক সিন্ধু"—নগেন্দ্রনাথ দাস (৯।৪।১৯৩১)

৬১। স্বাধীনতার পঞ্চম অভিযান—ধন বল্লভ (১৪।৪।১৯৩১)

৬২। সাবাস বেদিনীপুর—বাংলা পুস্তিকা (১৭।৪।১৯৩১)

৬৩। অমর শহীদ ভগত সিং—হিন্দি পুস্তিকা। সরস্বতী পুস্তক এজেন্সী ১৯৪।১ হারিসন রোড, কর্তৃক প্রকাশিত। (২১।৪।১৯৩১)

৬৪। বায়ের ডাক—যশোদালাল আচার্য, দামোদর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা (২২।৪।১৯৩১)

৬৫। ফাঁসী—নগেন্দ্রনাথ দাস (২২।৪।১৯৩১)

৬৬। ভগৎসিং ঔর রাজগুরু কি ফাঁসি—শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র ১৭০ হ্যারিসন রোড। (২৩।৪।১৯৩১)

৬৭। শহীদ ভগত সিং—শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র ১৭০ হ্যারিসন রোড। (২৩।৪।১৯৩১)

৬৮। First Indian War of Independence—Rammangal Singh, Secy. Rajput Navajubak Dal. 1/1 Meehua Bazar Street.

৬৯। Hindusthan Socialistic Republican Army—Manifesto Karter Singh, President

(১৬।১০।১৯৩১)

৭০। Give me liberty or give me death—Dictator, Jadavpur War Council (৩০।১।৩২)

৭১। রাষ্ট্র কো পুকার শুনো (৩০।১।৩২)

৭২। পুলিশ ঔর পল্টনকী ভাইয়োঁসে আপীল (১।২।৩২)

৭৩। আবেদন—দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস যুদ্ধ সমিতি। ৭২এ আশুতোষ মুখার্জী রোড, (২।২।১৯৩২)

৭৪। খুন দেনে সে স্বতন্ত্রতা মিলতি হ্যায়—রাজা রাম শাস্ত্রী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তৃতীয় ডিক্টেটর (৩।২।১৯৩২)

৭৫। An Appeal to the Revolutionary Students of Bengal (৩।২।১৯৩২)

এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, হতে পারে না। আমি মুষ্টিমেয় কিছু বই (যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল) এর নাম দিয়েছি মাত্র। উৎসাহী গবেষক আরও সংগ্রহ করবেন আশা করি। শুধু তালিকা বৃদ্ধি নয়, বইগুলি যাতে অবরোধমুক্ত হয় তার জন্যও সচেষ্ট হতে হবে তাদের।

———

সিবাস্টিয়ান মান্‌রিকের চোখে বাংলাদেশ

সাড়া দত্ত

[ভারতের ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের তালিকায় সিবাস্টিয়ান মান্‌রিক একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর রচিত Itinerario Oriental গ্রন্থটি ইতিহাসে একটি অন্যতম বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনীরূপে পরিচিত। এই গ্রন্থে মান্‌রিক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রাচ্যের অন্যান্য অনেক স্থানের বিবরণ দিয়েছেন।

ভারতের ইতিহাসে মান্‌রিকের বিবরণী মুঘল রাজত্বের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সুপরিচিত। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের বিবরণ ছাড়াও এই গ্রন্থে বাংলাদেশ সম্পর্কে মান্‌রিকের একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মান্‌রিকের এই 'বঙ্গ-দর্শন' কতখানি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও, তদানীন্তন কালের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বিবরণীর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। এই কারণে এই বৃত্তান্তটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে কোন ইতিহাস-রসিকের পক্ষে সহজেই অনুমেয়। বর্তমান রচনাটি এই গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনীরই অনুবাদ।

অনুবাদ অংশটি লেখার পূর্বে এখানে মান্‌রিক সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। একটি খ্যাতনামা লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পাঠকমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে। এই ব্যক্তিগত পরিচয়ের মাধ্যমে পাঠক ও লেখকের মধ্যে একটি আন্তরিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। যার ফলে লেখকের বক্তব্য, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রাঞ্জল হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মান্‌রিক সম্বন্ধে এই প্রকার কৌতূহল মেটার অল্পই অবকাশ আছে। Lord Hoffen ও C. E. C. Luard অনূদিত Itinerario Oriental-এর ভূমিকায় ও অন্যান্য দুয়েকটি প্রবন্ধ থেকে মান্‌রিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে টুকু তথ্য পাওয়া যায় তা এখানে প্রকাশ করা হল।

জাতিতে মান্‌রিক পর্তুগীজ, পেশায় ধর্মপ্রচারক। সুদূর পর্তুগাল থেকে

জেসুইট ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায় ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ভারতের গোয়া শহরে প্রেরণ করেন। এরপর প্রায় ২৭ বৎসর পরে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬২৯ খৃঃ) মানরিক প্রাচ্যের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম তিনি এলেন বাংলা দেশে। সেখান থেকে আরাকান, পেগু, গোয়া, ফিলিপাইন, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষে আগ্রাতে প্রত্যাবর্তন করেন। রোমে পৌঁছানোর পর মানরিক পোপের নির্দেশে পর্তুগীজ প্রদেশের দেওয়ান (Procurator) রূপে নিযুক্ত হন। এই সময়েই স্পেনীয় ভাষায় তিনি Itinerario Oriental গ্রন্থটি রচনা করেন তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে এক আততায়ীর হস্তে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্পেনীয় ভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন হাকলুৎ সোসাইটি (Hakluyt Society)। তাঁদেরই উদ্যোগে Lord Hoston ও C. E. Luard এই গ্রন্থটির প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। নিম্নোক্ত রচনাটি Hoston ও Luard অনূদিত গ্রন্থেরই বাংলা অনুবাদ।]

প্রথম অধ্যায়

[এই অধ্যায়ে লেখক ভারতে তাঁর ধর্ম প্রচারণার সূচনা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কী ভাবে তিনি বাংলাদেশে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন]

হে ভদ্র ও কৌতূহলী পাঠক, এই অধ্যায় আরম্ভ করার পূর্বে আমি আপনাকে অসংবদ্ধ ঘটনাবলীতে পূর্ণ একটি দীর্ঘ ও বিরক্তিকর ভূমিকার হাত থেকে অব্যাহতি দিতে চাই। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানাতে চাই যে আমাকে ধর্মপ্রচারণা বা ভ্রমণ সম্বন্ধীয় কোন বিবরণী প্রকাশ করার জন্য কিছু বন্ধুবর্গ তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একাধিকবার এই দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছি। অবশ্য, তখন বাংলা দেশের নানারকম ঘটনাতে আমার মন খুব বিক্ষিপ্ত এবং চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

কাজেই এই জাতীয় কার্যভার গ্রহণ করাও তখন ঠিক সম্ভব ছিল না। কিন্তু এইটাই একমাত্র কারণ বললে ভুল হবে। বরং একটি সুযোগ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে যে প্রকার গুণ বা দক্ষতা থাকা একান্তই আবশ্যক আমার মধ্যে তার অভাবই আমাকে বারংবার নিরস্ত করেছে। কিন্তু পরে কিছু সমসাময়িক ভ্রমণ কাহিনী যখন চোখে পড়লো, তখন খানিকটা উৎসাহিত হলাম। কারণ, মনে হ'লো যে ভাষার ঐশ্বর্য ও চমৎকারিত্বে এই সমস্ত লেখকদের সমকক্ষ না হতে পারলেও আমি হয়ত আমার অভিজ্ঞতার বিবরণটুকু চিরস্থায়ী করে যেতে পারবো। আশা করি, আমার এই লেখা আবেগ উচ্ছ্বাস বর্জিত হ'লেও তাতে অন্তর্নিহিত সত্যটি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সুতরাং সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করে ঘোষণা করছি যে আমি কোচিনের সংসারত্যাগী খৃষ্টধর্ম প্রচারক সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। কোচিন হ'ল কোচিন প্রদেশের রাজধানী। আয়তনে এই শহর পূর্বভারতে পর্তুগীজদের অধিকৃত সমস্ত স্থানগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। অবশ্য এখানকার স্নিগ্ধ, নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করলে কোচিনের প্রথম স্থানই প্রাপ্য। কোচিন[১] শহর সমুদ্রের নিকটে মালাবার উপকূলে অবস্থিত। মঙ্গাতা নদীর একটি শাখা এই শহরকে হিন্দুরাজ্য কর্তৃক অধিকৃত কোচিন অঞ্চল থেকে পৃথক করেছে। তাছাড়া, মঙ্গাতা[২] (Mangata) নদী কোচিন বন্দরের নিকটে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হবার ফলে ভাইপিন[৩] (Vypien) ও আন্‌জে কোয়েমল (Anjequaimal)[৪] দ্বীপ দুইটি কোচিন বন্দর থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। কেননা এই নদী একদিকে কোচিন ও অন্যদিকে ভাইপিন ও আন্‌জেকোয়েমল দ্বীপগুলির মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

এই শহরে অবস্থানকালে আমাদের পূর্ব ভারতের (?) ধর্ম প্রচারক সম্প্রদায়ের Vice-Provincial[৫] শ্রদ্ধেয় ফাদার Master Frai Luis Continbo কর্তৃক আয়োজিত ধর্মপ্রচারক নির্বাচনে আমি বাংলায় ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত মনোনীত হ'লাম। আমার সঙ্গীরূপে মনোনীত হলেন ম্যানুয়েল ডিলা এ্যাসামসিওন (Manuel dela Assumcion), ডিয়োগো ক্যাটেলা (Diego Catela) ও গ্রেগরিও ডি লস্ এ্যাঞ্জেলেস (Gregorio de los Angeles)। সব মিলিয়ে সংখ্যায় আমরা চারজন। সেই সময় কোচিন

মঠের প্রধান ছিলেন ফাদার প্রায়র (Father Prior)। তাঁর কাছে অনুরোধ জানানো হল যে তিনি যেন আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে দেন। খুব আগ্রহ ও হৃদ্যতার সঙ্গে Prior সে আদেশ যথাযথরূপে পালন করলেন। তিনি বাংলাগামী দুটি বাণিজ্যিক জাহাজে আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। জাহাজ দুটির পথে বিভিন্ন বন্দরেও থামার কথা ফাদার ফ্রে গ্রেগরিও ডি লস্ এ্যাঞ্জেলেস (Father Gregario de los Angeles) আমার সঙ্গী হলেন। সেন্ট অগাস্টিন (Saint Augustine) নামে যে জাহাজটি হুগলী অভিমুখে রওনা হচ্ছিল আমরা দুজন সেই জাহাজে বাংলাদেশ অভিমুখে যাত্রা করলাম।

আমাদের অপর দুইজন সঙ্গী আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজে রওনা হল। এই জাহাজটির গন্তব্যস্থল ছিল উড়িষ্যার পিপ্‌লি শহর। পূর্বেই মালপত্র বোঝাই হয়ে যাওয়ার দরুণ ওদের জাহাজটি আমাদের চেয়ে ১৪ দিন আগেই রওনা হয়ে যায় কিন্তু কমোরীন অন্তরীপে ও সিংহল উপসাগরে অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়াতে জাহাজটি ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তারা দিক্‌পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। নির্দ্ধারিত বন্দর পিছনে রেখে তারা টিউটিকোরিনের (Tuticorim)১ এর পথে যাত্রা করলো। টিউটিকোরিন বন্দরটি পিপ্‌লি বন্দরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কাছে ও অনেক ভালও। কিন্তু এতো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ও অকেজো হয়ে জাহাজটি টিউটিকোরিনে এসে পৌছয় যে সে বৎসর তারা আর বাংলাদেশে যেতে পারে নি।

আমাদের জাহাজটি মালবোঝাইয়ের কাজ শেষ করে নদী থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের গভীর জলে যাত্রা করলো। কিন্তু বড় বড় জাহাজগুলি সাধারণতঃ একটু গভীর জলে গিয়ে মালপত্র বোঝাই করার কাজ সমাপ্ত করে, নতুবা জাহাজ ভারী হয়ে নদীমুখের অগভীর চড়াতে আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের জাহাজে পূর্বেই অত্যধিক মালবোঝাই করে ফেলার দরুণ নদীমুখের এই জলমগ্ন চড়াতে গিয়ে আটকে রইল। ফলে পুরো দুদিন ধরে জাহাজ স্তূপীকৃত বালুরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে থাকলো। অবশেষে যখন ব্যবসায়ীগণ দেখলেন যে মালপত্র কিছু না কমালে যাওয়া সম্ভব হবে না তখন তাঁরা কিছু

কিছু জিনিষপত্র নামিয়ে দিলেন। এই বাধা অপসারিত হ'লে জাহাজ যাত্রার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হ'ল। তখন ক্যাপ্টেন ইস্টেভান পিরেস ক্যামাকো (Istevan Pires Camacho) মঠ থেকে আমাদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর বার্তা পেয়ে আমরা In Viam Pacis ৮ অনুষ্ঠান পালন করে জাহাজে চড়ে বসলাম। এইভাবে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হ'ল।

কিন্তু যাত্রার প্রারম্ভেই পরকা (Porca)৯ ও কোলন (Coulon)১০ প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে জাহাজ অচল হয়ে পড়ল। ফলে ১৪ দিন ধরে ঐস্থানেই আমরা আটক হয়ে রইলাম। অবশেষে, উপায়ান্তর না দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেন উপস্থিত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পরামর্শ দিতে আহ্বান জানালেন। তাঁরা সকলে জাহাজ কোচিন বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিমধ্যে আমরা বারংবার পরমপবিত্র মাদার মেরীর (Mother Mary) নাম স্মরণ করছিলাম যাতে ঈশ্বর প্রসন্ন হন; এই বিপদের সময় যেন তিনি কৃপা করেন। অবশেষে সত্য সত্যই ঈশ্বর প্রসন্ন হলেন। মাঝিমাল্লারা যখন জাহাজ কোচিনের দিকে ফেরাতে যাবে তখন জাহাজ চালানোর অনুকূল বাতাস দেখা দিল। ফলে কোচিনের পরিবর্তে জাহাজ বাংলাদেশে অভিমুখে যাত্রা করল। তারপর ১৩ দিনের মধ্যে আমরা বাংলার উপকূলের মধ্যে এসে পৌছলাম।

চান্দিকান (Chandikan)১১ প্রদেশের উপকূলভাগে এসে জাহাজ নোঙর ফেলল। যে স্থানে আমরা নোঙর করলাম সেটা চান্দিকানের সমগ্র উপকূলভাগের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান। এই উপকূলে অসংখ্য বালুকাময় তট ও জলমগ্ন চড়া আছে। এই পথে যাতায়াত করার সময়ে জাহাজগুলি জলে অবিরত হুক নামিয়ে দেখতে থাকে যে তলদেশে ৬ কী ৭ ফ্যাদাম (ফ্যাদাম = ৬ ফুট) গভীর জল আছে কী না। যদি আট কিংবা তারচেয়ে বেশী ফ্যাদাম গভীর জল পায় তখনই তারা বুঝতে পারে যে জাহাজ ভুল পথে এসে পড়েছে এবং শীঘ্রই ৪ কিম্বা ৩ ফ্যাদাম মাত্র গভীর জলে গিয়ে জাহাজ আটকে পড়বে। এই কারণে এই উপকূলভাগকে বাংলার Brece বা বন্ধনী বলা হয়।

এইভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জাহাজ চালিয়ে Holy Trinity২২ দিবসে আমরা বাংলার উপকূলে প্রবেশ করলাম। আবহাওয়া তখন খুব শান্ত, সমুদ্রও নিস্তরঙ্গ। নিরাপদে যাত্রা সমাপ্ত হওয়াতে আমরা সবাই আনন্দিত চিত্তে উৎসবের আয়োজন করলাম। জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে একটা উঁচু বেদী তৈরী করে তার উপর ফাদার ও আমরা দু'জন উপাসনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করলাম। তারপর শান্ত নির্মেঘ আকাশের নীচ দিয়ে ফ্যাদাম গুণে গুণে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আমরা তীরের দিকে অগ্রসর হলাম। এমন সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ, না, আমাদের পাপের ফলে জানি না, মধ্যাহ্নে সূর্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপর, তখন স্রোতের গতি একেবারে কমে গেল। ফলে আমরা চান্দিকানের চড়াতে এসে ঠেকলাম। এই জলমগ্ন চড়াগুলি সমুদ্রের এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে চড়া থেকে তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই রকম আবহাওয়ায় এই চড়াগুলি অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে। আমাদের জাহাজটি যখন কোচিনের চড়াতে আটকে গিয়েছিল তখনই এর কলকব্জার জোড়গুলি খুলে গিয়ে ভেতরে কিছু কিছু গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেইজন্যই জাহাজ ৫ ফ্যাদাম গভীর জলেই আটকে গেল। অবশ্য এ ছাড়াও আরও একটি কারণ আছে। জাহাজের মালপত্রের মধ্যে অধিকাংশই হ'ল বড় বড় শঙ্খ যেগুলি টিউটিকোরিন ও ফিশারি (Fishery) উপকূলে পাওয়া যায়। এমন কি জাহাজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভারী জিনিষ হিসাবেও এই শঙ্খ ব্যবহৃত হয়। জাহাজের ভাঙা জোড়া ও গর্তগুলি দিয়ে জল ঢোকার ফলে এই শঙ্খগুলি খুব শীঘ্রই জলপূর্ণ হয়ে গেল। ফলে জাহাজ ভারী হয়ে ৫ ফ্যাদাম গভীর জলেই আটকে গেল।

বাংলার ও ভারতের অন্যান্য বন্দরগুলিতে এই শঙ্খ একটি প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভাররূপে পরিগণিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের গয়না তৈরী করার জন্য এই সব শঙ্খের খুব চাহিদা আছে। সুনিপুণভাবে ও রুচিসম্মতরূপে হিন্দুরা এইগুলি দিয়ে আংটি ও নানাপ্রকার হাতের অলঙ্কার তৈরী করে। মেয়েরা শঙ্খের অলঙ্কার পায়েও পরিধান করে। অলঙ্কার নির্মাণ করা হয়ে গেলে শঙ্খগুলি শ্বেত শুভ্র আকার ধারণ করে।

তখন এই সাদা জমিনের ওপর নানারকম রঙ ও সোনা দিয়ে নক্‌শা এঁকে দেওয়া হয়। ফলে অলঙ্কারগুলি খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। হিন্দু রমণীরা তাদের স্বামী ও নিকটতম আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হলে মৃতদেহের সঙ্গে এই অলঙ্কারগুলি পুড়িয়ে ফেলে। এই প্রথার জন্যই হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট শঙ্খের অলঙ্কারের এত চাহিদা। ফলে প্রতি বৎসরই বাংলাদেশে এগুলির আমদানি হয়। এই সব শঙ্খগুলির মধ্যে প্রায়শঃই একপ্রকারের শঙ্খ পাওয়া যায় সেগুলিকে রাজকীয় শঙ্খ বলা হয়। সাধারণতঃ শঙ্খের মুখ যেদিকে থাকে রাজকীয় শঙ্খের মুখ সেদিকে থাকে না—এইটিই এই শঙ্খগুলির বিশেষত্ব। রাজন্যবর্গ ও ধনী ব্যক্তিদের উপযোগী শঙ্খের মূল্য ২০০ থেকে ৩০০ টাকা অর্থাৎ স্পেনীয় মুদ্রায় ১৫০ পেসো।

এই শঙ্খগুলির জন্যই শেষে আমাদের চরম বিপদের সম্মুখীন হ'তে হ'ল। শঙ্খগুলি ভর্তি হয়ে যাবার পর পাম্পের সাহায্যেও জল বার করা গেল না। আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন অতি বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোক। ইতিপূর্বে ১৩ বার তিনি এই দুর্গম পথে নিরাপদে যাতায়াত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন ও শেষে জাহাজের ওজন কমানোর জন্য মাস্তুলগুলি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে আমাদের বললেন যে ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পাপের জন্য শাস্তি দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে এই অনুরোধও জানালেন যে দু'শরও বেশী যাত্রীবর্গের প্রাণোদ্ধারের নিমিত্ত আমরা যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। এই কথা শোনামাত্র আমরা উপস্থিত খৃষ্টান যাত্রীদের স্বীকারোক্তির (confession) ব্যবস্থা করলাম। চারিদিকে তখন প্রচণ্ড গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা—একদিকে নারী ও শিশুর বিলাপ ও অপরদিকে মাস্তুল কাটার শব্দ। তারই মধ্যে আমি ও আমার সঙ্গী যথাক্রমে জাহাজের অগ্রভাগে ও শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐ অত অল্প সময়ের মধ্যে যতোদূর সম্ভব প্রত্যেকের স্বীকারোক্তি নিলাম।

ইতিমধ্যে কিছু মুসলমান নাবিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গিয়েছে, এই কথা শোনামাত্র মুক্তির পবিত্র চিহ্ন ক্রুশটি হাতে নিয়ে (যেটা

সাধারণতঃ গলায় ঝোলান থাকে) নীচে তাদের স্ত্রীদের নিকটে নেমে গেলাম। এই সব নাবিকরা সাধারণতঃ পর্তুগীজ বাণিজ্যতরীতে কাজ করে। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের লস্কর বলে। এরা অধিকাংশই ধর্মে মুসলমান। যাই হোক কতোখানি বিপদের মধ্যে তারা আছে এবং তার ফলে পার্থিব জীবনের যে অবসান ঘটতে পারে—এই কথাটাই সেই মহিলাদের বুঝিয়ে বললাম। এছাড়াও আরও কিছু বলেছিলাম যা বলার নিমিত্ত ঈশ্বর তখন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অবশ্য নিজেদের অযোগ্যতার দরুণ আমার কথার কোন ফলই হ'ল না। কারণ, তারপরেই এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তাদের গুরু মহম্মদের বাণী স্মরণ করার জন্য উপদেশ দিতে আরম্ভ করলো।

এদিকে ক্রমাগত জাহাজে জল ঢুকতে লাগলো। অবশ্য প্রত্যেকেই মালপত্র ফেলে দিয়ে জাহাজটিকে হাল্কা করার চেষ্টা করছিল। আমরাও উপাসনা শেষ করে এই কাজে হাত লাগালাম। কিন্তু স্বয়ং ভগবান যদি করুণাপরবশ হয়ে আবহাওয়া শান্ত না রাখতেন তাহলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিন আমাদের প্রাণরক্ষা হ'তো না। কেননা, সেই কঠিন পাথরের উপর জাহাজটিকে ফেলে চুরমার করে দেবার পক্ষে সামান্য একটু হাওয়ার আন্দোলনই যথেষ্ট ছিল। অথচ সেদিন সমস্তক্ষণ আবহাওয়া এত শান্ত ছিল যে এতোটুকু বাতাস ওঠে নি। যাই হোক, তারপর মাস্তুল কাটা ও হাল ছেড়ে দেবার পর প্রত্যেকেই ভেলা, কাঠের তক্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সেই দুঃসময়ে এইগুলিই আমাদের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কিছু সংখ্যক যাত্রী ঝগড়া ও মারামারি করতে আরম্ভ করলে, তাড়াতাড়ি আমরা সেখানে উপস্থিত হ'লাম। মৃদু ভৎর্সনায় সঙ্গে ঈশ্বরের নামে তাদের অনুরোধ করলাম যে তারা যেন মনে রাখে যে কী অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছে। এরপর উচ্ছৃঙ্খল জনতা শান্ত হলো কারণ এই সব অঞ্চলের অধিবাসীগণ ধার্মিক ব্যক্তিকে খুব শ্রদ্ধা করে। ইতিমধ্যে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। সেই সঙ্গে তীর থেকে বাতাস বইতে আরম্ভ করলো। তার ফলে নাড়া খেয়ে বড় বড় কঠিন পাথরের গায়ে জাহাজটি ধাক্কা খেতে লাগল। তখন প্রতি মুহূর্তে মনে

হচ্ছিল এই বুঝি জাহাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এমন সময় আমার সঙ্গীর মনে পড়লো যে Salamanca র মহৎ পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় Bl. John of Sahagun [১৭] এর স্মৃতিচিহ্ন আমাদের কাছে আছে। তখন ঈশ্বরকে প্রসন্ন করবার জন্য ও বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় সে এই স্মৃতিচিহ্নটি সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিল। এই পবিত্র ও ভক্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানটি পালন করার সময় আমার সঙ্গী ও বহু দর্শকই অশ্রুজল সংবরণ করতে পারেন নি। অবশেষে অসীম করুণাময় ঈশ্বর প্রীত হলেন। বাতাসের বেগ ধীরে ধীরে কখন যেন কমে এলো, বেলাভূমির উপর দিয়ে মৃদু স্রোত বইতে লাগলো এবং একেবারে তীরের কাছে এসে জাহাজটি স্থির হয়ে দাঁড়াল। পরম করুণাময় জগদীশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম —এঁরাই আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলেন। পুনর্বার ঈশ্বরের অপরিসীম দয়ার পরিচয় পেয়ে ধন্য হলাম। তারপর অবশিষ্ট রাত্রিটুকু আমরা শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[পরদিন Musundulim:e রাজার অধিকৃত Anjolim[১৮] প্রদেশে প্রবেশ করার পর যা ঘটেছিল—এই অধ্যায়ে লেখক তারই বর্ণনা দিয়েছেন।]

রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আকাশের পূর্বদিকে ফীরাসের রক্তিমাভা দেখা দিল। সেই সঙ্গে একটি সুন্দর ও আনন্দময় প্রত্যুষের আবির্ভাব ঘোষিত হ'ল। দিনের আলোয় ক্যাপ্‌টেন চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও হাল্কা কামানগুলি গোলাবারুদ ভরে যথাস্থানে রাখতে আদেশ দিলেন। কিন্তু দেখা গেল বারুদ জলে ভিজে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে। তখন জাহাজের কর্মীবৃন্দ কিছু সংখ্যক যাত্রীদের কৌটোয় যে বারুদ ছিল তাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হ'ল। এই সব কৌটো-গুলি ডেকের উপর থাকার দরুণ জলে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়নি। তবে সংগৃহীত বারুদের পরিমাণ এতই অল্প যে তা দিয়ে ২।৩ বারের বেশী কামান ছোঁড়া সম্ভব হবে না।

এইভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে যখন আমরা ব্যস্ত, তখন দূরে মুঘলভূমিনের এক দাঁড়বাহী নৌবহর চোখে পড়লো। আমাদের জাহাজটিকে দেখামাত্র তারা দাঁড় টানা বন্ধ করে সাদা পতাকাসহ একটি ছোট নৌকো পাঠিয়ে দিল। এই সাদা পতাকাটি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচয়। ছোট নৌকাটি আমাদের কাছাকাছি এলে নৌকার আরোহীরা আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অনুমতি চাইল। এই অনুমতি পাবার পর তারা জানালো যে কোন অসদুদ্দেশ্যে তারা আসে নি। কারণ, হুগলীতে অবস্থিত পর্তুগীজদের সঙ্গে তাদের রাজার যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে, রাজা তা রক্ষা করতেই চান। এই সন্ধিপত্রের চুক্তিগুলি কার্যকরী করাই রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা আমাদের কাছে এসেছে। এই চুক্তিগুলির মধ্যে একটি হ'লো এই যে যদি কোন পর্তুগীজ জাহাজ তাদের রাজার রাজ্যের মধ্যে এসে নোঙর ফেলে, তাহলে সেই জাহাজের যাবতীয় মালপত্র রাজার বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য, তিনি অন্যায়রূপে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবেন না, যেটুকু ক্যাপ্টেন, নাবিক ও ধর্মযাজকদের বিবেচনায় ন্যায্য বলে বিবেচিত হবে সেটুকুই রাজা গ্রহণ করবেন। প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত। আমরা হুগলীতে যাচ্ছি এবং হুগলী মুঘলভূমিনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সন্ধির চুক্তি মানতে আমরা বাধ্য। সুতরাং আমরা জানালাম যে চুক্তিপত্র লঙ্ঘন করার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই, বিশেষতঃ যে চুক্তি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে শপথ করে করা হয়েছে। তাছাড়া, চুক্তিভঙ্গ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই আমরা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করি।

ইতিমধ্যে স্রোত কমে গেল। আমরা সবাই জাহাজ থেকে নেমে এক হাঁটু জল ভেঙে অতিকষ্টে তীরের দিকে রওনা হ'লাম। সবাই তীরে এসে পৌঁছলে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানিয়ে Father Frai Emanuel de la Esperanca-র কাছে চিঠি দেওয়া হ'ল। ইনি একজন অগাস্টিনিয়ান ধর্মযাজক এবং সেসময়ে ভারতে অগাস্টিনিয়ান ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রধান। সাধারনতঃ তিনি 'Vicar de la vara of the Bishop of Maliapur[১৮] নামেই পরিচিত। পথিমধ্যে পত্রটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি সাইবো-সুব্বার[১৯] (Saibo-Subba) হস্তগত হয়। ইনি

সে সময়ে ঐ পথ দিয়ে ৩০০ ঘোড়া নিয়ে আমাদের নিকটেই আসছিলেন। আমাদের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্র সেনাপতি জাহাজের ক্যাপ্টেন ও Father-দের আহ্বান জানালেন। ক্যাপ্‌টেন ও আমরা দু'জন তাঁর সামনে উপস্থিত হ'লাম। অভিবাদন বিনিময়ের পর সেনাপতি ক্যাপ্‌টেনের নিকট জাহাজের সিন্দুক ও পাটাতনের ফাঁকের ঢাকনীগুলির চাবি চাইলেন। ক্যাপ্‌টেন উত্তরে জানালেন যে সিন্দুকগুলি সবই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কাজেই এগুলির চাবি সিন্দুকের মালিকদের কাছেই আছে। আর জাহাজের সবই তো প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, কাজেই ঢাকনাগুলির চাবি দিয়ে আর কী হবে? তাছাড়া, ইতিমধ্যে সেনাপতির সৈন্যরা তো জাহাজে ঢুকেই পড়েছে। মূল্যবান জিনিষপত্র যা আছে ইচ্ছে করলেই সেনাপতি তা সহজেই নিতে পারেন। সে সব যদি তিনি না নেন তবে শুধু চাবি নিয়েই বা তাঁর কী লাভ!

এই কথায় সেনাপতি এতই ক্রুদ্ধ হলেন যে ক্যাপ্‌টেন ও একজন ধর্ম-যাজকের শিরশ্ছেদ করার আদেশ দিলেন। এর খুব কাছেই আমি দাঁড়িয়ে-ছিলাম। ফলে সৈন্যরা ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে আমাকেও বন্দী করলো। সত্য সত্যই খুব ভয় পেয়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। তবে ক্যাপ্‌টেনকে খুব সহজভাবে হাসতে ও কথাবার্তা বলতে দেখে সাহস পেলাম। তারপর খুব হৈ চৈ শব্দ করতে করতে একদল পেয়াদা এসে উপস্থিত হ'ল।

খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে তারা আমাদের হাত পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে চললো। এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়ে ক্যাপ্‌টেনের কথা চিন্তা করে ভাবলাম তাকে একটু উৎসাহ দিই, বলি যে এসবই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই ভেবে ক্যাপ্‌টেনের দিকে তাকালাম। কিন্তু পরিবর্তে তিনি-ই আমাকে উৎসাহ দিলেন, জানালেন যে শুধুমাত্র আমাদের ভয় দেখানোর জন্যই সমস্ত ঘটনাটা সাজানো। যাই হোক্, কিছু দূর অগ্রসর হবার পরই পেয়াদারা একমাত্র অন্তর্বাস ব্যতীত আমাদের আর সব জামাকাপড় খুলে নিল। এইভাবে আমরা পূর্বনির্দ্দিষ্ট একটি স্থানে এসে পৌঁছলাম। তারপর পেয়াদারা তাদের বাঁকানো তরোয়াল হাতে নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ ভাবভঙ্গি করতে লাগলো যে মনে হল তারা যেন আমাদের মাথাই

কেটে ফেলবে যদি আমরা তাদের দেবার জন্য টাকা আনতে জাহাজে লোক না পাঠাই।

এই প্রকার শোচনীয় পরিবেশের মধ্যে প্রায় সমস্ত রাত্রিটা কেটে গেল। অবশেষে প্রত্যুষের কিছু পূর্বে উচ্চ ভেরীধ্বনি শুনতে পেলাম। এই ধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর অন্য আরেকটি শব্দ ভেসে এলো—"Milao", "Milao" —যার অর্থ হ'ল বন্ধুত্ব ও সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। এই কথা শোনামাত্র পেয়াদারা অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের মুক্তি দিল। ঘোষণাকারী সেনাপতির পক্ষ থেকে আমাদের সিরিপাও (Sripao) বা সুপুরী গাছের পাতা থেকে তৈরী এক প্রকার মদ উপহার দিল। এরপর আমাদের হাজির করা হল সেনাপতির কাছে। দেখলাম সেনাপতি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। পাশেই খাওয়ার টেবিল পাতা। তিনি আমাদের আহারের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বললেন। সেদিন সেই রাত্রি থেকে আরম্ভ করে পরদিন সকালের বেশ কিছুটা সময় পর্যন্ত আমরা খাওয়া ও গল্পগুজবে অতিবাহিত করেছিলাম।

ইতিমধ্যে হুগলী নগর থেকে **Father Frai Manuel** রাজার কাছ থেকে আমাদের মুক্তির ফারমান নিয়ে উপস্থিত হলেন। এছাড়া, ক্যাপ্টেন এবং ধর্মযাজকদের জন্য তিনি নানারঙের কয়েকটি সুন্দর ঢাকনী দেওয়া পাল্কী বা ডুলীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ডুলীতে একজন লোকের বসবার মত বা পা ছড়িয়ে হেলান দেওয়ার মত ব্যবস্থা থাকে। জন চারেক লোক এটি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাল্কীগুলিতে তাঁদের যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজেরা পায়ে হেঁটে রওনা হ'লাম। এই অঞ্চল থেকে হুগলী শহরের দূরত্ব তিন লীগ। এই তিন লীগ পথ পায়ে হেঁটে যেতে আমার কাছে প্রায় তিন হাজার লীগের মত মনে হল। সমগ্র অঞ্চলটি সমতল ও তারওপর কিছু অংশ জলাভূমি হওয়াতে পথঘাট এতো বেশী জলময় ও কর্দ্দমাক্ত যে প্রায়ই আমাদের কাদার পাঁকের মধ্যে পড়তে হচ্ছিল। কোন কোন স্থানে প্রায় কোমর পর্যন্ত উঁচু জল জমেছিল। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও সেইদিনই একটু বেশী রাত্রিতে আমরা হুগলী শহরে পৌঁছলাম। নবাবের কর্মচারীরা পূর্বেই কয়েকটি

বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কাজেই পৌঁছানোর পরই তারা আমাদের সেখানে নিয়ে গেল।

প্রথমে উপাসনাগৃহে ঢুকলাম। তারপর সেখান থেকে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে উপস্থিত হ'লাম। উপাসনাগৃহ থেকে ফেরার পর আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হ'লো বাগানের কোন জলাশয় গিয়ে হাত ও পায়ের কাদাগুলি ধুয়ে ফেলা। পরদিন সকালে রাজা আমাদের উপহার পাঠালেন। এদেশে লোকে এই উপহারকে আদিয়া (Adia)২০ বলে। দুটো ভেড়া আর দুটো টাকা নিয়ে এই উপহার। প্রেরিত বস্তু ব্যবহার করতে গেলে যে সব আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় তার মূল্য না দেওয়া এদেশে অশোভন বলে বিবেচিত হয়।

পাদটীকা

১। কোচিন—১৬২৮-২৯ খৃঃ কোচিন শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল খৃষ্টধর্মাবলম্বী ভারতীয়। এতো বেশী পর্তুগীজ এখানে বসবাস করতো যে Pyard de Laval এটিকে Portuguese Town বলে বর্ণনা করেছেন। কয়েকটি বড় বড় চার্চও এই শহরে নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই সময়ে কোচিন একটি সমৃদ্ধশালী শহর রূপেই পরিচিত ছিল।

কোচিন শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে আলংগাতি (Alangati) বা মাঙ্গারিক বর্ণিত মঙ্গাত্তা (Mangatta) নদী। তার ওপারে কোচিন দ্বীপ। এটি মালাবার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ও একজন হিন্দুরাজা এই অঞ্চলের শাসক। পর্তুগীজ অধ্যুষিত কোচিন শহর থেকে এই কোচিন দ্বীপ একটু উপরে অবস্থিত বলে পর্তুগীজরা এই অঞ্চলকে কোচিন Dacyma বলে।

২। মঙ্গাত্তা নদী (Mangatta River)—মঙ্গাত্তা শব্দ সম্ভবতঃ আলংগাতি (Alangati) শব্দের বিকৃত রূপ। আলংগাতি একটি ছোট রাজ্য এবং এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে একটি নদী কোচিনে এসে পড়েছে। সম্ভবতঃ রাজ্যের নামানুযায়ী এই নদীর নামকরণ করা হয় আলংগাতি (Alangati) নদী। M. Geddes-এর History of the Church of Malabar ও Letter of

Dom Fr. Bernardo do Jesus, Archbishop of Verapoli. Ernecolam থেকে এই তথ্যই পাওয়া যায়।

৩। ভাইপিন (Vaypien)—কোচিন শহরের উত্তরে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

৪। আন্‌জেকোয়েমল (Anjiquaimal) বা Ernecolam—আলংগাডি নদীর অপর পার্শ্বে কোচিনের বিপরীতে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

৫। ভাইস-প্রভিন্‌সিয়াল (Vice-Provincial)—প্রাচ্যে প্রেরিত অগাষ্টিনিয়ান ধর্মপ্রচারকগণের পৃথক কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। এটি পর্তুগালের অগাষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের (বা Province-এর) অধীনস্থ ছিল। এইজন্য ভারতে প্রেরিত ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিকে ভাইস-প্রভিন্‌সিয়াল (Vice-Provincial) বলা হত।

৬। পিপ্‌লি—উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত অধুনালুপ্ত শহর শাহবন্দর।

৭। টিউটিকোরিন—টিউটিকোরিন (Tuticorin)

৮। In Viam Pacis—কোথাও যাত্রার প্রাক্কালে পর্তুগীজ মিশনারীরা যে প্রার্থনা করে তার প্রথম বাক্যটি In Viam Pacis এই শব্দগুলি দিয়ে আরম্ভ। সেইজন্য এই অনুষ্ঠানটির নাম In Viam Pacis.

৯। পরকা—(Porca) পরাকদ (Porakad) বা পুরাখদ (Purakhadu)—ত্রিবাঙ্কুর উপকূলে কোচিন ও কোলন শহরের মধ্যবর্তী একটি শহর। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এখানে পর্তুগীজ ও ডাচ বণিক সম্প্রদায়ের যথাক্রমে একটি দুর্গ ও ফ্যাক্টরী ছিল। Fra Paolino (1706) পরকাকে একটি জনবহুল শহর বলে বর্ণনা করেছেন।

১০। কোলন—(Quilon) কুইলন প্রদেশ।

১১। চান্দিকান (Chandikan)—হুগলী নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত অঞ্চল চান্দিকান প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। সাগর দ্বীপের নিকটে হুগলী নদীর একটি শাখাকে River of Chandikan বলা হ'ত।

১২। হোলি ট্রিনিটি দিবস (Holy Trinity Day)—ইষ্টার পর্বের পরবর্তী সপ্তম রবিবারকে বলা হয় Whit Sunday (উইট্‌ সনডে)। এই Whit-Sunday'র পরবর্তী রবিবারই হল হোলি ট্রিনিটি দিবস।

১৩। লস্কর (Lascar)—নাবিক

১৪। Bl. John of Sahagun —একজন অগাষ্টিনিয়ান ধর্মযাজক বা সাধু।

১৫। মুসুনডুলিম (Musundulim of Anjilim) মুসুনডুলিম শব্দটি মুসলমান (Mussalman) শব্দের বিকৃত রূপ। বান্দ্রিক হিজলী প্রদেশের রাজাকে মুসুনডুলিম বা মুসলমান বলে বর্ণনা করলেও তাঁর বিবরণী থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় না সে সময়ের হিজলীর রাজা মুসলমান, না হিন্দু। তবে তিনি যে চাকার নবাবের অধীনস্থ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৬। এ্যাঞ্জেলিম (Anjelim) হিজলী—বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল।

১৮। ফীবাস (Phoebus)—গ্রীসদেশের সূর্য-দেবতা

১৮। Vicar de la Vara of the Bishop of Muliapur—

পর্তুগালের রাজার অনুরোধে ভারতের গোয়া শহরের মেলিয়াপুর অঞ্চলে একটি Bishoprie (বিশপের এলাকা) স্থাপন করা হয়। তাঞ্জোর, নেগাপটম, মসুলিপটন ও বাংলা প্রভৃতি অঞ্চল এই বিশপের এলাকাভুক্ত ছিল। এইসব অঞ্চলে যে ধর্মপ্রচারকগণ প্রেরিত হতেন তাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ব্যক্তি তাঁকে Vicar বা বিশপের (মেলিয়াপুরের) অধীন বলা হত। এইসব Vicar তাঁদের পদ মর্য্যাদার পরিচায়ক হিসাবে একপ্রকার চাক্‌তি ব্যবহার করতেন তাকে Vara বলা হত। Frai Emanual Esparanca বাংলাদেশে প্রেরিত অগাস্টিনিয়ান ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রধান এবং তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন গোয়ার পর্তুগীজ বিশপ। সেইজন্য তাঁকে Vicar de la Vara of the Bishop of Miliapur বলা হত।

১৯। সাইবো-সুব্বা (Saibo-Subba) — আশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। 'সুবাদার' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ Subba। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে পদস্থ সামরিক কর্মচারীকে সুবাদার বলা হয়। Saibo (Sahib) কথাটির অর্থ প্রভু বা প্রধান।

২০। আদিয়া (Hadia)—একজাতীয় উপহার। এই উপহারে ভেড়া বা খাসী উপহার-দ্রব্যরূপে প্রেরণ করা হ'ত। সেকালে এই প্রকার উপহার দিতে গেলে এই ভেড়া বা খাসীর সঙ্গে ঘি, মসলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি দ্রব্য পাঠাতে হ'ত যেগুলি এই ভেড়া বা খাসীর মাংস রান্নার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। যেসব ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি পাঠান সম্ভব হত না সেক্ষেত্রে

উপহারের সঙ্গে কিছু টাকা দেওয়া হ'ত এই দ্রব্যগুলির মূল্য হিসেবে। যেমন একজন গোঁড়া হিন্দু কখনও পৈঁয়াজ স্পর্শ করতো না। কাজেই নীতিগতভাবে এই দ্রব্য কাউকে পাঠানও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইসব ক্ষেত্রে কিছু টাকা পাঠান ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকত না।

লালা লাজপত রায়ের আত্মকথা

অনুবাদক—কিরণ মৈত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সানফ্রানসিস্‌কোয়

এপ্রিলের গোড়ার দিকে সানফ্রানসিস্‌কো পৌঁছে মার্কেট ষ্ট্রীটের একটি হোটেলে উঠলুম। সপ্তাহ খানেক কোন হিন্দুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলুম না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় মার্কেট ষ্ট্রীটে রমেশ ও মহেশচন্দ্রর খপ্পরে পড়লুম। যুবক দুটি তাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে আমাকে ঠিকানা দিয়ে বললো আমি যেন ওদের অন্যান্য দুঃখী ভাই বোনদের দেখতে যাই। ঠিক করে বলতে পারছি না প্রথম যখন ওদের বাড়ী যাই শিবপ্রসাদ গুপ্ত আমার সঙ্গে ছিলেন কি না। কিন্তু বেশ মনে আছে রামচন্দ্রের সঙ্গে আমার সেইখানেই প্রথম দেখা। প্রথম দর্শনেই রামচন্দ্রের সঙ্গে খটাখটি লেগেছিল। দয়ানন্দ ও আর্যসমাজ সম্পর্কে ও এমন সব কটূক্তি করতে থাকে, আমি প্রতিবাদ না করে পারলুম না। বুঝলাম ওর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতের কোন মিল নেই। এর পরেও রামচন্দ্র আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছে। তার বাড়ীতে আমাকে কয়েকবার নিয়ে গেছে ওর স্ত্রীর হাতের রান্না খাওয়াতে। আমার বাড়ীতে দু'বার এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনাও হয়েছে। ভারত সম্পর্কে জার্মানদের পরিকল্পনার বিষয়ে অনেক ভালো ভালো কথা ও আমাকে শুনিয়েছে, কিন্তু ওদের সব উদ্ভট পরিকল্পনা আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল করাচীতে জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো। আমায় বললো জার্মানদের সে জানিয়েছে শত সহস্র ভারতীয় ওখানে প্রস্তুত থাকবে, অস্ত্র হাতে পেলেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে। তার ভয় হচ্ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত অস্ত্রগুলো হাতে নেবার লোক পাওয়া যাবে না এবং জার্মানদের চোখে ও হেয় হবে। তার অনুচরদের ঠকানোর জন্যে আমি ওকে খুব একচোট নিলাম। ওর তো আর জানতে বাকী ছিল

না যে সৈন্যবিভাগ বাদ দিলে গোটা পাঞ্জাব ও করাচী মিলিয়ে ৫০০০ লোক জুটবে না যারা জীবনে রাইফেল দেখেছে, মেশিনগান তো দূরের কথা।

কথাটি সে স্বীকার করল কিন্তু কারণ দেখালো জার্মানদের সাহায্য পেতে হলে ওছাড়া উপায় ছিল না। রামচন্দ্র সম্পর্কে যা ধারণা হ'ল, তা সংক্ষেপে এই—একটা রাম জুয়াচোর; ন্যায়ধর্মের কোন বালাই নেই। আগাগোড়া বাউণ্ডুলে ও অরাজকতার পক্ষপাতী। জাতীয়তাবাদী তো মোটেই ছিল না। ভারতবর্ষের জন্যে এতটুকু চিন্তা ওর ছিল বলে আমার মনে হয় না। আমার সন্দেহ হয় সে কারো পরোয়া করতো কি না। ওর মূল মন্ত্র ছিল "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"। অর্থ ও ক্ষমতাই ওর একমাত্র কাম্য। নিজের স্ত্রীকেও ভালবাসতো কি না সে সম্পর্কে আমি সন্দিহান। খোলাখুলি স্বীকার করতো ওর কুষ্ঠীতে সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এসবের কোনও স্থান নেই। ভালোমন্দের কোন বিচার ছিল না। ওর মুখেই শুনলাম হরদয়ালও ঐ প্রকৃতির ছিল। কিন্তু আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। হরদয়াল যে কত অসাধু ও সুবিধাবাদী ছিল তার অনেক কাহিনী শোনালো। শিখদের তুষ্ট করার জন্য কখনো সে গ্রন্থ-সাহেব-এ মাথা ঠেকাচ্ছে, কখনো আর্যসমাজীদের দলে ভেড়াবার জন্যে নিজে আর্যসমাজী সাজছে। তিনমাস ধরে রামচন্দ্রকে দেখে দেখে আমার চেনা ধরে গেছে। ধীরে ধীরেই আমি ওকে জানতে পেরেছিলাম। ও আমাকে ধরে বসেছিল দু'একজন লোক দিতে যারা ওর বাণী ভারতবর্ষে পৌঁছে দেবে। দু'জনের নাম বললাম এবং ওরা যখন এসে সানফ্রানসিস্কো পৌঁছালো আমি তাদের এ ব্যাপারে আমার মতামত খোলাখুলি জানালাম। নিজে আমি কোনও কাজ তো দিলামই না, বরং তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে রামচন্দ্রের মতলব হাসিল করাতে আমার কোন আগ্রহ নেই এবং তারা যেন এই ভেবে কাজ না করে যে আমিই করতে বলেছি। দুজনেরই হাতে টাকা পয়সা ছিল না অথচ ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাইছিল। কাজেই সহজেই ওর খপ্পরে পড়ল। রামচন্দ্র তাদের পাওনা ছাড়াও অনেক টাকা দিল। তারাও ঐ পথেরই পথিক যদিও সাময়িকভাবে আমার কথায় তারা এ পথের সাফল্য সম্বন্ধে দ্বিধায় পড়ল।

তাদের সোজাসুজি বললুম জার্মানদের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হতে পারে তাতে আমি খুসীই হব। বিশ্বাস করলুম স্বাধীন না হয় হলো, কিন্তু জার্মানরাও হাত তুলে বসে থাকবে না। ভারত দখল করে ইংরেজদের চাইতেও কুটীলভাবে দেশের রক্ত শোষণ করবে। রামচন্দ্র এবং হেরম্ব গুপ্ত দুজনের কাছেই শুনেছি ভারত স্বাধীন হলে ভারত জার্মান সম্পর্ক কি কি সর্তের উপর নির্ভর করবে। শুনে আমার মুখ থেকে ব্যঙ্গের হাসি ছাড়া কিছু বেরোয় নি। রামচন্দ্র স্বীকার করল জার্মানদের সাহায্য নিয়ে ভারত স্বাধীন হবে না। তবে ওর তাতে কিছু যায় আসে না। জীবনের কোন মূল্য নেই ওর কাছে। তার আসল লক্ষ্য ছিল আমেরিকা থেকে সব নামজাদা হিন্দুদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এখানে একজন কেউকেটা হয়ে থাকবে।

আমেরিকা ছেড়ে যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের অনেকে বিষয় সম্পত্তি টাকা পয়সা ওর কাছেই গচ্ছিত রেখে গেছেন। ওর হাতে এই ভাবে হাজার হাজার টাকা জমেছে এ রকম একটা আভাস পেলাম। অবশ্য টাকাটা গদর পার্টির ট্রাস্টী হিসাবেই ওকে দেওয়া হয়, যদিও পার্টির টাকার অভাব ছিল না। জার্মানদের কাছ থেকে ও টাকা পেত। ও ভয়ানক বাঙ্গালী বিদ্বেষী ছিল। হরদয়ালকে বলতো বখাটে মিটমিটে শয়তান। আলাপ পরিচয়ের মাসখানেকের মধ্যেই ও সাড়ে তিন হাজার ডলার আমার হাতে দিয়ে বললো ভাই পরমানন্দ এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মামলা চালানোর জন্যে টাকাটা আমি যেন পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দিই। টাকাটা গদর পার্টির এবং দরকার হলে আরও পাওয়া যাবে তাও জানালো। সরাসরি জানালাম টাকাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছবে কি না জানি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করবো না। টাকাটা ভারতবর্ষে কাউকে দেওয়া হয়নি। এখনো আমার কাছেই রয়েছে। জাপান যাবার সময় কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিবার-এর হাতে আমি বিশ্বাস করে রেখে যাই। আসলটা ঠিক রেখে সুদটা খরচ করেছি। নিউইয়র্কে ফিরে এসে মিঃ কুইন-এর মারফৎ টাকাটা কিউবা সুগার প্রেফারড স্টক-এ খাটালাম। এ বছরের গোড়ায় দাম যখন প্রায় সত্তর এ নেমেছে, তখন সাড়ে বাহাত্তর হিসাবে অর্ধেক

বেচে দিলাম। বাকী অর্ধেক রয়ে গেল। এইভাবে টাকা খাটানোটাই আমি নিরাপদ বলে মনে করলাম।

জুন মাসে "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা শেষ হলে রামচন্দ্র—যাকে আমি বইটি সম্পর্কে আগে বলেছিলাম—ছাপার কাজে সাহায্য করবে বলে জানাল। এক দিন এক ভদ্রলোক (ভারতীয়) এসে হাজির এবং আমাকে খরচা বাবদ ৬০০ ডলার দিল। বই ছাপার আগে সে পড়েও দেখেনি। পড়ার পর ওর দুঃখ হল কেন বই ছাপাবার টাকাটা দিয়েছিল। বিদ্রোহীদের সম্পর্কে বইটিতে যে-সব মতামত আমি প্রকাশ করেছি, তা তার পছন্দ হয়নি। ৬০০ ডলারের মধ্যে ২০০ ডলার দিলাম টাইপিষ্টকে পাণ্ডুলিপি তৈরী করা বাবদ এবং ৪০০ ডলার দিলাম কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [এ. ইউ] পোপকে একজন প্রকাশক খুঁজে দেবার জন্যে। অধ্যাপক পোপ পাণ্ডুলিপিটি "নিউ রিপাবলিক"এর ওয়াল্টার লিপম্যানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আবার কয়েকজন প্রকাশকের দরজায় ধর্না দিয়ে শেষ পর্যন্ত (বি. চব্লিউ) হিউবস-এর হাতে সঁপে দিলেন। এই হল "ইয়ং ইণ্ডিয়া" প্রকাশের কাহিনী।

মে মাসে যখন সানফ্রানসিস্‌কো ছেড়ে শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও বিনয় সরকারের সঙ্গে জাপান যাবার উদ্যোগ করছি, খবর পেলাম মুন্সীরামের৮ ছেলে হরিশচন্দ্র কালিফোর্নিয়ায় আসছে। ওর কাছ থেকে মহেন্দ্র প্রতাপের৯ খবর নেবার জন্যে খুব উৎসুক ছিলাম বলে যাওয়া স্থগিত রাখলাম। মে মাসের মাঝামাঝি শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও বিনয় সরকার রওনা হয়ে গেলেন। হরিশচন্দ্রের আশায় আমাকে আরো কয়েক সপ্তাহ থাকতে হল। বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবী দলের মুখপাত্র বলে পরিচয় দিয়ে হরিশচন্দ্র বললো, তাকে টাকা নিয়ে ভারতবর্ষে যেতে হবে। তাকে ঐ কাজটি করতে মানা করলুম। ৩রা জুলাই সানফ্রানসিসকো ছেড়ে ইয়োকোহামার পথে রওনা হলুম। সানফ্রানসিস্‌কোয় হরিশচন্দ্র রামচন্দ্রেরই ঘাড়ে থাকা খাওয়া সারছিল। আমার কাছ থেকেও ৫০ ডলার ধার নিয়েছিল।

সানফ্রানসিসকোয় গদর আশ্রমে কখনো যাইনি বা তাদের সভাতেও যোগ দিইনি। তবে ওখানকার মুসলমান কর্মীরা আমাকে যে নৈশ ভোজনে আমন্ত্রণ

জানায় তাতে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানেও রামচন্দ্র আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে তীব্র সমালোচনা করে আর যে-সব হিন্দুদের সঙ্গে সানফ্রানসিসকোয় দেখা হয়েছে, তাঁদের কেউই উল্লেখযোগ্য নন। শুধু আমার দেশভক্তির কথা শুনেই ওঁরা দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের কেউই ইংরেজ ভক্ত ছিলেন না। সকলেই প্রায় জার্মান ভক্ত এবং ইংরেজ ও ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরোধী। খুব অল্প জনই নম্রভাবে কথা বলতেন। বাঙ্গালীরা উগ্র বিপ্লবী। সক্রিয় বিপ্লবপন্থী যাঁরা তাঁদের কথাবর্তায় দেশপ্রেমের চাইতে পেশাদারীর ভাবটাই বেশী প্রকট মনে হত। নেতাদের সঙ্গে দর কষাকষি করে টাকা আদায়ের ঝোঁকটাই বেশী। এঁদের একজনকে (এ. সি. সি.) ভবিষ্যতের নিরাপত্তার দাবী জানাতেও দেখলাম। এ ধরনের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সত্যি বলতে কি আমি খুব আহত হয়েছিলাম, তবে ওদের দেশপ্রেমকে আমি সন্দেহ করি না। পাঞ্জাবীদের অনেককে ভালো মনে হল। এ ধরনের কাজে নেমে দর কষাকষি করার মতো ওরা লোক নয়। তারা সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। যে কোন শ্রেণীতে যাতায়াত করতো এবং যে কোন পোষাক হলেই ওদের চলতো, কখনো দরাদরি করতো না। তারাই সত্যিকারের "খালসা"। তাদের মধ্যে যে দুষ্ট লোক ছিল না, তা নয়। রামচন্দ্র এ রকম একজন—যার চাইতে দুষ্ট লোক আর হয় না।

জাপানে

বোধহয় ১৯শে কিম্বা ২০শে জুলাই [১৯১৫ সাল] জাপান পৌঁছলুম। শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও বিনয় সরকারের সঙ্গে দেখা হ'ল। সরকার মশায় এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম অবনী মুখার্জী[১০]। দেখলাম ওঁর ওপর আস্থা রাখা যায়। যে কদিন জাপানে থাকব ওঁকে খুব কাজে লাগবে। ভদ্রলোক জাপানী ভাষা জানেন। হাতে পয়সাকড়ি না থাকায় চট করে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হয়ে গেলেন। সরকার মশায় বললেন "ওঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলেই হবে। শুনলুম উনি নাকি

আর. কে. এস [ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জী] এর আত্মীয়। ওঁর ইচ্ছে ব্যবসাকরা।"

হাকোনে হ্রদের কাছাকাছি একটি হোটেলে ভগবান সিং[১১] ও ঠাকুর[১২] এর সঙ্গে দেখা। এদের কাউকেও আমি চিনতাম না। ঘটনাচক্রে একই হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলুন; ওরা আমাকে দেখেই চিনেছিল। ভগবান সিং আমার ঘরে আলাপ করতে এলো। আলোচনা ঝগড়ার ভেতর দিয়ে শেষ হ'ল। ওকে বললুম, ওর সঙ্গে একই হোটেলে থাকা আমার পোষাবে না, আমি এক্ষুনি চললুন। ও বললো—ওরাই চলে যাচ্ছে। ওর মুখেই শুনলাম ওর সঙ্গী ভদ্রলোক বাঙ্গালী, আমেরিকায় যাচ্ছেন। সেদিন বিকেলেই দুজনেই হোটেলে ছেড়ে চলে গেল। টোকিওতে ফিরে গিয়েই অবনীকে বললুন ঠাকুর ও ভগবান সিং-এর কথা। ওকে সাবধান করলুম যাতে ওদের কাছ থেকে দূরে থাকে। বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘোঁষবার আমার ইচ্ছে ছিল না। অবনী মিশবে না বলে কথা দিল, কিন্তু জানি কথা রাখেনি। ওর পাল্লায় পড়ে একদিন আমিও পার্কে গিয়ে ভগবান সিং-এর সঙ্গে দেখা করলুম। ওর মতবাদও শুনলুম। আগের মত ঝগড়া করেই বিদায় নিলুন। ভগবান সিং-এর ইচ্ছে আমি ওদের দলে যোগ দিই। আমি অস্বীকার করলুম। বললুম, দেখ বাপু, বিপদ আপদ হ'লে তোমাদের সাহায্য করতে পারি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে জোট পাকাতে পারবো না। এসব নির্বোধের মত কার্যকলাপ (যা আমার মনে হচ্ছিল) ছেড়ে যদি ভালো কোন পথ ধর, তবে দেখবো। ভগবান সিং আরও একবার আমার বাড়ী এসেছিল, তখন ওর পেছনে চর লেগেছে। সঙ্গে দুজন পুলিশ। শেষবারের মত আমাকে দলে ভিড়াবার জন্যে আকুতি জানালো। ও জাপান ছেড়ে যাচ্ছে। আমি যেন ওদের দলকে অন্ততঃ শলাপরামর্শ থেকে বঞ্চিত না করি। জাপানে ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

অবনীও ছেড়ে গেল। এরই মধ্যে কেশোরাম সতরওয়াল বলে এক পাঞ্জাবী যুবকের সঙ্গে দেখা। দেশে থাকতে ওকে সামান্য চিনতাম। আমায় বললো, ও আমেরিকায় যাচ্ছে। বাড়ী থেকে টাকা আসার অপেক্ষায় আছে। বললাম, জাহাজ ভাড়ার বাকী টাকা আমি দিয়ে দেবো, ততদিন আমার

সঙ্গে ও থাকতে পারে। ছেলেটি আমাকে চাকরের মত সেবা করেছে। তাই বিপ্লবীদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে জানতে পেরেও আমি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারিনি। ওই-ই বোধহয় ঠাকুরকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল বিপদে সাহায্যের জন্যে। ওকে ছেলের মতো ভালবাসতাম। ঠিক করেছিলাম ওকে কখনো ত্যাগ করবো না। এ সময়েই ভগবান সিং পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ ছাড়লো। ঠাকুরের তখন সঙ্গীন অবস্থা। ওর হাতে প্রচুর টাকা—ধরা পড়লে সব টাকাই যাবে সে ভাবনাতেই অস্থির। একদিন আমাকেই ধ'রে পড়লো টাকাগুলো বাঁচাতে। বললো—টাকাটা ওর নিজেরই, আমেরিকায় ব্যবসা করতে যাচ্ছিল। বললাম—তাহা মিথ্যা কথা, টাকাটা ওর নিজেরও নয় বা ব্যবসার উদ্দেশ্যেও নয়। শেষপর্যন্ত স্বীকার করলো যে টাকাটা বিপ্লবীদের। ওর বক্তব্য—আমি ওদের মত বা পথ না মানতে পারি কিন্তু টাকাটা বাঁচাতে সাহায্য করতে আপত্তি কোথায়। কেশোরাম ওঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় আমাকে হার মানতে হ'ল। মোট ২১,৫০০ ইয়েন আমার কাছে রাখলো। কয়েকদিন পর ২,০০০ ইয়েন নিয়ে নেওয়ায় জাপান ছাড়ার সময় মোট ১৯,৫০০ (উনিশ হাজার পাঁচশো) ইয়েন আমার কাছে থাকলো। ঠাকুর তখন পলাতক। জাপান সরকার হেরম্ব গুপ্তের বিরুদ্ধে বিতাড়নের আদেশ জারি করেছে।

ঠাকুর-এর সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম ও সন্ত্রাসবাদী ; তবে অদূর ভবিষ্যতে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষ পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করে না। আমি তাকে অনুরোধ করলাম ওদের গোপন কথা ফাঁস না করতে। ও তেমন কিছু আর বলল না। ওর সাহস ও চরিত্র সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা হল।

হেরম্ব গুপ্তের সঙ্গে জাপানে ঠিক কবে দেখা হয়েছিল মনে নেই ; বোধহয় অক্টোবরের কোন এক সময়ে। জাপানীদের সহায়তায় ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যই ও এসেছিল সে কথাই জানালো। অবশ্যই জার্মানরাই ওকে পাঠিয়েছে এবং ওরাই ওর খরচা দিয়েছে। এবার ওদের দলে আমাকে ভেড়াবার জন্যে আর চেষ্টা করল না বটে, তবে পরামর্শ চাইল জাপানে কিভাবে ইংরেজবিরোধী প্রচার কার্য চালানো যায়। ওকে খোলাখুলি

বললাম ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অপসারণের জন্যে আমি সবার সঙ্গে আঁতাত করতে রাজী আছি, কিন্তু নিজেকে বিপ্লবী দলে জড়াতে কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে রাজী নই।

হেরম্ব গুপ্ত, ঠাকুর এবং আমি যার যার মতে প্রচার সুরু করলাম। আমারটাই সবচেয়ে বেশী জোরদার হয়েছিল। কারণ আমার ভাষা ছিল ঝরঝরে ও নরম নেজাজের। টোকিও এবং ইয়োকোহামায় প্রায় সব কাগজেই আমাদের প্রবন্ধ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে ছাপত। ঐ সময়ে সব নামকরা সংবাদপত্রগুলোই ছিল ইংরেজবিরোধী। দেখেছি প্রায় সব শিক্ষিত জাপানীদের মনেই ইংরেজবিদ্বেষ ভরা, কিন্তু অনেকেই প্রকাশ্যে কোন্দলের পক্ষপাতী ছিল না। সন্দেহ হয় ১৯১৫ সালে ইঙ্গ-জাপান আঁতাত শতকরা একজন শিক্ষিত জাপানীকে কখনো উদ্বুদ্ধ করেছে কি না। ওরা বলে এশিয়াতে ওদের প্রসারের একমাত্র বাধা হচ্ছে ইংরেজ এবং ইংরেজরাই ওদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান প্রতিবন্ধক ইত্যাদি।

এক নৈশভোজনে প্রায় কুড়িজন জাপানী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ হল। আমাকে আপ্যায়িত করার জন্যেই ঐ নৈশভোজনের আয়োজন। যতদিন জাপানে ছিলাম ততদিনই জাপানী পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছি। ওদের দপ্তরে প্রায়ই গিয়ে নানাভাবে সৌজন্য প্রকাশ করেছি। ওয়াসেদা ও কিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ বাণিজ্যিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে যে সব বক্তৃতা আমি দিই তার ফলে জাপানী যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ে। এসব কাজে টোকিওর অন্যান্য জাপানীরাও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে। যদিও হেরম্ব গুপ্ত অথবা ঠাকুরকে কখনো আমার বাড়ীতে আসতে দিইনি তবে কয়েকবার কোন কোন জায়গায় ওদের দেখা পাই। অন্যান্য ভারতীয়রা আমার সঙ্গে প্রায় দেখা করতে আসতো। ওরা দু'-দু'বার আমাকে সম্মান দেখাবার জন্য নৈশভোজনের আয়োজন করে।

উঁচুতলার মানুষদের মধ্যে জাপানের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য এবং দু'একজন নামজাদা রাজনীতিবিদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ওয়াসেদা ও কিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়

হয়। কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে ; বিশেষ করে ওয়াসাদায় অধ্যাপক এ্যাবে এবং কিয়োতে অধ্যাপক হোয়াটনেকের সঙ্গে। কিয়ো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভাপতি আমাকে মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ জানান এবং ওঁর ক্লাবেও কয়েকবার নিয়ে যান।

মনে হয় হেরম্ব গুপ্ত জাপানে আসার একমাসের মধ্যেই পুলিশ ওর পিছনে লাগে। ওর আর ঠাকুরের পিছনে সব সময়েই দেখেছি দুজন পুলিশ ; অবশ্য ওরা ইচ্ছে করলেই যখন খুসী পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারতো।

নভেম্বর মাসে জাপান সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে জাপানে ভারতীয়দের এক ভোজসভার আয়োজন করার সুযোগ এলো। প্রায় একশ' লোক হয়েছিল। তারমধ্যে অর্ধেক জাপানী রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক এবং সাংবাদিক। আমাকে সভাপতি হতে অনুরোধ করা হল। অপ্রীতিকর ঘটনার হাত থেকে দূরে থাকার জন্যে একটি সর্তে রাজী হলাম যে আর কোন ভারতীয় ভাষণ দিতে পারবেন না এবং কোন রাজনীতি আলোচনা হবে না। বস্তুতঃ কোন ভারতীয় ভাষণ দেন নি। সভাপতি ছাড়া আর যারা বক্তৃতা দেন তারা সবাই জাপানী। ভোজসভা ধুমধামের সঙ্গে শেষ হল।

পরের দিনই হেরম্ব গুপ্ত ও ঠাকুরের উপর পাঁচদিনের মধ্যেই দেশ ছাড়ার হুকুম জারি হ'ল। সংবাদটি জাপানবাসী ভারতীয়দের সচকিত করে তোলে। এ ব্যাপারে কয়েকজন বড় নেতার সঙ্গে দেখা করে জানলুম যে আদেশ মানতে গেলে এঁদের ইংরেজের হাতে পড়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। একখানি মাত্র জাহাজ ছিল যা ইংরেজদের নয়, ওটাতে করে সাংহাই অবধি গেলেই বন্দরেই ওদের গ্রেপ্তার অনিবার্য। সংবাদপত্র থেকে এর প্রতিবাদ জানানোর জন্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রতিনিধি পাঠানো হল এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদরাও এ নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উথাপন করলেন। দেশের জনগণের মধ্যে এই সরকারী হুকুমনামার বিরুদ্ধে দেখা দিল তীব্র ঘৃণা। আমার অনুরোধে অধ্যাপক এ্যাবে এবং অধ্যাপক শিবুসুরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তখন অসুস্থ ও শয্যাগত। প্রধান মন্ত্রী এই ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই কাজ করেছেন। হুকুম যখন জারিই হয়েছে তাকে বদলাবার উপায় নেই। তবে এমন ইংগিত দিলেন

যদি ওরা লুকিয়ে কিম্বা পালিয়ে যেতে পারে তবে জাপান সরকার এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকবে। হুকুম বাতিল এবং বদবদল করার সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হ'ল তখন একজন জাপানী সাংবাদিক ভরসা দিলেন, ওঁদের নিরাপত্তার সব ব্যবস্থাই করা হবে। অবশ্য ভেতরের কথা আমাকে জানানো হয় নি, আমিও জানতে চাইনি। আদেশমত দেশ ছাড়ার শেষ দিন দুজনে গিয়ে উঠলেন জাপান পার্লামেন্টের এক হোমরা চোমরা নেতার আশ্রয়ে। পুলিশ গিয়ে বড়কর্তাদের খবর দিল। কিন্তু বাড়ী সার্চ করে কাউকে পাওয়া গেল না। বাড়ীর মালিক কোন কথা বলতে বেমালুম অস্বীকার করলেন। সরকারও তাঁর বিরুদ্ধে বিধান জারির চেষ্টা করল না, নিম্নপরিষদে তিনি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। জাপানী জনমত হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। তাদের ধারণায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আদেশ জাপানের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে। অবশ্য এরপরও অনেকদিন পর্যন্ত পুলিশের তল্লাসি চলেছে এবং সব হিন্দুদের উপরই চোখ রাখা হয়েছে। আমিও বাদ পড়িনি। আমার বাড়ীতেও পুলিশের পাহারা বসেছে। যখনই বেরুই পেছনে দু'জন কনেষ্টবল। প্রতিবাদ জানানোতে বন্ধুদের হস্তক্ষেপে পুলিশি ফেউ বন্ধ হ'ল। এরই মধ্যে আমেরিকার টিকিট কাটলুম। এই সব হাঙ্গামার অনেক আগে। অক্টোবরেই এই ব্যবস্থা করেছিলুম। দেশে ফেরার ইচ্ছে হল না এবং জাপানেও ঠিক মন বসছিল না। ওদের ভাষা বুঝি না। যদিও নানান দিক থেকে জাপানের আকর্ষণ আমার কাছে অনেক, তাছাড়া, ইঙ্গ-জাপান আঁতাত আমার নিরাপত্তায় আমাকে সন্দিহান করে তুলেছিল। সবদিক ভেবেই ঠিক করলাম আমেরিকা যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তাই আসন সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে টিকিট কেটেই ফেললাম। ১২ই ডিসেম্বর ইয়োকোহামা থেকে জাহাজ ছাড়ল। জাপানের ভারতীয়রা সাড়ম্বরে আমাকে বিদায় দিলেন। নানা দিক থেকে তাঁরা সাহায্যও করেছেন। ১১ই ডিসেম্বর ওয়াসাদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছ'জন অধ্যাপক আমাকে নৈশভোজনে আপ্যায়িত করেন নিপন ক্লাবে। প্রধানমন্ত্রীর এক বার্তা নিয়ে ওঁরা হাজির—আমার কোন ভয় নেই এবং জাপান ছেড়ে যেন চলে না যাই। বস্তুতঃ ওঁরা চাপ দিচ্ছিলেন আমার যাওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু জানালুম তা হয় না। জাপান সফরের এইখানেই শেষ।

আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন

১৯১৫ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে বোধহয় ২৭শে, ২৮শে কিম্বা ২৯শে সানফ্রানসিসকোয় পৌঁছলুম। বাগাই ও সায়গল-এর সঙ্গে এখানেই দেখা হ'ল। সায়গলের বাবাকে সেশেই চিনতাম আর বাগাইকে জাপানে দেখেছিলাম। বাগাই তখন সায়গলকে সঙ্গে করে আমেরিকায় যাচ্ছিল। বাগাই বললো, রাজনৈতিক কারণেই সে দেশ ছেড়েছে এবং ভারতে থাকা তার পক্ষে বিপজ্জনক। টাকা পয়সা জোগাড় করে সে আমেরিকায় চলে এসেছে ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে পাকাপাকি এখানেই থাকবে বলে। সঙ্গে বৌ ও ছেলেপুলে নিয়ে এসেছে। ওকে জাপানে থাকবার কথা বলেছিলাম, কিন্তু ও রাজী হয়নি। আমেরিকায় ফিরে এসে আমি ওকে বিশ্বাস করে জাপান থেকে নিয়ে আসা ১৯,৫০০ ইয়েন এর কথা বললাম। তার পরামর্শ মত ১৯,৫০০ ইয়েন এবং ১০,০০০ টাকা যেটা জাপানে থাকার শেষদিকে ছেলের কাছ থেকে পাওয়া টাকা থেকে খরচখরচা বাদ দিয়ে বেঁচেছিল, সবই ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং করপোরেশনে জমা দিলাম। বাগাইকে বললাম, আমার ধারণায় সায়গল একজন গুপ্তচর। দিনকয়েকের মধ্যেই বাগাই সায়গলের কথাবার্তা শুনে আমার মতেই সায় দিল। বাগাই এর সঙ্গে রামচন্দ্রের তখন খুব মাখামাখি। রামচন্দ্রের সঙ্গে ওর বাড়ীতেই দেখা হয়েছে। আমার বাড়ীতেও রামচন্দ্র এসেছে। যতই দেখা হতে লাগলো ততই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। ওদের পার্টিতে তখন ভাঙন ধরবো ধরবো করছে। যারা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে ছিল তারা দলের খরচের হিসাব-নিকাশ চাইল এবং দলের ওপর আরো বেশী আধিপত্যের দাবী জানালো। রামচন্দ্র কোনোটাতেই রাজী হ'ল না। ও আমাকে ধরে পড়ল ওর বিরোধী পক্ষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর বিরুদ্ধে অনুযোগগুলো তুলে নিতে। আমি অস্বীকার করলাম। ইতিমধ্যে "বসন্ত-পঞ্চমী" উপলক্ষে বাগাই ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা এক উৎসবের আয়োজন করল। আমাকে সেখানে কিছু বলতে অনুরোধ করল। আমি রাজী হলাম। আমার বলার পর রামচন্দ্র বলতে উঠে গদর পার্টির জন্যে আমার সহানুভূতির কথা উল্লেখ করে গভীর আনন্দ প্রকাশ করল। ওটা কেবল আমাকে দলে

ভেড়াবার চাল। বন্ধুদের সঙ্গে ও গোপনে ফন্দী এঁটেছিল যদি আমি চুপচাপ থাকি ওরা ধরে নেবে আমি ওদেরই দলের। তাতে আমার নাম ভাঙাবার সুবিধে হবে। যদি প্রতিবাদ জানাই তা হলে আমেরিকাস্থ ভারতীয়দের ওপর আমার প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমি ওদের বিরোধিতা ক'রেও কোন ক্ষতি করতে পারবো না। আমি ওদের চাল ভণ্ডুল করতে কিছুমাত্র দেরী করলাম না—পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলাম গদর পার্টির প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই। এর পর প্রকাশ্য ভাষায় রামচন্দ্র প্রথমে যা বলেছিলেন তা ব্যাখ্যা করে একরকম ক্ষমাই চেয়ে নিলে। এই ঘটনার পর রামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা আরো বেড়ে গেল। তবুও ও মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সে দেখা করতে ছাড়েনি। ইতিমধ্যে ওর বিপক্ষদল আমার কাছ থেকে শলাপরামর্শ নিতে লাগলো। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও "হিন্দুস্থানী ষ্টুডেণ্ট" এর সম্পাদক একজন বাঙ্গালী শ্রী এ. সি. চ. একদিন আমার কাছে এল আমার সম্পাদনায় একটী উর্দ্দু কাগজ বের করার প্রস্তাব নিয়ে। সে একথাও জানালো যে কাগজের জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। আমি এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে চাইলাম না। বলে দিলাম, বার্কলেতে আমি শুধু পড়াশুনা করতেই এসেছি। মিঃ হিউবন্ এর অনুরোধে টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি আমার 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' যে সমালোচনা করেন এবং গত বছরের গোড়ার দিকে বইটি লেখা শেষ হবার পর থেকে যেসব ঘটনা ঘটে তার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি তখন পাণ্ডুলিপি সংশোধনে ব্যস্ত। তাছাড়া প্রচুর পড়াশুনা করছিলাম, ভারতবর্ষের ওপর আর একখানি বই লেখার জন্য। বার্কলেতে চার মাস কেটে গেল। শেষ মাসটায় কিছুদিন হাসপাতাল ও কিছুদিন স্যানেটোরিয়ামে কাটল। তিনমাস লেখাপড়ার চাপে মাথা তুলবার সময় পাইনি। অনেক পীড়াপীড়ি ও প্রলোভন সত্বেও গদর পার্টির দলাদলি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলাম। এই সময় দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপন করার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্যে একজন লোক পাঠানো নিয়ে আমাদের জল্পনা কল্পনা সুরু হল। এ ব্যাপারে ডাঃ কে. ডি, শাস্ত্রী ও এইচ, এম্, রক্ষিত সাহায্য করছিলেন। এতে

রামচন্দ্র বেজায় খাপ্পা হল। তার মতে গদর পার্টির সমর্থকদের টাকা পয়সা অন্য খাতে ব্যয় করার এটা আরেক চেষ্টা।

মার্চ এপ্রিল-এ কালিফোর্ণিয়ার নানান জায়গায় গদর পার্টির সমর্থকদের কতকগুলো সভা হয়। সব সভাতেই রামচন্দ্র ও সায়গল আমাকে গদর আন্দোলনের বিরোধী বলে প্রচার করে। গদর পার্টির কেউ যেন ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে আমার সাহায্য নিতে না আসে, সেটাই ওদের আসল উদ্দেশ্য। বাগাইও রামচন্দ্রের পাকা সাকরেদ এবং আন্দোলনের একজন পাণ্ডা। গদর পার্টির এই দলাদলির ভেতর নিজেকে জড়াবার এতটুকু ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই কালিফোর্ণিয়া ছেড়ে চলে এলাম নিউইয়র্কে। কালি-ফোর্ণিয়া ছাড়বার ঠিক আগেই জাপান থেকে এক তার পেলাম ১০,০০০ ইয়েন পাঠিয়ে দেবার জন্য। তার মে ঠাকুরের ইচ্ছে অনুসারে টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার করে ৫,০০০ মার্কিণ ডলার ইয়োকোহামায় এইচ্. রক্ষিতের নামেই পাঠালাম। সেদিন রাত্রেই বার্কলে থেকে রওনা হলাম। ২১শে মে নিউইয়র্ক পৌঁছি। পথে সপ্তাহখানেক কাটালাম চিকাগোয়। নিউইয়র্ক-এ এসেই প্রথম কাজ হল 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' প্রুফ দেখা। ছ সপ্তাহ এতেই কেটে গেল। এতদিন ল্যাথাম হোটেলেই ছিলাম। আর. কে. খেমকা এবং পি. এন্. সিংহা প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। জুলাইতে ৭২ নং স্ট্রীটে একটি ঘর নিলাম। সেখান থেকে আবার ৭৯ নং স্ট্রীটের কাছাকাছি ওয়েস্ট-এণ্ড-এভেন্যুতে ঘর নিয়ে চলে এলাম। এই সময়ের সঙ্গী ছিলেন পি. এন. সিনহা। ওয়েস্ট-এণ্ড-এভেন্যুতে থাকতেই খবর পেলাম হরিশ্চন্দ্র আমেরিকায় ফিরেছে। আমি ও সিনহা দুজন মিলে ওর খোঁজ করতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত ওয়ালিক হোটেলে ওর পাত্তা পাওয়া গেল। ১৯১৫ সালের ১৫ই জুন আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল সানফ্রানসিস্কোয়। এরপর যা কিছু ও করেছে বা ওর কানে গেছে তার পুরোপুরি বর্ণনা আমায় এসে শোনালো। ও বলতে লাগলো—১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ও একজনের কাছ থেকে ৪,০০০ ডলার পেয়েছিল। তিনি হিন্দু জার্মান ষড়যন্ত্রের দালাল। টাকাটা নিয়ে ও ইংলণ্ডে গেল কিন্তু সেখানে ধরা পড়ে ১০ দিন জেল খাটতে হয়েছিল। তার ওপর হুকুম হল ইংলণ্ড ছেড়ে যাবার। তখন

প্রথমে ফ্রান্স তারপর সেখান থেকে পালিয়ে এল সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে জার্মান রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করে সে ওদের হাতে হাত মেলালো। হরদয়াল তখন বার্লিনে। সেখানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির অন্যান্য সভ্যের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় হরদয়াল সে সময় নজরবন্দী। তার কাছে আরও শুনলাম হরদয়াল আমাকে গালিগালাজ করে একখানা বই লিখছেন। হরিশ্চন্দ্র আরও বললো যে এখন আমেরিকায় এসেছে দূর প্রাচ্যে গদর আন্দোলন জোরদার করার কাজে সে চক্রবর্ত্তীকে সাহায্য করতে। চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্রকে হুঁশিয়ার করে দিলাম এবং ওকে সাবধানে থাকতে বললাম কারণ আমেরিকায় হিন্দুদের উপর সরকারের কড়া নজর পড়েছে। সিন্‌হাকে আভাসে জানালাম যে, হরিশ্চন্দ্রের কথাবার্ত্তা এতই আজগুবি যে, সন্দেহ হয় ওকে এবারও হয়ত বার্লিন সরকার গুপ্তচর হিসাবে পাঠিয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছুদিন পর হেরম্বগুপ্তর সঙ্গে হিন্দু রেস্টুরেণ্টে দেখা। বোধ হয় আমি কিম্বা সিন্‌হা সন্দেহের কথা ওকে জানাই। সঙ্গে সঙ্গে সিন্‌হা ও গুপ্ততে বচসা সুরু হয়ে গেল। গুপ্ত আর চক্রবর্ত্তীর মধ্যে তখন চলছিল নেতৃত্বের লড়াই। গুপ্তর জাপান যাওয়ার অবসরে চক্রবর্ত্তী বার্লিন ঘুরে এসে নেতা বনে বসে। গুপ্ত ফিরে এসে দেখল চক্রবর্ত্তী ওকে আমলই দেয় না, তখন দুজনার লড়াই সুরু হল। কি করে জানি হরিশ্চন্দ্র ওকে আমার সন্দেহের কথা বলেছিল। তারপর থেকে সে আমার সম্পর্ক ত্যাগ করল। ১৯১৫ সালের জুন মাসে সানফ্রান্সিস্‌কোয় যে ৮০ ডলার ধার নিয়েছিল সেটা সে ফিরিয়ে দিল। এরপরও দুবার ওকে দেখেছি। একবার মারাঠি ছেলে পাগার এর বিয়ের নেমন্তন্নে, আরেক বার স্বামী বোধানন্দের মা'র শ্রাদ্ধে। এরপর হরিশ্চন্দ্রকে আর দেখিনি। ৫৪৭-ডব্লু-এল-২৩-এ একটি ঘর ভাড়া করলাম। সিন্‌হা ও সান্যাল বলে এক বাঙালী ছোকরা, যাকে একটু আধটু চিনতাম, আমার কাছে থাকতে এল। টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় সিন্‌হা কিছু দেনাও করেছিল। ব্রিটিশ কনস্যুলেট থেকে গুপ্তচরের কাজ করার জন্য তার কাছে প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু সে তা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। লোকটাকে এজন্যে ভালো লেগেছিল কিন্তু তার মতামত গুলো উগ্র, কথাবার্ত্তায় বাচাল, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

একা একা দিন কাটছিল, একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। তাই দুজনে একসঙ্গে থাকতে লাগলুম। চক্রবর্তী এর মধ্যে দুবার দেখা করে জার্মানী যাবার অনুরোধ জানাল আমাকে। আমি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করি। এর পর আমেরিকাতে হিন্দু ছাত্রদের জন্যে একটা হোস্টেল খুলে আমাকে তার তদারকির ভার নেবার জন্যে অনুরোধ জানালো। সে অনুরোধও রক্ষা করতে পারিনি। সিন্‌হা আর স্যান্যালকেও অনুরোধ করলো, কিন্তু তারাও আমার কথামতো তাকে এড়িয়ে গেলো। চক্রবর্ত্তীকে যে আমার পছন্দ হয় না, একথা প্রকাশ্যেই বলতাম। অন্যান্য বাঙ্গালীরাও আমার মতে সায় দিতে সুরু করল। ইতিমধ্যে মানবেন্দ্র রায় ১৩ এসে হাজির। বিপ্লবী বলে ওর পরিচয় পেলুম। আশ্রয়ের জন্যে আমেরিকায় পালিয়ে এসেছে। আমায় সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করল রায়ের কালিফোর্ণিয়ায় একজন আমেরিকান মেয়ের প্রতি অনুরাগ। মেয়েটিও ওকে ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ওর অভিভাবকেরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি বাড়ী ছেড়ে রায়ের সঙ্গে ভেসে পড়ল। মেয়েটি লেল্যাণ্ড স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। ওর এক ভাই নিউইয়র্কে এক সওদাগরী দপ্তরে কাজ করে। চক্রবর্ত্তী সমেত নিউইয়র্কের সব হিন্দু ছেলেরাই রায়কে বিশ্বাস-ঘাতকের পর্যায়ে ফেললো। ওদের মতে মেয়েটির প্রেমে পড়ে রায় দেশের কাজে অবহেলা করছিল। একরকম সবাই ওকে ত্যাগ করল। এমন কি একদিন মেয়েটি যখন ওর প্রেমিকের খোঁজে চক্রবর্তীর কাছে এল সে তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করল। কথাটা শুনেই রায় ও মেয়েটির প্রতি আমার সহানুভূতি জেগে উঠলো। ওদের বিয়ে হয়ে যাবার পর জানাজানি হল, তারপরই কিন্তু রায়ের সঙ্গে ভালো করে আমার জানাশোনা হয়েছে। ক্রমশঃ আলাপ জমে উঠল। রায়ের তখন অত্যন্ত টাকার প্রয়োজন। আমি সব সমেত ৩৫০ ডলার ওকে দিয়েছিলুম। এর মধ্যে মিসেস্ রায় আমার কিছু কাজ করে দিয়ে ৫০ ডলার শোধ করেন। এর পরই মিসেস্ রায় একটি কাজ পেলেন।

নিউইয়র্কে থাকতে কোন হিন্দুকেই আমি আতিথেয়তা থেকে বঞ্চিত করিনি, তার রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন। বাঙ্গালী ছেলেরা অনেক

সময় আমার বাড়ীতে এসে রান্নাবান্না করতো। সবাই এক সঙ্গে খেতাম, খরচটা প্রায় আমিই দিতাম। মাঝে মাঝে তারাও দিতো। এছাড়া যারই টাকার দরকার হয়েছে দিয়েছি। ১৯১৭ সালের শীতের সময় পর্যন্ত ১,০০০ ডলার এভাবে খরচ হল। বেশীর ভাগই ফেরত পাইনি। ১৯১৭।১৮ সালে যখন ধরপাকড় চলছিল, তখন আমারও ধরা পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিল। পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং সামরিক গুপ্তচর বিভাগ আমাকে প্রায় ছ মাসের জেরা করেছে। প্রায় আটকে রাখছিল আর কি! বাঙ্গালী বাদেও আরো অনেককে সাহায্য করেছি, তবে ওদের আন্দোলনে কখনো আস্থা রাখিনি। চক্রবর্তী ও হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে আমার নীচু ধারণা বদ্ধমূল হ'ল। বাগাইও স্বীকার করল, রামচন্দ্রের অনুরোধে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সে ছ মাস মাইনে নিয়েছে। হেরম্ব গুপ্তকে চক্রবর্তীর চেয়ে ভালো বলে মনে হল। ভালো ঘরের ছেলে তাই স্বভাব চরিত্র খারাপ নয়। কিন্তু একটি বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে আমার কাছ থেকে টাকা বাগাবার ফন্দী এঁটেছিল। ছেলেটির প্রতি একটু করুণা ছিল, তাই চাইতেই ওকে প্রায় সবশুদ্ধ ২০০ ডলার দিলাম। ধর পাকড়ের আগেই সান্যাল ভেগে পড়েছিল। সানফ্রানসিসকো মামলায় জড়িয়ে পড়ার আগে রায়ও নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে গেল। সানফ্রান্সিস্কো মামলার এবং হরিশ্চন্দ্রের এর পর কি ঘটেছিল তা জানা না থাকায় আর উল্লেখ করলাম না। মোদ্দাকথা বিপ্লবীদের সম্পর্কে আমার নীচু ধারণা হল। ১৯১৬ সালে জুলাই মাসে বাগাই মারফৎ ১৯,৫০০ ইয়েন থেকে আরো ২,৫০০ ডলার জাপানে পাঠালাম। বাগাই-এর চিঠি ও টাকার রসিদ আমার নথিপত্রের মধ্যে আছে।

আমেরিকায় বিপ্লবীদের সম্বন্ধে যা অভিজ্ঞতা হল তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হয়েছি। প্রাদেশিক ভিত্তিতে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি।

মারাঠি ও মাদ্রাজীদের সম্পর্কে মোটামুটি ভালো ধারণাই হল। ওরা বেশ ভদ্র, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, সৎ, দেশপ্রেমিক এবং স্বার্থত্যাগী। অবশ্য সবাই যে এই রকম তেমন বলা চলে না তবে বেশীর ভাগই ভালো বলা যেতে পারে।

পাঞ্জাবীদের ভেতর সবচেয়ে খারাপ দেখলাম রামচন্দ্র এবং হরিশ্চন্দ্রকে। শিখদের মোটের উপর সৎ বলা যায়। ওরা সংযমী ও স্বার্থত্যাগী। ওদের ভেতর সবচেয়ে দুষ্ট যদি থাকে সে ভগবান সিং। তবুও রামচন্দ্র, চক্রবর্তী কিম্বা গুপ্তের চাইতে সে অনেক উঁচুতে। আমোদ আহ্লাদে প্রচুর টাকা খরচ করলেও সে কিন্তু কখনও আখের গোছাবার জন্যে তহবিল তছরূপ করেনি। সবদিক থেকে লোকটাকে সাহসী, বিশ্বাসী, স্বদেশপ্রেমিক ও ত্যাগী বলে মনে হয়। এমন কোন শিখ বিপ্লবীকে আমি দেখিনি যাকে বিপ্লবীদলের তহবিল তছরূপের দায়ে ফেলা যায়; বরং বেশীর ভাগই জীবনের পরোয়া না করে কাজ করতো।

শিক্ষিত পাঞ্জাবীদের (ছাত্র এবং শ্রমিক) মধ্যে অনেকেই যারা তেমন দেশপ্রেমের ধার ধারত না তারা বিপ্লবীদের হাতে কখনো এক পয়সা দিয়েছে বলে শুনিনি। বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরের সংখ্যা পাঞ্জাবীদের মধ্যে বাঙ্গালীদের চেয়ে কম ছিল না।

বেশীর ভাগ বাঙ্গালীদেরই দেখছি নীতিবোধের কোন বালাই নেই—না প্রচারের ক্ষেত্রে না অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে। নগদ লাভ দেখেই ওরা দেশের কাজে নামতো; আমোদ প্রমোদে প্রচুর খরচ করত আর ভবিষ্যতের জন্যে দু'পয়সা সরিয়ে রাখার তালে থাকতো। চক্রবর্তী এবং হেরম্ব গুপ্তের কথা আগেই বলেছি। একমাত্র বাঙ্গালী এম্, এন্, রায়ের ওপরই আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা ছিল। আমেরিকায় যাদের দেখেছি অবশ্য তাদের কথাই শুধু বলছি। উচ্ছৃংখল যুবক শ্রেণী যারা শুধু জীবিকার জন্যে বিদেশে সংগ্রাম করছে, যারা নীৎসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছাচারকে জীবনের ব্রত করে চরিত্র হারিয়েছে, হঠাৎ অর্থের লোভ পেয়ে অসংযমী হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

এমন কি আমেরিকাতেও বাঙ্গালীরা প্রাদেশিকতার উর্ধে উঠতে পারেনি। সানফ্রান্সিস্কো, চিকাগো, ডেট্রয়ট, নিউইয়র্ক, বোষ্টন, আরিজোনা, মিনিও-পলিস, পিটস্বার্গ, কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখিনি। দয়াদাক্ষিণ্য, আতিথেয়তা বা অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্যে সব সময়ই ওরা তৈরী থাকতো কিন্তু কদাচিৎ তার প্রতিদানের কথা ভেবেছে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি ও মারামারি

করতো, কিন্তু অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যেতে দেরী করতো না। ওদের প্রাদেশিকতার মনোভাব কখনো যাবে বলে মনে হয় না। দেখেছি নিজেদের ওরা পরস্পর যেমন বিশ্বাস করতো, তেমনি সাহায্য করতেও এগিয়ে আসতো। নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে ওরা দিল-দরিয়া, যতদিন আমি ওদের বিশ্বাস এবং সাহায্য করেছি, ততদিন আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি এবং সম্মান দেখিয়েছে কিন্তু যেইমাত্র ওদের না জানিয়ে এবং কোন উচ্চপদ না দিয়ে আমি "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করলাম, তখনই ওরা আমাকে একঘরে করল। কেউ বা আমার বিরোধিতা করেছে মনেপ্রাণে বিপ্লবী বলে আর কেউ বা বিক্ষুব্ধ হয়েছে ওদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা দিয়ে মুনাফা করবার কোন সুযোগ না দেওয়ায়। এ কথা বলছি এজন্য যেহেতু "হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন অব্ আমেরিকায়" এই ব্যাপারই ঘটেছে। হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন অব্ আমেরিকা বাঙ্গালীরাই চালাতো, কিন্তু যখনই কোনও অবাঙ্গালী সভাপতি হয়েছে তখনই সব বাঙ্গালীদের উৎসাহ কমে গেছে। এ শুধু আমার কথা নয়। সর্ব্বশ্রী কে, ডি, শাস্ত্রী, এন, এস, হার্ডিকার আর, কে, খেনকাও এমত পোষণ করতেন। তাছাড়া পাঞ্জাবী, মারাঠি ও মাদ্রাজী ছাত্রদের সর্ব্বত্র এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। আমেরিকায় বাঙ্গালী বিপ্লবী নেতারা তাদের কার্যকলাপে এদেশে ও জার্মান মহলে নিজেদের উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করেছে।

সানফ্রানসিসকো মানসায় যা প্রকাশ পেয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দাজনক, এমন কেউ ছিল না বোধ হয় যাকে গালাগালি বা বিদ্রূপ করা হয়নি। গুপ্ত প্রতিষ্ঠান কিংবা গুপ্ত কাজে এরপর আমি সব আস্থা হারিয়েছি। রাজনৈতিক বিপ্লবে আমি মোটেই উৎসাহী নই। যে সব বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে দেখেছি তারা প্রায় সবাই নিজেদের "অতিমানব" বলে মনে করতো। ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা একবার হাতে পেলে ওদের মতো জঘন্য শাসক আর হবে না। গণতন্ত্রের প্রতি এতটুকু মর্যাদাবোধ ওদের আছে কি না, আমার সন্দেহ। বেশীর ভাগই ওরা নীৎসেপন্থী। জ্ঞানেই হোক অথবা অজ্ঞানেই হোক, নেতৃত্বের সর্ব্বনায়কত্ব এবং মননের আভিজাত্যের প্রতি ওদের বিশ্বাস। আদর্শের অনুপ্রেরণা এবং

স্বার্থগন্ধহীন মহৎ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা ওদের আছে। গভীর ভাবপ্রবণতা ও প্রচণ্ড আবেগ-এর সব দোষগুণ থাকা সত্ত্বেও জাত হিসেবে মোটের উপর ওরা মহান।

এই বিবৃতি রচনাকালে ঘটনার পরম্পরা সঠিকভাবে লিখিত হয়েছে কি না, আমি নিশ্চিত নই। কোন কারণে রোজনামচা রাখা হয়নি, এবং ঠিক সময়ে কিছু টুকেও রাখিনি। তবুও যতদূর পেরেছি স্মরণ করে দিনলিপি লিখে রাখলুম।

(৬ই জুন—ইং ১৯১৯ সাল)

পাদটীকা

৬। দিল্লীর বাসিন্দা। ১৯১১ সালে আমেরিকায় যান ও গদর পার্টির নেতা বলে পরিচিত হন। ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। জামিনে খালাস থাকার সময় সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বার্লিন কমিটিতে যোগ দেন কিন্তু মতের মিল না হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই কমিটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর ১৯১৮ সালে আবার কমিটিতে আসেন ও কমিটির কাজের জন্যে সুইডেন যান কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেন না। মহাযুদ্ধের কিছু দিন পর ১৯২০ সালে লণ্ডনে যান এবং সেখান থেকে আমেরিকায় পৌঁছান। ১৯২৮ সালে মারা যান।

৭। পাঞ্জাবের বাসিন্দা। লাহোর ডি-এ-ভি কলেজে পড়াশুনা করে আর্য সমাজে যোগ দেন। ১৯০৫।৬ সালে আর্য সমাজের প্রচারের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা যান এবং সেখান থেকে ইংলণ্ডে। ১৯১০ সালে দেশে ফিরে এসে ডি-এ-ভি কলেজে যোগ দেন। এক বছরের মধ্যেই আমেরিকা যান ও হরদয়ালের সঙ্গে গদর পার্টির কাজ আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে আসেন ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে শাস্তি পান।

৮। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

৯। হাতরাসের একটি ছোট জমিদার, রাজা হরনারায়ণের দত্তক পুত্র। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সুইজারলণ্ডে যান ও লালা হরদয়ালের সঙ্গে দেখা

করেন। হরদয়ালের পরামর্শে বার্লিন কমিটিতে যোগ দেন এবং কাইজারের সঙ্গে দেখা করেন। কাইজারের কথা মত বার্লিন কমিটির প্রতিনিধি হয়ে মহেন্দ্র প্রতাপ আফগানিস্থানে যান আমীরকে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে। আমীর মহেন্দ্র প্রতাপকে সাদর অভ্যর্থনা জানান কিন্তু যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথায় নীরব থাকেন। মহেন্দ্র প্রতাপ আফগানিস্থানে এক অস্থায়ী সরকার স্থাপন করে নিজে হন তার সভাপতি এবং বরকতউল্লা ও ওবাইদউল্লা হন তাঁর মন্ত্রী।

১০। কলকাতার অধিবাসী। মহাযুদ্ধের অনেক আগে জার্মানীতে রয়নশিল্প শিখতে যান। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই জাপানে আসেন। জাপানে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। রাসবিহারীর কাছ থেকে বিপ্লব সংক্রান্ত কিছু খবর নিয়ে দেশে যাবার পথে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েন। দু-চার দিন হাজতে রেখে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। ইতিমধ্যে তিনি গদরবাদীদের খপ্পরে পড়েন; তখন আর দেশে না ফিরে রাশিয়ার দিকে রওনা হন।

১১। অমৃতসরের বাসিন্দা। ১৯০৯।১০ সালে দেশ ছাড়েন। তারপর সুদূর প্রাচ্যে কয়েক বছর কাটিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগেই আমেরিকা পৌঁছান ও গদর পার্টিতে যোগ দেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই পার্টির প্রচারের জন্যে আবার প্রাচ্যে ফিরে আসেন। যুদ্ধ শেষে আবার আমেরিকায় ফিরে যান।

১২। পি. এন. ঠাকুর। আসল নাম রাসবিহারী বসু। চন্দননগরের অধিবাসী। ১৯০৬ সালে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা পড়ার পর থেকেই পুলিশ তাঁর খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ করে। ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে আমেরিকায় যাবার পথে জাপানে থেকে যান।

১৩। আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। কলকাতার কাছে ভাটপাড়ায় বাড়ী। ১৯০৩ সালে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ও ১৯১৪ সালে গর্ডেনরীচ ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে পড়েন কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পান। প্রথম মহাযুদ্ধের সুরুতেই সি, মার্টিন নাম নিয়ে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। ষড়যন্ত্র ফেঁসে যাওয়ার পর আমেরিকায় চলে যান ও সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে সাম্যবাদের পথ ধরেন।

১৯২৪ সালে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল তাঁকে বরোদিনের সঙ্গে চীনে পাঠান। ১৯২৮ সালে কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেসে মতবিরোধ হওয়ায় দল ছাড়েন। ১৯৩০ সালে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩১ সালে ধরা পড়েন। বিচারে ছ বছর জেল হয়।

কর্ণসুবর্ণ

সুধীর রঞ্জন দাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চৈনিক বিবরণীতে পরিবেশিত শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষী কার্যকলাপ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বিবৃত আছে: "সোম (শশাঙ্ক) গঙ্গাতীর হইতে] বারাণসী পর্যন্ত দেশ সমূহে প্রবল পরাক্রমশালী অধিপতি হইয়া বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস ও পূত বৃক্ষরাজি অগ্নিদগ্ধ করিবে। অতঃপর এই দুর্মতি. লোভী, স্বপর্যাপ্ত এবং অশ্রদ্ধেয় পুরুষ পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, উদ্যান, মন্দির ও মঠ এবং নির্গ্রন্থদিগের আবাসস্থলসমূহ ধ্বংসপূর্বক ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করিবে।" আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং বৌদ্ধ নিদর্শনধ্বংসকারী নৃপতি ছিলেন। বাণভট্ট শশাঙ্কের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্থা বিধ্বংস সম্পর্কীয় কার্যের কোন কাহিনী পরিবেশন করেন নাই। কিন্তু শশাঙ্ককে বহুবিধ ঘৃণাসূচক ও হিংসাত্মক সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

উপরিউক্ত চীন-পরিব্রাজকের এবং আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বর্ণনানুসারে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম নিগ্রহক এবং সংঘারাম ও বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন বিধ্বংসকারী নৃপতি ছিলেন। উক্ত কাহিনীসমূহের ঐতিহাসিক সত্তা এবং পক্ষপাতশূন্যতা সন্দেহজনক। উপরন্তু উল্লিখিত বিবরণ সমুদয় পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। ঐতিহাসিক বিচারে বিবরণসমূহ আলোচনা হইতে মনে হয় যে, উক্ত কাহিনী সকল স্বেচ্ছাকৃত, ঘৃণাসূচক এবং অতিরঞ্জিত। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন যে, হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধগণ হর্ষবর্ধনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুসৃত নৃপতি শশাঙ্ককে দণ্ড বিধানের নিমিত্ত এবং তাঁহাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিলাষেই হিংসাত্মক ও জঘন্যাত্মক কাহিনীর উদ্ভাবন করিয়াছেন। এতদ্‌সম্পর্কে অধ্যাপক মজুমদার

বলিয়াছেন যে হিউয়েন-সাঙ্ কর্তৃক শশাঙ্কের বৌদ্ধ উৎপীড়ন সম্পর্কিত কাহিনীর ঐতিহাসিক যথার্থতা নির্ধারণ আয়াসসাধ্য। বর্তমানে বৌদ্ধ লেখকগণের বর্ণনসমূহই শশাঙ্কের বৌদ্ধ নিগ্রহ কাহিনীর ভিত্তিস্তর। কিন্তু বৌদ্ধগণ কর্তৃক পরিবেশিত কাহিনী পক্ষপাতিত্ব এবং রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত নহে। তথাপি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ বৌদ্ধ লেখকগণের পাক্ষিক বর্ণনা সমূহের উপর নির্ভর করিয়াই কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ককে অভিযুক্ত করিয়াছেন। অনেকে মন্তব্যও করিয়াছেন যে, বাণভট্ট বা হিউয়েন-সাঙ্ শশাঙ্কের প্রতিকূল ছিলেন কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রীমূল-কল্পের লেখকের অনুরূপ বিরূপ হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং অধ্যাপক বসাক বলিয়াছেন যে, শশাঙ্ককে নির্দোষ সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক—শশাঙ্কের বীরত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু অধার্মিক এবং ঘৃণিত কার্যাবলী নহে।

(৫৫)

কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে উপাদান-তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচারের প্রয়োজন সর্বাধিক। এই প্রসঙ্গে উপাদান প্রসূত তথ্যের আলোচনান্তে নৈতিক সত্তা নির্ধারণ কর্তব্য।

প্রথমতঃ উল্লেখনীয় যে, শশাঙ্কের বিরুদ্ধে আনীত ঘৃণিত অভিযোগ সমূহ কেবলমাত্র চৈনিক এবং আর্যমঞ্জুশ্রীকল্পের বিবরণীতে বিদ্যমান। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণপ্রসূত তথ্য পক্ষপাতিত্ব ও হিংসাত্মক দোষে দুষ্ট। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বর্ণনও উক্ত দোষ হইতে বিমুক্ত নহে। উক্ত গ্রন্থ লেখকের শশাঙ্কর বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ বা বিপক্ষতা না থাকিতে পারে কিন্তু তাহার গ্রন্থের উপাদানসমূহ যে বৌদ্ধগণের উপকথাপ্রসূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং এই প্রকার তথ্য সম্বলিত কাহিনীর বা বর্ণনের নিরপেক্ষতা ও প্রামাণিকতা সন্দেহ জনক। দ্বিতীয়তঃ, হিউয়েন-সাঙের বিবিধ বিবরণে পরিবেশিত শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষী কার্যকলাপের কাহিনীসমূহে অসঙ্গতি বর্তমান।

তৃতীয়তঃ, হিউয়েন-সাঙের জীবনচরিতের বর্ণনায় শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষী

কর্মজনিত কাহিনীর ও প্রত্যক্ষ নির্দেশের অবিদ্যমানতা গুরুত্বপূর্ণ। জীবন চরিতের বিবরণে এতৎবিষয়ে স্পষ্ট উক্তির অভাবে ভ্রমণ বৃত্তান্তের কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্তা সন্দেহজনক। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, হিউয়েন সাঙ স্বদেশের শ্রোতৃবর্গকে ভারতের বৌদ্ধগণের নিকট হইতে সংগৃহীত উপকথার বিবরণই পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংকলকগণ তাঁহাদের বর্ণনায় উক্ত উপকথাসমূহই সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই কারণবশতঃই হিউয়েন-সাঙের বিভিন্ন ভ্রমণ বিবরণের লিপিবদ্ধ কাহিনীর মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। সুতরাং হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণে শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্পর্কিত কাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।

চতুর্থতঃ, হিউয়েন-সাঙের বিবরণীপাঠে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বভারতের সর্বত্রই প্রাণবন্ত ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন বহু বৌদ্ধমঠ, সংঘারাম, প্রভৃতি বিরাজমান ছিল। বাঙলা দেশের বিভিন্নাংশেও তিনি অনেক প্রাণবন্ত বৌদ্ধমঠ ও বিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক কর্ণসুবর্ণের সন্নিকটস্থ রক্তমৃত্তিকা সংঘারাম এবং বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যদি প্রকৃতই শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধমঠ ও বিহারসমূহের ধ্বংসের কাহিনীর যাথার্থ্য স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণে উক্ত বৌদ্ধ নিদর্শনরাজির কোন অস্তিত্ব থাকিত না। যদি শশাঙ্ক প্রকৃতই বৌদ্ধমঠ প্রভৃতির বিলোপ সাধন করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে, হিউয়েন-সাঙ নিশ্চয়ই উহার ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিতেন। সুতরাং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে চীন-পরিব্রাজক যথার্থ বাস্তবতথ্য ও প্রামাণিক নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। কিন্তু এতৎ সম্পর্কে চীন পরিব্রাজকের নীরবতা বিস্ময়কর। এমন কি, হিউয়েন-সাঙ রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সন্নিকটে অবস্থিত অশোক স্তূপেরও উল্লেখ করিয়াছেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধমঠ, স্তূপ, প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া থাকিলে, হিউয়েন-সাঙ প্রখ্যাত রক্ত-মৃত্তিকা-মহাবিহারের এবং অশোক স্তূপের প্রাণবন্ত ও শ্রীসম্পন্ন অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতেন না।

পঞ্চমতঃ, শশাঙ্ক সাংকাসিয়া, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমঠ

ও বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্নসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে কোথায়ও বাঙলা দেশের বৌদ্ধমঠ স্তূপ প্রভৃতির ধ্বংসের বর্ণনা পাওয়া যায় না। যদি শশাঙ্ক প্রকৃতই বৌদ্ধ বিধ্বংসী হইতেন তাহা হইলে স্বীয় রাজধানীর এবং উহার উপকণ্ঠস্থ বৌদ্ধ সংঘারাম প্রভৃতি তিনি অক্ষত রাখিতেন না। কিন্তু হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে কর্ণসুবর্ণে বা বাঙলাদেশে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষী কার্যকলাপ সম্পর্কিত উক্তি এবং বাস্তব নিদর্শন অবর্তমান। সুতরাং বাঙলাদেশের বৌদ্ধমঠ ও বিহার অক্ষত রাখিয়া শশাঙ্ক কর্তৃক অন্যত্র বৌদ্ধনিদর্শন ধ্বংসের কাহিনীও অবিশ্বাস্য।

ষষ্ঠতঃ, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বিধ্বস্ত বৌদ্ধমঠ প্রভৃতির পুনর্নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা অনুমেয়। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন-সাঙ বাঙলা দেশের সর্বত্র শ্রীসম্পন্ন বৌদ্ধ-মঠ, বিহার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে বা কিয়ৎপরে শশাঙ্কের মৃত্যু হইলে ১০ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধমঠ প্রভৃতির পুনর্নির্মাণ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা স্বীকার্য। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বিধ্বস্ত বৌদ্ধবিহার প্রভৃতির পুনঃ স্থাপন এবং প্রাণবন্ত বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রসার সম্ভবপর নহে। অন্য উপাদানপ্রসূত তথ্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শশাঙ্কের পরলোক-গমনানন্তর কর্ণসুবর্ণে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণে এই বিশৃঙ্খলার উল্লেখ অবর্তমান। কিন্তু আর্য-মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এতৎ সম্পর্কে বিশদ বর্ণন বিদ্যমান। হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার অনুল্লেখ হইতে মনে হয় যে, শশাঙ্ক সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজকের কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শনের অনতিপূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বৌদ্ধমঠ প্রভৃতির পুনর্নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ছিল না। হিউয়েন-সাঙের পরিভ্রমণের অনতিপূর্বেই যদি শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়া থাকে এবং তিনি যদি উক্ত বৌদ্ধ নিদর্শনসমূহ প্রকৃতই ধ্বংস করিয়া থাকেন তাহা হইলে চীন পরিব্রাজক কর্ণ-সুবর্ণে এবং বাংলার অন্য রাজ্যসমূহে প্রাণবন্ত বৌদ্ধ সংঘারাম, অশোক স্তূপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না; কেবলমাত্র উক্ত বৌদ্ধ নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করিতেন।

সপ্তমতঃ, শশাঙ্ক নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি শিবের

সাধক ছিলেন। শশাঙ্কের মুদ্রায় শিব, নন্দী এবং লক্ষ্মীর প্রতিচিহ্ন বর্তমান। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা অনুসারে শশাঙ্ক মহেশ্বরের উপাসক ছিলেন। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তিনি যে অন্য ধর্মের বিরোধী ছিলেন তাহার সমর্থনে কোন নিরপেক্ষ ও প্রামাণিক তথ্যের সন্ধান অজ্ঞাত। শশাঙ্কের পরধর্ম-সহিষ্ণুতা না থাকিলে বাঙলাদেশে বা পূর্বভারতে অসংখ্য বৌদ্ধমঠ, বিহার প্রভৃতির প্রাণবন্ত অবস্থান সম্ভবপর হইত না। বৌদ্ধধর্মের প্রসারও অসম্ভব ছিল। পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় মৈত্রী ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ একই অঞ্চলে নির্বিবাদে স্বস্বধর্মানুষ্ঠান কার্যে ব্যাপৃত ছিল। হিউয়েন-সাঙের বিবরণীই উক্ত অভিমতের প্রাথমিক সাক্ষ্য।

(৫৬)

বৌদ্ধগণ নিশ্চয়ই কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ককে হেয়জ্ঞান করিতেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ-গণের নিকট পাষণ্ডের প্রতীক ছিলেন। তাহার অপরাধ, তিনি বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন নাই। উপরন্তু, শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের ধারক হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ-রাজের ঔদ্ধত্য বৌদ্ধগণের নিকট অসহ্য ছিল। এই সকল কারণবশতঃই বৌদ্ধ লেখকগণ এবং হিউয়েন-সাঙ ও বাণভট্ট শশাঙ্কের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। অধিকন্তু হিউয়েন-সাঙের এতদ সম্পর্কিত আখ্যান অংশ সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে। চীন পরিব্রাজক বৌদ্ধগণের নিকট হইতে যথাশ্রুত কাহিনীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ চীন পরিব্রাজক স্বয়ং কল্পনার আশ্রয় গ্রহণও করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের উপরিউক্ত কাহিনী বহুলাংশে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত। লোকচক্ষে শশাঙ্ককে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিলাষেই বিভিন্ন বৌদ্ধ জনশ্রুতিমূলক রাগ-দ্বেষ-উদ্ভূত উক্তি সঙ্কলকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভবিষ্যতের জন্যই চীন পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ লেখকগণ শশাঙ্ককে পাষণ্ড, বিধর্মী, বৌদ্ধধর্ম বিনাশক প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত

করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল উক্তির ভিত্তি অজ্ঞাত। চীন পরিব্রাজকের বিবরণীতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ দ্বারাও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে আনীত ঘৃণিত অভিযোগসমূহ নিঃসন্দেহে প্রত্যাখান করা সম্ভবপর। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্ম বিধ্বংসী শশাঙ্ক সম্পর্কিত আখ্যান-অংশ ভিত্তিহীন এবং বহুলাংশে অপ্রামাণিক।

বিচারে পাক্ষিক সাক্ষীর অতিরঞ্জিত ও কল্পনাপ্রসূত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নীতি বিরুদ্ধ। ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয় অভিযোগে শশাঙ্ক অভিযুক্ত। অভিযোগের বাস্তব সত্তা ব্যতিরেকে কাহাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা আইন সঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয়, শশাঙ্ক কোন সাক্ষ্য রাখিয়া যান নাই। কিন্তু বিরুদ্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণের পরোক্ষ নির্দেশ-উদ্গত তথ্যের নিরপেক্ষ বিচারেও শশাঙ্ককে অভিযুক্ত করা অসম্ভব।

অবাস্তব, অপ্রমাণিত, কাল্পনিক, এবং বিরুদ্ধ জনশ্রুতিমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক ইতিহাসে ধর্মদ্বেষী ও পাষণ্ড চরিত্রে প্রতিভাত। কিন্তু উপাদানে-নির্ণয়ে এবং তথ্যের বিশ্লেষণে ও বিচারে শশাঙ্ক নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে আনীত ঘৃণিত ও বিদ্বেষপ্রসূত অভিযোগ ভিত্তিহীন। ঐতিহাসিক বিচারে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক নিরপরাধ এবং বৌদ্ধ লেখকগণ কর্তৃক আনীত অভিযোগসমূহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত নিরপেক্ষ বাস্তব ও প্রামাণিক তথ্য দ্বারা উক্ত অভিমত স্থিরীকৃত হইবে।

(ঞ) শশাঙ্ক ও সমসাময়িক বাঙলা

(৫৭)

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৬২৯ (৬৩৭) খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক পূর্বভারতে সার্বভৌম অধীশ্বর ছিলেন। উক্ত সময়ে কর্ণসুবর্ণ মহানগরীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলা দেশে সর্বপ্রথম সার্বভৌম গৌড় রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কই সর্বপ্রথম বাঙলার বিভিন্ন

জনপদসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া গৌড়রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শশাঙ্কই বাঙালার প্রাথমিক সংযুক্ত সার্বভৌম সাম্রাজ্যের স্রষ্টা। দৃঢ়বদ্ধ রাজনৈতিক একত্বই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংহতির এবং উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি ছিল। সাহিত্য ও লেখমালা পরিবেশিত উপাদান-তথ্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও শশাঙ্কের সমসাময়িক বাঙলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক ইতিহাসের কাঠামো রূপায়ণ অসম্ভব নহে। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ, কতিপয় লেখমালা, বর্তমান নিদর্শন, জনশ্রুতি, প্রভৃতি উক্ত ইতিহাস লিখন-সহায়ক।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনৈতিক ঐক্য এবং দৃঢ় ও দক্ষ শাসনতন্ত্রই বাঙলার অর্থনৈতিক উন্নতির ও ধর্মক্ষেত্রে শান্তি ও মৈত্রীর যথার্থ ভিত্তিস্তর ছিল। শশাঙ্কের সামরিক প্রতিভা, বীরোচিত কর্ম এবং রণজয় প্রশংসনীয়। তাঁহার শাসন কার্য পরিচালনের নিপুণতাও উল্লেখযোগ্য। শশাঙ্ক মহারাজাধিরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রধান রাজকর্মচারীদিগের মধ্যে মহাপ্রতিহার, মহাবলাধিকৃত, মহাসন্ধি-বিগ্রহিক সামন্ত-মহারাজ এবং মহাসামন্ত-মহারাজ অন্যতম। কর্ণসুবর্ণরাজ্য কতিপয় শাসনকেন্দ্রে বিভক্ত ছিল -- দণ্ডভুক্তি, ওড্র, উৎকল, প্রভৃতি। এই সকল শাসনকেন্দ্র উক্ত রাজকর্মচারীগণের শাসনাধীনে ছিল। রাজকর্মচারী কর্তৃক প্রচারিত দানপত্রে সার্বভৌম অধীশ্বর সম্পর্কিত নির্দেশ লিখিত থাকিত। গঞ্জাম লিপিতে শশাঙ্কের প্রশাসনের উক্তি বর্তমান। শশাঙ্কের অধীনে রাজকর্মচারীগণ দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। উত্তর ভারত ভ্রমণকালে চীনপরিব্রাজক একাধিকবার দস্যু ও অপহারকদিগের হস্তে নির্যাতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙলাদেশে হিউয়েন-সাঙের পরিভ্রমণ সর্বতঃ বাধাবিপদমুক্ত ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বাঙলাদেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বর্তমান সত্ত্বেও পরিভ্রমণ নিরাপদ ছিল।

(৫৮)

হিউয়েন-সাঙ বাঙলার সর্বত্রই ভূমির উর্বরতার এবং কৃষি সম্পদের প্রশংসা করিয়াছেন। সমতট ব্যতিরেকে সর্বস্থানে কৃষিকার্য নিয়মিত পরিচালিত হইত। সর্বত্রই শস্য ও ফল উৎপাদনের প্রাচুর্যের উল্লেখ বিদ্যমান। পুষ্করিণী, পরিব্রাজক-আশ্রম ও কুসুমোদ্যান দ্বারা পুণ্ড্রবর্ধন শোভিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে কণ্টকী ফলের প্রাচুর্য উল্লেখযোগ্য। কর্ণসুবর্ণে পুষ্প-ফল ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের পর্যাপ্তির বর্ণনা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মহানগরীর লোকবসতি ঘন ছিল। পুরবাসিগণ ধন-ধান্যে বিত্তবান ছিলেন। নগরবাসিগণ বিদ্যানুরাগী ও চরিত্রবান ছিলেন এবং জ্ঞানশিল্পিদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসিগণ জ্ঞানী-গুণীজনের সমাদর করিতেন। তাম্রলিপ্তির অধিবাসিগণ নির্ভীক ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের আচার ব্যবহার অসংস্কৃত ছিল। হিউয়েন-সাঙ কর্ণসুবর্ণ নগর-বাসিগণের জ্ঞানস্পৃহার প্রশংসা করিয়াছেন। মনে হয়, উক্ত সময়ে কর্ণসুবর্ণ ই বাঙলা দেশের জ্ঞানলাভের ও বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

(৫৯)

তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ এবং সমতট সম্পদসম্পন্ন ব্যবসায়িক কেন্দ্রাদি সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্য সূত্রে গ্রথিত ছিল। ভাগীরথীর মাধ্যমে কর্ণসুবর্ণ হইতে সমুদ্রপথ সুগম ছিল। তৎসময়ে পূর্বভারতে তাম্রলিপ্তিই প্রধানতম বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বন্দর ছিল। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি হইতেই সমুদ্রপথে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, হিউয়েন-সাঙও ফা-হিয়েনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাম্রলিপ্তিতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তিনি সমুদ্রপথযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া স্থলপথে দক্ষিণভারত অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙের পরবর্তী চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ ভারত-পরিভ্রমণের নিমিত্ত স্বদেশ হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া তাম্রলিপ্তিতে পৌঁছিয়াছিলেন।

বিভিন্ন সমুদ্রপথের মাধ্যমে তাম্রলিপ্তি সুদূরবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল : (ক) প্রথম সমুদ্রপথ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরাকান হইয়া ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বন্দরপুঞ্জ পর্যন্ত ; (খ) দ্বিতীয় পথক্রম সমুদ্রোপকূল হইয়া চিকাপোল এবং তৎপরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রান্তর পর্যন্ত ; (গ) তৃতীয় পথক্রম, তাম্রলিপ্তি হইতে মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত —এই পথেই ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্তিতে পৌঁছিয়াছিলেন। (ঘ) চতুর্থ পথক্রম, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কলিঙ্গ এবং করমণ্ডল উপকূল হইয়া সিংহল পর্যন্ত। ফা-হিয়েন এবং অন্য চীন-পরিব্রাজকগণ এই পথেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

(৬০)

এতদ্ব্যতীত সপ্তম শতাব্দীর বাঙলার ও পূর্বভারতের বিভিন্নাংশ স্থলপথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতে বর্ণিত পথক্রমই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্থলপথে তাম্রলিপ্তি পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত ছিল। বুদ্ধগয়া হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত বরাবর স্থল-পথের বিদ্যমানতা লেখমালার তথ্য দ্বারা প্রমাণিত। পরবর্তী সময়ে উদয়-মানর লেখমালা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মান-ভ্রাতৃত্রয় ব্যবসায়ে বহু ধন দৌলত সঞ্চয় করিয়া তাম্রলিপ্তি হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। অন্য স্থলপথ তাম্রলিপ্তি হইতে উড়িষ্যার উপকূলবর্তী ছিল। এই পথক্রম অনুসরণ করিয়া হিউয়েন-সাঙ্ দক্ষিণ ভারত অভিমুখে পদযাত্রা করিয়াছিলেন। উত্তর দিকে তিব্বতের মাধ্যমে তাম্রলিপ্তি স্থলপথে চীন দেশের সহিত যুক্ত ছিল। হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত পথক্রম হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, কামরূপ প্রভৃতি নগরসমূহ স্থলপথ দ্বারাও সংযুক্ত ছিল। কর্ণ-সুবর্ণের সহিত তাম্রলিপ্তির জল ও স্থলপথের মাধ্যমে সাক্ষাৎ সংযোগ বিদ্যমান ছিল। হিউয়েন-সাঙ বলিয়াছেন যে, কর্ণসুবর্ণের অধিবাসিগণ অতীব ধনী এবং বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহার বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, কর্ণসুবর্ণ তৎ সময়ে ধনাঢ্য বণিকগণের প্রধান অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

এই প্রসঙ্গে মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত লেখ (৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'রক্ত মৃত্তিকাবাস মহানাবিক বুদ্ধ গুপ্ত' মালয় উপদ্বীপে বাণিজ্যের নিমিত্তই গমন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। কর্ণসুবর্ণ মহানগরীর সন্নিকটস্থ রক্তমৃত্তিকা নামধেয় সংঘারামের অবস্থান হিউয়েন-সাঙের বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং মনে হয় যে, কর্ণসুবর্ণ ন্যূনপক্ষে পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অধিকন্তু পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, রাজবাড়ীডাঙা উৎখননে একটি গ্রীক্ অক্ষরে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সীলমোহর উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সীলমোহরে এক গ্রীকদেবীর নাম লিখিত আছে। গ্রীকদেবী সমুদ্রযাত্রার ও নৌযানের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। এই সীলমোহরের আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সীল-মোহরটি একক প্রত্নবস্তু তথাপি কর্ণসুবর্ণের সহিত গ্রীক নাবিক বা বণিকগণের সম্পর্ক অনুমেয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ সপ্তম শতাব্দীর বাঙলাদেশে অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। উন্নত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই কর্ণসুবর্ণের অধিবাসিগণ ধনাঢ্য ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি স্বীকার্য। প্রচলিত বিশুদ্ধ ধাতুর মুদ্রা অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক। শশাঙ্কের মুদ্রায় মিশ্রধাতুর পরিমাণ পরবর্তী জয়নাগের মুদ্রার খাদ হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

(ক্রমশঃ)

STUDENTS BOOK SUPPLY

15, COLLEGE SQUARE,
CALCUTTA-12

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত সংশোধিত সিলেবাস No. Sy 11-PN/2/68 dated 9.5.68 অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি আপনার মনোনয়ন প্রার্থী।

1. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ১ম ভাগ—ডঃ এন, এন, রায় for VI
2. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ৪র্থ ভাগ—ডঃ এন, এন, রায় for IX-X
3. ভারত কথা—অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় for H.S. or S.F
4. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X or XI (H.S.)
5. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস. ঘোষ for IX, X(S.F.)
6. বাণিজ্যিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ ও অধ্যাপক ভবেশ ভট্টাচার্য্য (H.S. Com.)
7. অর্থনৈতিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (H.S.Com.)
8. বাণিজ্যিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (S.F. Com.)

AUTO-PRINT

the house
for
quality printing
to your
choice

★

AUTO-PRINT & PUBLICITY HOUSE
অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
The Leading House for Printing at your service
over two decades.
49, BALDEOPARA ROAD (MANICKTOLA),
CALCUTTA-6.
PHONE : 35-2959

With Compliments of

EAST INDIA RUBBER WORKS (P) LTD.

161, CHITTARANJAN AVENUE,

CALCUTTA-7

DAS GUPTA & CO.

PRIVATE LIMITED

BOOKSELLERS SINCE 1886

54 3, College Street, Calcutta-12

PHONE :- 343875 & 346547

ইতিহাস

সম্পাদক :
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

নব পর্যায় তৃতীয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫

ইতিহাস

[ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

সম্পাদক
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক
অরুণকুমার দাশগুপ্ত
অমলেন্দু দে
শোভন বসু

কলিকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি
৩৩/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা আড়াই টাকা
বার্ষিক আট টাকা

ইতিহাস কার্যালয়
কাশিমবাজার হাউস
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা-৬

ইতিহাস বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্মৃতিকথা রমেশচন্দ্র মজুমদার	২২১
বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের অবদান অমলেন্দু দে	২৩১
খৃষ্টপূর্ব ৩২০ সাল আন্দাজ চাউলের দর কত ছিল যতীন্দ্র মোহন দত্ত	২৫২
কর্ণসুবর্ণ সুধীর রঞ্জন দাস	২৫৫
ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর চোখে ভারত অনুবাদক : অনিরুদ্ধ রায়	২৬৯
সংবাদ মতামত	২৭৭
পুস্তক পরিচয়	২৮১
ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি পরিচালিত ইতিহাস বিষয়ক বাংলা পত্রিকা	২৮৩

নিবেদন

নব পর্যায় ইতিহাস পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ শেষ হইল। গ্রাহকগণকে নতুন বৎসরের চাঁদা পত্রিকার কার্যালয়—কাশিমবাজার হাউস, ৩০২ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯—এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা ভি. পি. যোগে পাঠান সম্ভব হইবে না।

১৩৭৬ সাল হইতে 'ইতিহাস' পত্রিকা প্রতি বৎসরে তিনবার প্রকাশিত হইবে।

ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড | মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫ | ৪র্থ সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(১৬)

বাংলার ইতিহাস লেখা সুরু করতে সম্পাদক হিসেবে আমাকে প্রথম প্রথম বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। এ সব কথা সবিস্তারে লিখলে ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় মন্তব্য করতে হয়। সেইজন্য একটু আভাসমাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হব। আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে যখন আচার্য যদুনাথ সরকারকে দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক রূপে নিযুক্ত করা হল তখন এ সম্বন্ধে যে কিছু প্রতিবাদ আসতে পারে, আমি এ ধারণাও করতে পারিনি। কারণ যদুনাথ তখন মুসলমান যুগের প্রধান ঐতিহাসিক বলে দেশে বিদেশে সর্বত্র স্বীকৃত। কিছু দিনের মধ্যেই ঢাকায় এ নিয়ে একটু মৃদু গুঞ্জন সুরু হল। সে সময় আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু নলিনী কান্ত ভট্টশালী ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলেও এর কিছুদিন পূর্বে বাংলার মুসলমান যুগের কতকগুলি মুদ্রা আলোচনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে বাংলার এই যুগের ইতিহাসে অনেক নূতন আলোকপাত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে মুসলমান লিখিত বাংলার ইতিহাসে এই যুগে রাজা গণেশের উল্লেখ আছে এবং কতকগুলি মুদ্রাতে রাজা দনুজমর্দনের নাম পাওয়া যায়। ভট্টশালী সর্বপ্রথমে এই মুদ্রাগুলির সঠিক তারিখ নির্ণয় করে

প্রতিপন্ন করেন যে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন একই ব্যক্তি। এই মত আজকাল প্রায় সকল ঐতিহাসিকই গ্রহণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসেও (দ্বিতীয় খণ্ড) এই মত গৃহীত হয়েছে। ভট্টশালী মুদ্রা পরীক্ষা করে বাংলার ঐ যুগের কয়েকজন স্বাধীন সুলতানের সঠিক তারিখও নির্ণয় করেন। ভট্টশালীর এই সব গবেষণার জন্য আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তৃতীয় শ্রেণীতে এম. এ পাশ করার জন্য কোন কলেজে শিক্ষকতার পদ তিনি পাননি বটে, আমি কিন্তু তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাশের ছাত্রদের পড়াবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম এবং এজন্য কিছু পরিশ্রমিকও তাঁকে দেওয়া হত। কিন্তু আচার্য যদুনাথের পরিবর্তে ভট্টশালীকে বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক নিযুক্ত করার প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারিনি। তবে এই ইতিহাস লেখার জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল আমি তাতে ভট্টশালীকে সদস্য নিযুক্ত করেছিলাম এবং প্রাক্ মুঘল যুগের বাংলার ইতিহাস লেখার জন্য তাঁর নামই স্থির হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম সমিতিতে গৃহীত না হওয়ায় ভট্টশালী ঐ সমিতির সভাপদ ত্যাগ করলেন। এমন কি এই ইতিহাসের জন্য কিছু লিখতেও তিনি সম্মত হলেন না। এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। ভট্টশালী যে আমার উপর বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন, তা বুঝতে পারি। বহু চেষ্টা করেও তাঁর মতের কোন পরিবর্তন আমি ঘটাতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে ভট্টশালীর সঙ্গে এই বিচ্ছেদের স্মৃতি আজও আমার মনে বেদনার উদ্রেক করে। ভট্টশালী আজ জীবিত নেই বলেই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা আমি বললাম।

আরও দু'একজন লেখকের অধ্যায়গুলি নির্মমভাবে কাটছাঁট করে নিজে পুনরায় তার অধিকাংশ ভাগ লেখার জন্য তাঁরাও আমার প্রতি খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। এঁরাও আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তাঁদের এমন মনোভাবও আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমার জীবনে এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত ঘটেছে সেখানে কর্তব্যের খাতিরে বন্ধুজনের

অসন্তোষ জন্মাবে জেনেও বাধ্য হয়ে আমাকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। তার জন্য গভীর দুঃখ পেলেও মনকে চিরকালই এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি এবং এখনও দিই যে বন্ধুপ্রীতির জন্য কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে পরবর্তীকালে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যেত যে আমি বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য প্রদেশের মানুষকে লেখক হিসাবে নির্বাচন করিনি। এই অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ কাশীনাথ দীক্ষিতকে আমি শিল্প সম্বন্ধে লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলাম; কিন্তু তিনি তা লিখতে রাজী হননি। তবে অভিযোগটি পুরোপুরি সত্য না হলেও আংশতঃ সত্য বলা যায়। তার কারণ বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরা বাংলা দেশ ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রদেশ বা অঞ্চলের ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু অবাঙ্গালী ঐতিহাসিক বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তখনকার দিনে এমন লোকের সংখ্যা খুব বিরল ছিল। সেজন্যই কোন অবাঙ্গালী লেখকের রচনা এই ইতিহাসে স্থান পায়নি। অবাঙ্গালী ঐতিহাসিকের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব তার কারণ নয়। অন্য প্রদেশের যোগ্য লেখকের অভাবেই বাঙ্গালী লেখককে নির্বাচিত করতে হয়েছে।

শিল্প সম্বন্ধে অধ্যায়টি দীক্ষিত লিখতে অসম্মত হওয়ায় আমি সেটি ননীগোপাল মজুমদারকে লিখতে অনুরোধ করি। ননীগোপাল রাজী হন এবং খুব সম্ভবতঃ অনেকটা লিখেওছিলেন। কিন্তু ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আততায়ীর হাতে সহসা তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সে কাগজপত্র কিছুই পাওয়া যায় নি।

আশ্চর্যের বিষয় বাংলার শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করার মত উপযুক্ত লোক তখন খুবই দুর্লভ ছিল। অগত্যা দুটি তরুণ লেখককে এই অধ্যায়টি লেখার জন্য আমি মনোনীত করি। এরা দুজনেই সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিন মাত্র অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন; নাম যশ বিশেষ ছিল না। তাদের যে-অল্প কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তা পড়ে তাদের সম্বন্ধে আমার খুব ভাল ধারণা হয়। এই বিষয়ে খ্যাতি না

থাকলেও তাদের আহ্বান করি। তারাও লিখতে রাজী হন। এদের নাম সরসী কুমার সরস্বতী এবং নীহাররঞ্জন রায়। বাংলার ইতিহাসে শিল্প সম্বন্ধে এই অধ্যায়টি লিখেই তারা সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তী কালে শিল্প আলোচনা ক্ষেত্রে তারা যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, এ দেখে আমার লেখক নির্বাচন যে ভুল হয়নি এই ভেবে আমি খুবই আনন্দ পাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এর বহুকাল পরে এবং এমন কি বর্তমান বৎসরেও ইতিহাস গ্রন্থে ভারতের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করার মতো যোগ্য লেখক বড় বেশী খুঁজে পাওয়া যায় না। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত History and Culture of the Indian People গ্রন্থমালার সম্পাদকরূপে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এদেশে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনায় সকল বিষয়েই লেখার একাধিক উপযুক্ত লোক আছে—কেবল দুটি ব্যতিক্রম—শিল্প ও ধর্ম। এই দুই বিষয়ে উপযুক্ত লোক খুঁজে বার করতে আমাকে বরাবরই বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের জন্য যে সরসী কুমার সরস্বতীকে নির্বাচিত করেছিলাম ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত ইতিহাসে এবং ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস পরিকল্পিত ইতিহাসে শিল্প সম্বন্ধে অধ্যায় তাকেই লিখতে হচ্ছে। এ বিষয়ে আর কোন উপযুক্ত লোকের সন্ধান আজও আমি পাইনি।

বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরেশ দাস নামে একটি ছাত্র ছিল—অতি দরিদ্র কিন্তু খুব মেধাবী। পরবর্তী জীবনে নানা চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের ফলে সে একটি প্রেসের মালিক হয়। তাকে সাহায্য করার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রোমাগুলি তার প্রেসে ছাপানর ব্যবস্থা করি। আস্তে আস্তে এই প্রেসটি বেশ ভাল হয়ে ওঠে—এর নাম হয় জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। এই প্রেসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ইতিহাস ছাপা হয়। সুরেশ নিজে যত্ন নিয়ে ছাপার যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করায় বইটির ছাপা খুব ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। সুরেশের এই প্রেস এখন খুবই বড় হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে সুরেশকে অন্যতম বলে মনে করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের প্রথম ভাগের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা অসঙ্গত। কারণ আমিই এর সম্পাদক ছিলাম। তবে সাধারণভাবে বলতে পারি সে সময় এই বইএর খুব আদর হয়েছিল এবং এখনও আছে। বহুদিন যাবৎ এই গ্রন্থ নিঃশেষিত। এ বই বাজারে পাওয়া যায় না। এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের কাছে শুনেছি ১৮০ টাকা দিয়ে তিনি এ বইএর একটি পুরনো কপি সংগ্রহ করেছিলেন। এর কারণ এ বই প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের অন্তর্গত হয় এবং আমার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় এ বই ছাপাতে রাজী হন নি। একবার তারা প্রস্তাব করেছিলেন যে গ্রন্থটি যেমন আছে ঠিক সেই ভাবেই এর পুনর্মুদ্রণ হোক। তাতে আমি আপত্তি জানাই। কারণ প্রথম প্রকাশের পর ২৫/৩০ বছর পার হয়েছে। এর মধ্যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জানা গেছে। সুতরাং এ বইটির সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দরকার। এই প্রস্তাবে তারা সম্মত হননি। বছর দুয়েক আগে শুনি যে আমেরিকা থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করেছেন। ঢাকায় পত্র লিখে জানলাম যে খবরটি সত্য অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের একখণ্ড আমাকে পাঠান তারা আবশ্যক মনে করেননি। এই পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থও এখন ভারতে পাওয়া যায় না।

(১৭)

এই সময় ঢাকায় ইতিহাসে গবেষণার কাজও বেশ ভালভাবে চলতে থাকে। যে কয়জন ছাত্র আমার কাছে রিসার্চ আরম্ভ করেছিল তাদের মধ্যে ধীরেন গাঙ্গুলী, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী ও শশীভূষণ চৌধুরী পরবর্তী জীবনে খ্যাতি লাভ করেছে। আর একজন—হিমাংশুভূষণ সরকার—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করে এবং যবদ্বীপের কবি ভাষা আয়ত্ত করে সে যবদ্বীপের ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একখানি ভাল বইও লেখে। বিশ্ব-

বিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র চাকরি গ্রহণ করার পর অনেকদিন পর্যন্ত সে আর গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারেনি। চার পাঁচ বছর হল সে আবার এ বিষয়ে চর্চা সুরু করেছে। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেছে; দু'একটি বড় বইও শীঘ্রই প্রকাশিত হবার কথা।

(১৮)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার অনেক কথা এতক্ষণ বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনযাত্রার যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কথা দীর্ঘকাল পরে আজও আমার মনে অম্লান হয়ে জেগে আছে, এবার তারই কথা বলছি। প্রথমেই মনে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলনের কথা। পূর্বেই বলেছি যে ঢাকা সহরে ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ নামে দুটি পুরনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দুই কলেজে বি. এ. পড়ান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের পুরনো স্মৃতি বজায় রাখা এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখানর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন তৈরী দুটি হোস্টেলের নাম রাখা হয় ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল। এই হলের কথা পূর্বেই বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রকে এর যে কোন একটি হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। এই দুই হল থেকে জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জগন্নাথ হলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র এবং পুরাতন জগন্নাথ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে এমন সব ছাত্র জগন্নাথ হল ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশনের সভ্য হল। ঢাকা হলেও অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট হিসেবে আমাকে জগন্নাথ হল ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন গড়ে তোলার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করতে হয়। বহু পুরাতন ছাত্রের—যারা তখন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—অকুণ্ঠ সাহায্যেই এ কাজ সম্ভব এবং সার্থক হয়েছিল।

প্রতি বৎসর একবার এই সম্মেলন হত। সভাপতিত্ব করতেন জগন্নাথ

কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সন্ধ্যার সময় একটি সভা হত। সেখানে সভাপতি জগন্নাথ কলেজে তাঁর ছাত্র-জীবনের স্মৃতিকথা মনোরম ভাষায় ব্যক্ত করতেন। তার পর ঐ কলেজের পুরনো ছাত্রদের মধ্যে ৫।৬ জন তাঁদের নিজেদের ছাত্র-জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। ঢাকা জগন্নাথ হলের প্রাক্তন ছাত্ররা সময় বিচারে তখনও তেমন পুরনো না হলেও, নিজেদের কথা তারাও কিছু নিবেদন করত।

বক্তৃতার পর অমোদ প্রমোদ এবং নাটক অভিনয় এবং সবশেষে হলের বিশাল প্রাঙ্গনে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে প্রায় সাত আটশ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রের একসঙ্গে খাওয়া। বিরাট ভোজের আয়োজন। সে সময় ঢাকায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল কম—সে কথা পরে বলব। এক সঙ্গে এত লোকের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এই কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রতি বৎসরই তাঁদের উপর এ কাজের ভার দেওয়া হত। কার্ডে আসনের নম্বর দেওয়া থাকত; কাজেই বসবার কোন অসুবিধা হত না। জগন্নাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, জগন্নাথ হলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং শহরের কয়েকজন ধনীব্যক্তির চাঁদার সাহায্যে এই বিরাট ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হত। প্রতি বৎসরই পুরাতন ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম জনপ্রিয় সম্মেলন বোধহয় আর কিছু ছিল না এবং কখনও হয়নি। প্রতি বৎসর একটি দিনের প্রীতি-সম্মেলনে সকলেই আনন্দে যোগ দিতেন। এই অনুষ্ঠানের কথা আজও আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। ঢাকা হলেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হত।

আর যে-কথা আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে তা হল ইতিহাস বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে নানা ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ। প্রায় দশ বার বার আমি নিজেই ছাত্রদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিছু অর্থ সাহায্য করতেন; ছাত্ররাও কিছু ব্যয় বহন করত। উত্তর ভারতের বহু ঐতিহাসিক স্থানে আমি ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে বেড়িয়েছি। একবার

রাজগীর গিয়েছিলাম। সেখানে থাকার তেমন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। এক পাণ্ডার বাড়ীতে আমরা উঠেছিলাম। সারা দিন ঘুরে বেড়ান এবং বড় ফরাস পেতে রাত্রে নিদ্রার ব্যবস্থা। একদিন একটি জঙ্গলা জায়গায় গিয়ে পথ খুঁজে পাইনে। তখন দ্বিপ্রহর বারোটা কিম্বা একটা। কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছি, পথ মিলছে না। বেশ চিন্তায় পড়েছি। এমন সময় চোখে পড়ল নালা বা খালের মতো একটি পথ ডাইনে বাঁয় এঁকে বেঁকে চলে গেছে। মনে হল দুর্গের চারপাশে একটি পরিখা ছিল। এ ধরে এগিয়ে গেলে দুর্গের যে তোরণদ্বার সেখানে আমরা পৌঁছতে পারব। তোরণ দ্বারটি খুবই পরিচিত: আমাদের থাকার জায়গার কাছেই। সত্য সত্যই নালা ধরে এগোতে এগোতে আমরা তোরণ দ্বারে এসে পৌঁছলাম। বেলা তখন দুটো কিম্বা আড়াইটা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের জ্ঞান থাকলে যে অনেক বিপদে উদ্ধার পাওয়া যায়—অনেকটা একারণে এই ঘটনাটির কথা আমার মনে আছে।

দিল্লী, মথুরা বৃন্দাবন, কাশী, গয়া ইত্যাদি বহুস্থান ছাত্রদের নিয়ে ঘুরেছি। এই উপলক্ষে তাদের সঙ্গে যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হত তা আমার জীবনে আজও আনন্দের স্মৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে এমন মেলামেশা, একসঙ্গে এতদিন কাটান সম্ভব ছিল না। এই সব যুবকদের সাহচর্যে আমারও যেন যৌবনকাল ফিরে আসত।

ঢাকার আর একটি বিশেষ স্মৃতি লাঙ্গলবন্ধের স্নান। অনেকে জানেন প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের পুরনো খাতে সামান্য জল থাকে। বিশেষ কয়েকটি দিনে সেখানে স্নান মহাপুণ্য বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। এই স্থানটি নারায়ণগঞ্জ থেকে কয়েক মাইল দূরে। যাত্রীদের দেখাশোনা এবং নিজেদের স্নানের জন্য হলের অনেক ছাত্র সেখানে যেত। আমিও কয়েকবার গেছি। সেখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল না; গাছের নীচে দিন কাটাতে হত। বয়স্ক বা শিশু স্নানার্থীদের সুখ সুবিধা, কেউ হারিয়ে গেলে খোঁজ করা, খবরাখবর দেওয়া

ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছাত্ররা লক্ষ্য রাখত। এ ছাড়া নিজেদের স্নান করা তো ছিলই।

একবার স্নান সেরে সন্ধ্যার পর আমরা ঢাকায় ফিরছি। শহরে পৌঁছেই টের পেলাম যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়েছে। শহরে খুনোখুনি হচ্ছে। সমস্ত ছাত্রদের একত্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক একজন ইউরেশিয়ান সার্জেন্টকে নায়ক করে আমরা অগ্রসর হলাম। নবাবপুরে পৌঁছে দেখি ভীষণ গণ্ডগোল। সার্জেন্ট বন্দুক হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। অক্ষত দেহে আমরা বাড়ী পৌঁছলাম। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তবে এই শেষ নয়। সেকথা পরে বলব।

ঢাকায় আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান জন্মাষ্টমীর মিছিল। এটি একটি বিরাট ব্যাপার। এ দেখবার জন্য বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে লোকে ঢাকায় আসত। মিছিলে নানা জিনিসের সমাবেশ—গাড়ী ঘোড়া, সোনারূপার জরি চৌকী, কাঠ ও বাঁশের তৈরী নানা রকম মঞ্চের উপর অভিনয়। বছরে দুদিন এই মিছিল বেরত—একদিন বার করতেন নবাবপুরের বসাকরা; আর একদিন ইসলামপুরের বসাকরা। কোন মিছিলটি ভাল হয় এ নিয়ে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পূর্বে যে মঞ্চের উপর অভিনয়ের কথা বলেছি তার মধ্যে এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিগত এক বৎসরের নানা নিন্দা বা কুৎসার ঘটনা নানাভাবে দেখাত। অনেক সময় দেশের হালচাল সম্বন্ধে অনেক ছড়া, অনেক সামাজিক কুপ্রথাও অভিনয় বা গানের মধ্যে দেখান হত। সত্য বলতে মিছিলের মধ্যে এই অভিনয়ের ব্যাপারটি ছিল খুবই উপভোগ্য। বয়োবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি তাঁরা বাল্যকালে এই মিছিল দেখেছেন এবং তাঁদের বাপ ঠাকুরর্দ্দার কাছেও মিছিলের কথা শুনেছেন। এ মিছিল যে একশ দেড়শ বছরের পুরনো তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকার এই জন্মাষ্টমীর মিছিল লোপ পেয়েছে।

ছাত্র ও নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি মিছিল দেখতে যেতাম।

অসম্ভব ভীড়, গাড়ী নিয়ে কাছে যাওয়া যেত না। যে রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবে তার দুপাশের বাড়ীর ছাদ ও বারান্দা সব ভাড়া করা হত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখাও সম্ভব ছিল না। অনেক দোকানী এ সময় বেশ আয় করত।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল ও ঝুলনের সময় নাচ গান খুবই প্রসিদ্ধ। বসাকেরা বৈষ্ণব ছিলেন। সেকারণে এই দুটি এমন জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। বাংলা দেশের আর কোন জায়গায় যে এই দুটি পাল পার্বণে এমন জাঁকজমক হয় তা আমার জানা নেই। ঢাকার স্মৃতির সঙ্গে এই দুটি উৎসবের স্মৃতি আমার মনে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

(ক্রমশঃ)

———

বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের অবদান

অমলেন্দু দে

কলকাতা শহর হতে ত্রিশ মাইল দূরে চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামের বিখ্যাত জমিদার বংশে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সুরেন্দ্র নাথ ও মাতা ক্ষিরোদ মোহিনী। এই দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রকেতু দত্ত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী (মুন্সী) ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তিনি দক্ষিণ দিকে চলে এসে গঙ্গা নদীর তীরে একটি নতুন গ্রামের পত্তন করেন। পরে এই গ্রামের নামকরণ হয় মজিলপুর। কালিদাস দত্তের মাতা ছিলেন বারাসত মহকুমা শহরের বিখ্যাত 'মিত্র' বংশের কন্যা। তাঁর মাতামহ রাজকৃষ্ণ মিত্র বিদ্যাচর্চা, সমাজ সেবা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মজিলপুরের নিকটবর্তী বহড়ু পল্লীর ইংরেজী বিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কালিদাস দত্ত আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররূপে যোগ দেননি।[১] তবে কৈশোর কাল থেকেই তিনি অসাধারণ পাঠানুরাগী ছিলেন এবং নিজের বাড়ীতে একটি পাঠাগার ও পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা স্থাপন করেন। এই পাঠাগারে তিনি নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ বিশেষ করে ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। গভীর অনুসন্ধানী মন নিয়ে তিনি ইতিহাস-চর্চা সুরু করেন। একান্তই নিজস্ব প্রচেষ্টায় তিনি সংস্কৃত, পালি ও ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রখ্যাত লেখকদের রচনা পাঠ করেন। প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে কালিদাস দত্তের পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর রচনাবলী পাঠ করলেই বোঝা যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর থেকে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি একটানা কঠোর পরিশ্রম করে

এবং স্বীয় প্রতিভার দ্বারা নিম্ন বঙ্গের বিশেষভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন ও লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস উদ্ধার করেন। এই অঞ্চল হিংস্র পশু ও বিষধর সর্পের আবাসস্থল ছিল। কিন্তু এইসব কিছু অগ্রাহ্য করে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্য কালিদাস দত্ত দিনের পর দিন নৌকায় বাস করেন, অথবা কখনও পদব্রজে সুন্দরবনের মহাদুর্গম পথ অতিক্রম করেন। নিম্ন বঙ্গের প্রায় প্রতিটি স্থানে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে তিনি অনেক দুর্লভ পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে কারও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না বল্লে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। তিনিই প্রথম এখানকার অন্ধকারময় ইতিহাস আবিষ্কারে উদ্যোগী হন।২

নিম্নবঙ্গের প্রাচীন ও লুপ্ত সভ্যতার বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় রচনা করেন। এই সব গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রাফ', 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি, 'সাইন্স এণ্ড কালচার', 'মডার্ণ রিভিউ', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' এবং চব্বিশ পরগণা জেলা হতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মনোগ্রাফে' নিম্নবঙ্গে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ সবিশেষ বর্ণনা করেন।৩ অষ্টাদশ শতকের শেষে সুন্দরবন অঞ্চলে (বর্তমান চব্বিশপরগনা জেলার দক্ষিণে নিম্নঅঞ্চলে) চাষবাসের সংগে সংগে অনেক গ্রামের পত্তন হয়। এখানে বেশীরভাগ অধিবাসী ছিলেন কৃষিজীবি। আর চারিদিকে ছিল বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। এই গ্রামগুলি ও ধানের ক্ষেত রক্ষার জন্য বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই অঞ্চলে চাষবাসের সূচনা ও বসতি স্থাপনের ফলে পুকুর, খাল, নালা কাটতে গিয়ে বহু সংখ্যক প্রাচীন দালান ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, পাথর ও ধাতুর তৈরি হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি, শিলালিপি ও মুদ্রা পাওয়া যায়।৪ কালিদাস দত্ত যেসমস্ত পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন তারমধ্যে একহাজার বছরের প্রাচীন-আদি-মধ্য যুগীয় প্রস্তর ভাস্কর্য ও ব্রোঞ্জদ্রব্য, নব্য প্রস্তর যুগীয় হাতিয়ার, পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি ও মৃৎপাত্র, কাঠের খোদাই কার্য, নানারূপ মুদ্রা, অঙ্কনশিল্প, ঐতিহাসিক দলিল, প্রাচীন পুঁথি ও মানচিত্র রয়েছে। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার

হরিনারায়ণপুরে (ডায়মণ্ডহারবারের চারমাইল দক্ষিণে কুলপী থানার অন্তর্ভুক্ত) বড় ও সুন্দর ফুলদানি পেয়েছেন। এর গড়ন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত ও প্রাচীন রোমে প্রাপ্ত ফুলদানির মত।* এইসব সংগ্রহের মধ্যে এমন সব জিনিষপত্র রয়েছে যার সাহায্যে আদিম এবং মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত-পাল-সেন যুগের বাংলার অতীত ইতিহাস জানা যায়। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১০৭৮ হিজরি সনের আওরঙ্গজেবের একটি মূল্যবান সনদও রয়েছে। কালিদাস দত্ত এই সনদের যে ইংরেজী অনুবাদ করেন তা নিম্নরূপ: "It purports to be the renewal of a previous Sanad by which 26 bighas of land in Pargana Muragacha were conferred as a Brahmottar on Ratneswar Chakravarti." তাছাড়া তিনি রেনেল সম্পাদিত দুর্লভ মানচিত্র, দুহাজার মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করেন।

এই সব প্রাচীন নিদর্শনের সাহায্যে কালিদাস দত্ত সিদ্ধান্ত করেন যে, আদিম যুগেও নিম্নবঙ্গে মনুষ্য বসতি ছিল এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটে। পাঁচটি পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি, দশটি প্রস্তরের হাতিয়ার এবং আটটি হাড় দিয়ে প্রস্তুত সূক্ষ্মাগ্র কাঁটা তাঁরই সাক্ষ্য বহন করছে। এই ধরণের নিদর্শন নিম্নবঙ্গে এই প্রথম পাওয়া গেল। কিন্তু এইসব যারা নির্মাণ করেছে তাদের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে আজও আলোকপাত করা যায় নি। হরিনারায়ণপুরে খননকার্য চালালে হয়তো অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।৬ আরও কিছু দুর্লভ পুরাবস্তু সংগ্রহের পর তিনি বলেন: "The discovery of these antiquities now undoubtedly establishes the fact that this part of lower Bengal is not a newly-born region and human settlements existed here from remote times." ৭

পরবর্তীকালে গুপ্ত, পাল, সেন রাজাদের আমলে এখানে বহু জনপদ গড়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করবার উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন জনপদ, প্রাচীন মন্দির, আঞ্চলিক দেবতা ও লোকগাথা নিয়েও বিশদভাবে আলোচনা করেন। পাল যুগে (৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) 'জটার দেউল' নামে

একটি সুন্দর উত্তুঙ্গ মন্দির মথুরাপুর থানার অধীনে ১১৬ নম্বর লাটে (মনিনদীর নিকটে) নির্মিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। ইতিপূর্বে হিংস্র জন্তুর বিচরণস্থল গভীর অরণ্যে অবস্থিত মন্দিরটির কথা কেউ জানত না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের নিকটে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত ভাষার তাম্রলিপি হতে জানা যায় যে, রাজা জয়ন্ত চন্দ্র 'জটার দেউল' নির্মাণ করেন। কিন্তু পরে এই লিপিখানি হারিয়ে যায়। এই মন্দিরটি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি, তাই কালিদাস দত্ত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সমালোচনা করেন। তাঁর ধারণা এটি একটি শিবের মন্দির ছিল। তিনি এখানে অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যেসব মুদ্রা সংগ্রহ করেন তার মধ্যে ৩টি মুদ্রা ছিল কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত। কিন্তু কোন লিপি না থাকায় উহা কোন্ রাজার আমলে চালু করা হয় তা বলা যায় নি। 'জটার দেউল' এর নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রা সম্পর্কে কালিদাস দত্ত বলেন: "কুষাণ যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশের নৃপতিগণ সম্রাটদের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা নির্মাণ করাইতেন। উড়িষ্যাতে পুরী ও গঞ্জাম জেলায় ঐ জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলি কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত। জটার দেউলের পূর্বোক্ত মুদ্রাগুলি কুষাণ যুগে দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত উল্লিখিতরূপ মুদ্রা হওয়া অসম্ভব নহে"।[৮] জটার দেউলের কাছে ভূগর্ভ খননকালে একটি কালো পাথরের বড় বিষ্ণু মূর্তির দেহের ভগ্নাংশ কালিদাস দত্ত পান। বর্তমানে সেটি আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে। কালিদাস দত্তের মতে এই মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর হবে।[৯] জটার দেউলের পশ্চিম দিকে কঙ্কণদীঘিতে যে কয়েকটি প্রাচীন ইটের স্তূপ ও অনেক পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তার সংগে জটার দেউলে প্রাপ্ত জিনিষপত্রের সাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয় এখানে জনপদ একই সময়ে গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলে খননকার্যের প্রয়োজনীয়তা কালিদাস দত্ত উল্লেখ করেন।[১০]

একটি প্রবন্ধে তিনি এই অঞ্চলে প্রাপ্ত দুটো প্রস্তর-ভাস্কর্য—সূর্য ও নবগ্রহ—বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। সূর্য মূর্তিটি জয়নগর থানার অন্তর্ভুক্ত

কাশীপুর গ্রামে পুকুর কাটার সময় পাওয়া যায়। এই মূর্তিটি গুপ্ত যুগের শেষের দিকের হবে এবং বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়ামে আছে। ঠিক এই ধরণের মূর্তি আর একটি মাত্র বাংলা দেশের বগুড়া জেলায় পাওয়া যায়। আর নবগ্রহ ফলকটি মধুরাপুর থানার অন্তর্গত কঙ্কনদীঘির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়।১১

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত খাড়ী নামক একটি প্রাচীন গ্রাম নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। প্রাচীনকালে আদি গঙ্গা নদী এই গ্রামের পশ্চিম সীমা দিয়ে প্রবাহিত হত এবং এটি ছিল নিম্নবঙ্গের পশ্চিমাংশের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।১২ খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত ডাকর্ণব নামক একখানি পুঁথিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা চৌষট্টি পীঠস্থানের মধ্যে একটি পীঠস্থানরূপে এই গ্রামকে মনে করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজা লক্ষণ সেনের আমলে একখানি তাম্রশাসন খাড়ীর নিকটবর্তী বকুলতলা গ্রামে একটি পুকুর কাটার সময় পাওয়া যায়। এই তাম্র শাসনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে সেন রাজাদের শাসনকালে (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী) খাড়ী তৎকালীন শাসন বিভাগ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির মধ্যে খাড়ী মণ্ডলের সদর স্থান ছিল। মহারাজা লক্ষণ সেন ব্যাসদেব শর্মা নামক একজন ব্রাহ্মণকে নণ্ডল গ্রামে যে ভূমিদান করেন তা এর অন্তর্গত ছিল। হিন্দুরাজারা শাসনের সুবিধার জন্য বাংলা দেশকে 'ভুক্তি' নামক কয়েকটি বড় বিভাগ এবং 'ভুক্তির' অধীনে 'মণ্ডল' নামক কয়েকটি ছোট বিভাগে ভাগ করেন। ভুক্তির শাসন কর্তাকে 'ভুক্তিশ্বর' ও মণ্ডলের শাসনকর্তাকে 'মণ্ডলেশ্বর' বা 'মণ্ডলাধিপ' বলা হত। এঁরা রাজার অধীনে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এক একটি মণ্ডলের আয়তন বিশাল ছিল। এর সুশাসনের প্রয়োজনে মণ্ডলেশ্বরের কোষ, দণ্ড, আমাত্য ও দুর্গের ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবত পশ্চিম সুন্দরবন খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।১৩ এখানে কালিদাস দত্ত কয়েকটি মজা পুকুর ও গড় আবিষ্কার করেন। তাছাড়া তিনি অনেক পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একটি ছোট বিষ্ণুমূর্তি এবং চারটি খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কালো পাথরের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরের window

frame আছে। বর্তমানে এখানে যদুনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর একটি কালো পাথরের তিন ফিট উচ্চ বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হচ্ছে। পুরাতন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও এখানে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং ৩০-৪০ ফিট উচ্চ বাঁধ দ্বারা ঘেরা দুটো বড় পুকুরের বুজিয়া যাওয়া স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কালিদাস দত্ত মনে করেন যে, এগুলো খাড়ী মণ্ডলেরই 'প্রাচীন গ্রাম নগরাদির নিদর্শন'।১৪

মুসলমান আমলের কিছু উপকরণও খাড়ীতে পাওয়া যায়। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে এখানে কয়েকজন পীরের আগমন হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ধর্ম প্রচার ও বিস্তার করা। বড়খাঁ গাজী ছিলেন এমনি একজন বিখ্যাত পীর এবং খাড়ীতে তাঁর আস্তানা ছিল। তিনি চব্বিশ পরগণার বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। বড়খাঁ গাজীর কার্যকলাপ ও শক্তি সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। এখনও তাঁর সম্পর্কে নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে লোকসঙ্গীত শোনা যায়। এই সময়ে দক্ষিণ রায় নামক একজন শক্তিশালী ব্যক্তি অরাজকতায় উৎপীড়িত হিন্দুদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ করা যাতে সম্ভব না হয়, সেজন্য তিনি প্রবলভাবে বড়খাঁ গাজীকে বাধা দেন। ফলে এঁদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হত। বড়খাঁ গাজীর সংগে দক্ষিণ রায়ের বিরোধের খবর রায় মঙ্গলে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে দক্ষিণ রায়ও খাড়ীতে এসে থাকতেন। কালিদাস দত্ত বলেন: "উক্ত দক্ষিণ রায়ই তাঁহার অসাধারণ শক্তি, পরহিতৈষণা এবং স্বধর্ম ও স্বজাতি প্রীতির নিমিত্ত পরে হিন্দুদের দেবতায় পরিণত হন। আজিও নিম্নবঙ্গের নানাস্থানে তাঁহার ঘোড়ুবেশী মূর্তির পূজা হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে তাঁহার ঐরূপ যে সমস্ত মূর্তি আছে তন্মধ্যে বারুইপুর থানার অধীন ধপধপি গ্রামের মূর্তিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ"।১৫

'খাড়ি মণ্ডল' নামক আর একটি প্রবন্ধেও (ভারতবর্ষ, বাংলা ১৩৩৩ সন) কালিদাস দত্ত এই গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেন আমলের পরে

খাড়ী মণ্ডলের যে অংশে লোকালয় ছিল তা নিয়ে মুসলমান আমলে খাড়ী পরগণা গঠন করা হয়। আইন-ই-আকবরীতেও খাড়ীর উল্লেখ আছে। বর্তমান সময়ে খাড়ীতে যে লোকালয় দেখা যায় তার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। তার পূর্বে এই অঞ্চল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল।১৬

চব্বিশ পরগণা জেলার আরও দুটো পুরাতন গ্রাম সরিষাদহ ও দক্ষিণ বারাসত সম্পর্কেও তিনি অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ করেন।১৭ সরিষাদহ গ্রামটি জয়নগর থানার মধ্যে অবস্থিত। অনেককাল আগে এই গ্রামের পশ্চিম দিক্ দিয়ে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হত। তখন এখানে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিন্তু পরে ভাগীরথীর প্রবাহ লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এর শুষ্ক গর্ভ 'গঙ্গার বাদা' নামে এক বিস্তৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হয়। সরিষাদহের পশ্চিমে এখনও এই 'গঙ্গার বাদা' রয়েছে। সম্প্রতি এর দক্ষিণে গঙ্গার বাদার নিকটে মাটি কাটার সময় কালো পাথরের নির্মিত একটি প্রায় চার ফিট উচ্চ সুন্দর বিষ্ণু মূর্তি ও একটি কারুকার্য খোদিত প্রায় ১০ ফিট উচ্চ কালো প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর কাছে কালো পাথরের সুন্দর নৃসিংহ মূর্তিও পাওয়া গেছে। তাছাড়া এখানে প্রায় সাড়ে তিন ফিট উচ্চ কালোপাথরের পেনেট সহ শিবলিঙ্গও পাওয়া যায়। এই শিবলিঙ্গ এখন একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে সরিষাদহের হিন্দুদের আরাধ্য দেবতারূপে বিরাজ করছেন। এই অঞ্চলের নিকটে 'কাজীরডাঙ্গা' নামক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এই ধরণের মূর্তি অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। এখানকার পুরবস্তুসমূহের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেন: "এই কাজীর ডাঙ্গা নামক স্থানটী বহুসংখ্যক প্রাচীন ইষ্টক সমাকীর্ণ। আমার বোধ হয়, এই স্থান খনন করিলে এখনও বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। ইহার উপর কয়েকটী মুসলমানের কবর আছে বলিয়াই লোকে এখনও স্থানটী খনন করিতে সমর্থ হয় নাই। উপরিউক্ত নিদর্শনগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে গঙ্গাতীরস্থ এই সকল স্থানে বিষ্ণু মন্দিরের সংখ্যাই অধিক ছিল। এই মূর্তিগুলি কতদিনের প্রাচীন তাহা জানা যায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্

পণ্ডিতগণের মতে পাল ও সেন রাজগণের সময়েই বঙ্গদেশে ঐরূপ সুন্দর দেবমূর্তি নির্মিত হইত" ।১৮

সরিষাদহ গ্রামের পশ্চিমদিকে রয়েছে দক্ষিণ বারাসত গ্রাম। প্রবাদ আছে, পুরাকালে উজানি নগরের বিখ্যাত বণিক ধনপতি দত্তের পুত্র শ্রীমন্ত ভাগীরথীর পথে সিংহলে যাবার সময় এখানে এসে 'শতবারা'র (বারা-ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নাম) পূজা করেন বলে এই অঞ্চলের নাম বারাসত হয়েছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্যেও এই স্থানের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ বারাসতে আদি মহেশ্বর নামক একটি পুরাতন মন্দিরে লিঙ্গমূর্তি আছে। বকুলতলায় ও বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন দেবের যেদুটো তাম্রশাসন পাওয়া যায়, তাতে জানা যায়, "প্রাচীনকালে আদিগঙ্গা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ পূর্ব্বোক্ত সরিষাদহ প্রভৃতি স্থান প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত খাড়ী মণ্ডলের ও পশ্চিমতীরস্থ এই দক্ষিণ বারাসত প্রভৃতি গ্রাম পুরাতন বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল" ।১৯ কালিদাস দত্ত 'আদি গঙ্গাতীরস্থ সুন্দরবনের কথা' নামক প্রবন্ধে এ দুটো তাম্রশাসন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আইন-ই আকবরী থেকে জানা যায়, মুসলমান আমলে এই সব জায়গা সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত ছিল। পরে এই অঞ্চল বরিদহাটী ও ময়দা পরগণার মধ্যে ছিল ।২০

তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে জয়নগর গ্রামের অতীত ইতিহাস আলোচনা করেন ।২১ এই গ্রামের পূর্ব সীমায় ছিল আদিগঙ্গা নদী। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত রায় মঙ্গল কাব্যে সর্বপ্রথম এই অঞ্চলের নাম 'জয়নগর' বলা হয়েছে। অনেকের মতে এখানকার আরাধ্যা দেবী জয়চণ্ডী থেকে জয়নগর নামের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 'দেশাবলী বিবৃতি' নামক সংস্কৃত পুঁথিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানকার একজন পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরাজিত করায় রাজা এই স্থানের নাম জয়নগর দেন। অবশ্য কোন্ সময়ে এই ঘটনা ঘটে তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না ।২২ জয়নগরে হিন্দুদের যে সমস্ত দেবদেবী রয়েছে তার মধ্যে শ্রীশ্রীজয়চণ্ডী ও শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতিলাল বংশের পূর্বপুরুষ গুণানন্দ মতিলাল তিনশত বৎসর পূর্বে এখানে শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে

এখানে বসবাস সুরু করেন। এখানকার আর একটি প্রাচীন বংশ হল মিত্র বংশ। এই বংশের পূর্ব পুরুষ রামগোপাল মিত্র কবে থেকে এখানে বসবাস সুরু করেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাঁর বংশধরেরা এখানে অষ্টাদশটি দেবমন্দির, অনেক অট্টালিকা ও ঘাট নির্মাণ করেন। সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরিভাগে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে তা থেকে জানা যায় রামগোপাল মিত্রের পৌত্র কামদেব মিত্র কর্তৃক ১৬৮৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তথ্য থেকে কালিদাস দত্ত সিদ্ধান্ত করেন যে, সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে রামগোপাল মিত্র এখানে বসতি স্থাপন করেন। এই মিত্র বংশের দ্বারা স্থাপিত দু-তিনটি মন্দির নানারূপ কারুকার্য মণ্ডিত ইষ্টকদ্বারা শোভিত ছিল এবং তাতে অনেকগুলি মিথুনমূর্তিও ছিল। পরে এগুলো কেউ নষ্ট করে ফেলে। পুরাতন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে তার উল্লেখ আছে।[২৩] শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের দারুময় যুগল মূর্তি উচ্চতায় প্রায় চার ফিট। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে এই মূর্তি দুটো খাড়ীতে ছিল এবং খাড়ীর প্রাচীন জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর অরণ্যাবৃত হওয়ায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রাজা প্রতাপাদিত্য এই মূর্তি দুটো ওখান থেকে নিয়ে এসে জয়নগরে স্থাপন করেন। বর্তমানে যে মন্দিরে এই যুগল মূর্তি আছে তা দেড় শত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ বারাসতের চৌধুরী বংশ কর্তৃক নির্মিত হয়। তার পূর্বে এই মূর্তি অন্য একটি মন্দিরে ছিল।[২৪]।

তাছাড়া জয়নগরের রক্তাখাঁ নামক জায়গায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ওলাবিবি নামক একটি প্রাচীন লৌকিক দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মাটির ঢিবিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। এঁর কোন মূর্তি নেই। বর্তমানে এই দেবতা ইষ্টক নির্মিত গৃহের মধ্যে আছেন। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এই দেবতা তুষ্ট থাকলে ওলাউঠা (কলেরা) রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ওলাবিবির পূজা করেন। অনেকলোক এক সংগে নানারূপ ফল-মিষ্টান্ন ও এই দেবতার 'ছলন' নামে একটি ছোট মূর্তি মাটির ঢিবির কাছে রেখে দেয়। তখন মুসলমান পুরোহিত

এই সব জিনিষ ওলাবিবিকে উৎসর্গ করে দেন। প্রবাদ আছে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে রক্তাখাঁ স্থানটি প্রসিদ্ধিলাভ করে। তবে রক্তাখাঁ নামের উৎপত্তি এখনও অজ্ঞাত। কালিদাস দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, মুসলমান আমলে প্রচলিত গাজীর গানের মধ্যে রক্তাখাঁ গাজী নামে বিখ্যাত একজন গাজীর গানও ছিল। এই রক্তাখাঁ গাজীর গানের পুঁথি নিমপীঠ-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র গায়েনের কাছে পাওয়া যায়। তাই এখানে হয়তো রক্তাখাঁ গাজীর আস্তানা ছিল। এখনও ওলাবিবির গান লোকগাথারূপে প্রচলিত আছে। মুসলমান আমলে একশ্রেণীর লোক আঞ্চলিক দেবতা ও গাজী নামে অভিহিত পীরের নামে গান রচনা করে গেয়ে বেড়াত। এইভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। এখনও তাদের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এই বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করছে। তেমনি সুন্দরবনের দেবতা বনবিবিকে নিয়েও লোকগাথা শুনতে পাওয়া যায়। এই সব লোকগাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ না করার জন্য কালিদাস দত্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।২৫ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়নগরে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে একটি টাউন কমিটি গঠন করে মজিলপুর ও জয়নগর গ্রামের রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এই টাউন কমিটিকে বাংলা দেশের একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা যায়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। তখন টাউন কমিটি উঠে যায়। আর জয়নগর থানা বারুইপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়।২৬

চব্বিশ পরগণা জেলায় জৈনধর্মের প্রভাব সম্পর্কেও কালিদাস দত্ত আলোচনা করেন। তিনি সুন্দরবনের কয়েকটি লাটে তিনটি জৈনমূর্তি পান। জয়নগরের দক্ষিণে করঞ্জলি গ্রামে পুকুর কাটার সময় ছয় ফিট উচ্চ পার্শ্বনাথের একটি সুন্দর মূর্তি পাবার পর কালিদাস দত্ত লেখেন: "সেই মূর্তি কয়টির আবিষ্কারে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে সুন্দরবনের ন্যায় বঙ্গদেশের সুদূর প্রদেশেও জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আমার মনে হয়, এই সমস্ত প্রাচীন স্থানের খননকার্য চলিলে এই প্রদেশ হইতেও বঙ্গদেশের জৈন সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ অনেক পাওয়া যাইবে"। ২৮

প্রাচীনবাংলার ভৌগোলিক ও শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলি সম্পর্কে

কালিদাস দত্ত নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি গঙ্গানদীর প্রাচীন গতিপথ নির্ধারণ করেন। তাঁর মতে "অধুনা খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ সেতুর নিম্ন দিয়া হুগলী নদীর যে একটি ক্ষীণ প্রবাহ, প্রথমে পূর্ব্বমুখে ও তৎপরে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া, কালীঘাটের উপর দিয়া 'টালির নালা' বা 'আদিগঙ্গা' নদী নামে প্রবাহিত আছে, উহাই প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর মূল স্রোত ছিল, এবং তৎকালে কালীঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত রসা নামক স্থানের পশ্চিম দিক দিয়া বৈষ্ণব ঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন সূর্যপুর, মুলটী, দক্ষিণ-বারাসত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ ও খাড়ী প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত"। ২৯ তাঁর উক্তির স্বপক্ষে তিনি ষোড়ষ শতাব্দীর বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণরাম রচিত রায়মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এইসব গ্রন্থে ভাগীরথী নদীর প্রাচীন গতিপথ এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। তখন ভাগীরথীর উভয় তীরে বহু জনপদ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল গমন এবং চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরেরা এই প্রবাহপথ ধরেই গিয়েছিলেন। বর্ত্তমানে ভাগীরথীর যে স্থান মজে গিয়ে 'মজাগঙ্গা' বা 'গঙ্গার বাদা' নামে পরিচিত তা গঙ্গানদীর অংশ মনে করে ওখানকার হিন্দুরা শবদাহ করেন এবং তাঁরা ওখানকার পুকুরের জল গঙ্গাজল মনে করে ব্যবহার করেন। তাঁদের ধারণা গঙ্গা এখনও অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যও তাই মনে করতেন এবং তিনি ওখানে শবদাহ করবার ও ওখানকার জল গঙ্গাজলরূপে ব্যবহারের বিধান দেন।৩০ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভাগীরথী নদী উপরে উল্লিখিত জনপদগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছত্র ভোগ নামক স্থানের দক্ষিণ হতে বহু শাখা নদীতে বিভক্ত হয়ে 'গঙ্গার শতমুখ' নামে খ্যাত হয়। চৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে আছে মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রাকালে গঙ্গার শতমুখ দেখে আনন্দে নৃত্য করেন।৩১ প্রচলিত প্রবাদ হল, এই নদীগুলির মধ্যে বিবাটী গাঙ্ বা ঘুঘুডাঙ্গা নদী ভাগীরথীর মূল প্রবাহের অংশ ছিল। ওম্যালি

সাহেবের মতে "উহা কাকদ্বীপের নিম্নদিয়া বর্ত্তমান সাগর-দ্বীপের পূর্বে প্রবাহিত মড়িগঙ্গা নদীতে পড়িয়া সাগর দ্বীপের অন্তর্গত ধবলাটের পশ্চিম দিকস্থ নদীর খাড়ি দিয়া প্রথমে পশ্চিম মুখে ও পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়াছিল। এইজন্যই এখানে ধবলাটের পশ্চিম দিকস্থ নদীর মোহনায় প্রতিবৎসর পৌষসংক্রান্তিতে বিখ্যাত গঙ্গাসাগরের মেলা বসিয়া থাকে।"৩২ প্রসঙ্গত কালিদাস দত্ত সেন আমলের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম সীমা ও বর্দ্ধমান-ভুক্তির দক্ষিণ অংশের পূর্ব্ব সীমা নির্ধারণ করেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে স্থান নির্দেশ করেন তার সংগে তিনি একমত হননি। কালিদাস দত্ত বলেন "শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ হইতে, বর্ত্তমান সময়ে হুগলী নদীর যে অংশ হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্য দিয়া সাগরে মিশিয়াছে, উহাকেই গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী ধরিয়া, উক্ত বিভাগ দুইটির সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা গঙ্গা নদী নহে—অধুনা লুপ্ত সরস্বতী নদীর নিম্নাংশ। পূর্বে একটি ক্ষুদ্র খাল ভাগীরথীর শাখারূপে বর্তমান খিদিরপুরের নিকট আদিগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া, শাঁকরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসন সময় ইংরাজগণ কলিকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য উহা প্রশস্ত করতঃ ভাগীরথীর জলরাশি ঐ পথে চালিত করিয়াছিলেন। গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলিয়া আজিও হিন্দুগণ উহার উপর শবদাহ করেন না এবং উহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলিয়া বিশ্বাস করেন। শাঁকরোল পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত খাল কোন সময়ে কাহার দ্বারা খনিত হয়, তাহা আজিও জানা যায় নাই। ডি, ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও উহা বিদ্যমান ছিল"।৩৩ ননীগোপাল মজুমদার সঙ্কলিত Inscriptions of Bengal গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৯৬) গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের লিপি বিশ্লেষণ করে কালিদাস দত্ত সিদ্ধান্ত করেন: "সেনরাজত্ব কালে বর্দ্ধমান ভুক্তি পূর্বোল্লিখিত আদিগঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমান চব্বিশপরগণা

জেলার অন্তর্গত বেহালা, বিষ্ণুপুর, বজবজ, ফলতা, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও কুলপি থানার সমগ্র অংশ ও আলিপুর, বারুইপুর, জয়নগর ও মথুরাপুর থানার কিয়দংশ, যাহা উক্ত গঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত, বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতডচচতুরকের অধীন ছিল" ।৩৪ এই তাম্র শাসনে উল্লেখ আছে যে, মহারাজা লক্ষ্মণ সেন বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতডডচচতুরকের অধীন বিডডর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক একজন ব্রহ্মণকে দান করেন। এই গ্রামের চতুঃসীমারূপে যেসব স্থান উল্লেখ করা হয়েছে তা হল : উত্তরে ধর্মনগরী সীমা, পূর্বে জাহ্নবী অর্ধসীমা, দক্ষিণে লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা ও পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্র সীমা। কালিদাস দত্তের ধারণা বারুইপুর রেল স্টেশনের নিকটে শাসন নামে যে একটি গ্রাম আছে তাই প্রাচীন কালের বেডডর শাসন গ্রাম। কারণ এই গ্রামের উত্তরে ধর্মনগর নামে একটি লোকালয় এবং পূর্বে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর শুষ্ক খাদ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।৩৫ তিনি একটি মূল্যবান মানচিত্র সহযোগে তাঁর বক্তব্য বিষয় আলোচনা করেন। পরিশেষে কালিদাস দত্ত বলেন : "শ্রীযুত ভট্টশালী মহাশয়, তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে পৌণ্ডবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত খাড়ী মণ্ডলের দক্ষিণাংশের পশ্চিমসীমা হুগলী নদী পর্যন্ত ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, পূর্বোক্ত ঘিবাটী গাঙ্ পর্য্যন্ত আদিগঙ্গা নদী ও তন্নিম্নে বর্তমান মড়িগঙ্গা নদী উহার পশ্চিম সীমা ছিল এবং উহা চব্বিশ পরগণা জেলার ১নম্বর হইতে ১৭ নম্বর ও ১৯ নম্বর হইতে ২১ নম্বর লাট বাদে, অবশিষ্ট সমগ্র দক্ষিণাংশ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল।" ৩৬ গঙ্গানদী এই পথেই প্রবাহিত হত বলে প্রাচীনকাল হতে বহু জনপদ এই নদীর উভয় তীরে গড়ে ওঠে। গঙ্গাতীরে বাস করা হিন্দুদের কাছে পুন্যজনক। উপরন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি প্রধান পথও ছিল এই নদীর গতিধারা।৩৭ এইসব তথ্য থেকেই এখানে প্রাচীনকালে বসতি স্থাপনের প্রকৃত কারণ অনুমান করা যায়। এই গতিপথ আলোচনায় তিনি ডি, ব্যারো, ফনডেন ব্রুক ও রেনেলের মানচিত্র ব্যবহার করেন। কালিদাস দত্ত 'আদিগঙ্গা নদী' (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৯) নামক একটি প্রবন্ধেও এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

চব্বিশ পরগণার আদিম দেবতা ও লোকগাথা সম্বন্ধে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। নিম্নবঙ্গে আদিম দেবতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। 'বারা ঠাকুর' নামক একটি আদিম দেবতা নিয়ে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।৩৮ এই দেবতাটি আকারে দুইটি নরমুণ্ডের অনুরূপ। সাধারণত ১লা মাঘ অথবা মাঘ মাসের অন্য তারিখে প্রতি-গ্রামে হিন্দুরা এই দেবতার পূজা করেন। এই দেবতাকে নিয়ে কোন প্রাচীন গাথা বা প্রবাদাদি না পাওয়ায় এই দেবতা কি শক্তির প্রতীক অথবা কি উদ্দেশে এর পূজা হয় তা বলা সম্ভব নয়। কেউ কেউ এঁকে দক্ষিণ রায় নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কালিদাস দত্ত বলেন যে, দক্ষিণ রায় বারা ঠাকুর নন।৩৯ অন্যান্য দেশেও আদিম জাতিদের মধ্যে বারা ঠাকুরের মত মুণ্ডরূপী যুগ্ম দেবতার পূজার প্রচলন আছে। তামিল জাতির মধ্যেও এই ধরণের দেবতা পূজিত হয়। Whitehead রচিত The Village Gods of South India গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ইষ্টার দ্বীপেও এই ধরণের দেবতা আবিষ্কৃত হয়েছে।৪০ বিভিন্ন দেশে মুণ্ডরূপী দেবতার পরিচয় পেয়ে কালিদাস দত্ত মন্তব্য করেন : "পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বকালে গাজি সাহেব, ওলাবিবি ও বনবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবতাদের সহিত দক্ষিণরায়েরও আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু পূর্বোক্ত তথ্যগুলি হইতে বোধ হয় যে দক্ষিণ ভারত ও অন্যান্য দেশের যুগ্মমুণ্ডপূজক আদিম জাতিদের মত ধর্মভাবাপন্ন মানব গণের দ্বারাই, মুসলমান আমলের বহু পূর্ব্বে, বারা ঠাকুরের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সকল মানব কাহারা ছিলেন এবং নিম্নবঙ্গের এই প্রদেশে কোন সময় তাহাদের আবির্ভাব ঘটে তাহাও অজ্ঞাত" ।৪১

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুর সম্পর্কেও কালিদাস দত্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি পঞ্চানন্দের গান নামে প্রচলিত প্রাচীন লোকগাথা প্রকাশ করেন।৪২ এই অজ্ঞাতপরিচয় দেবতার পূজা এখনকার প্রতি গ্রামেই হয়। এই দেবতার পূজার সময় গায়েন নামক একশ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চানন্দের গান গেয়ে থাকেন। একসময়ে পঞ্চানন্দ দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসীদের নিজস্ব দেবতা ছিলেন। এখনও

এই দেবতার মূর্তির আদিমভাব বজায় আছে। দক্ষিণ ভারতের তামিল ও তেলেগু জাতির মধ্যেও এই ধরণের একটি দেবতা আছেন। এই সাদৃশ্য দেখে কালিদাস দত্ত বলেন: "দক্ষিণভারতের অনার্য্য দ্রাবিড়বংশোদ্ভব তামিল ও তেলেগুজাতির উপাস্য উক্ত লৌকিক দেবতাটির সহিত উল্লিখিত পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুরের আকারের সাদৃশ্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণবঙ্গেও প্রাচীনকালে তামিল ও তেলেগু জাতির পূর্ব্বজনগণের অনুরূপ ধর্ম্মভাবাপন্ন আদিম মানবগণের বাস ছিল।"[৪৩] কালিদাস দত্ত রচিত 'নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা' (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৮, সচিত্র) নামক প্রবন্ধেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

চব্বিশ পরগণার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর রচিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধের নাম এখানে দেওয়া হল: 'A Chandrasekhara Siva Image (J. I. S. of Oriental Art, 1941, Illustrated). 'বহড়ু গ্রামের কয়েকটি পুরাতন ভিত্তিচিত্র,' (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৯ সচিত্র). 'প্রাচীনযুগে পশ্চিম সুন্দরবন' (ঐ, শ্রাবণ ১৩৪৭). 'মজিলপুর' (ঐ, আশ্বিন ১৩৪৮ সচিত্র), 'পশ্চিম সুন্দরবনে আবিষ্কৃত কয়েকটি শৈবমূর্তি' (ঐ আষাঢ় ১৩৪৯ সচিত্র), 'মজিলপুর, প্রাচীনকাল' (বন্ধু, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৯ সচিত্র), 'মজিলপুর, আধুনিককাল' (বন্ধু, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬১ সচিত্র). 'পশ্চিম সুন্দরবনের প্রত্ন-সম্পদ' (বন্ধু, বৈশাখ, ১৩৬০), 'বহড়ুর ইতিবৃত্ত' (বন্ধু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০), 'ছত্রভোগ' (বন্ধু, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬০ সচিত্র), 'প্রাচীন স্থলপথ দ্বারির জাঙ্গাল' (বন্ধু, আষাঢ়, ১৩৬০), 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অতীত', (২৪ পরগণার ইতিহাস সংকলন সমিতির অধিবেশনে পঠিত ও প্রকাশিত। সচিত্র), 'বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬৩, সচিত্র), 'পৌরাণিক গ্রন্থে চব্বিশ পরগণা' (বন্ধু, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭০), 'রায়মঙ্গল কাব্যে রাজা মদন রায়' (সংস্কৃতি), 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পর্তুগীজ' (ইতিহাস, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪)। 'বৈদিক ভারতে নরবলি' (সোমপ্রকাশ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা), 'একটি প্রাচীন গ্রাম দক্ষিণ বারাসত ও শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ' (চব্বিশপরগণা), 'প্রস্তরপ্রস্তর যুগের মানব প্রসঙ্গ' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শারদীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫) ইত্যাদি প্রবন্ধও তথ্য সমৃদ্ধ।

কালিদাস দত্ত রচিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পূর্ণ তালিকা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। যে সব প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছি (তার মধ্যে কয়েকটির মাস ও বৎসর উল্লেখ নেই) তা ভিত্তি করেই এই প্রবন্ধ রচিত। তাঁর সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা প্রয়োজন। তা না হলে অনেক দুর্লভ রচনা নষ্ট হয়ে যাবে। এই সব রচনায় যে গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয় আছে তা পাঠকদের বিমুগ্ধ করবে। বাংলার ইতিহাস রচনায় এগুলো অমূল্য উপাদান রূপেই ব্যবহৃত হবে। ডঃ আনন্দ কুমার স্বামী, ডঃ ভোগেল, ডঃ টমাস, ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতেরা কালিদাস দত্তের পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে উৎসাহিত করেন। কালিদাস দত্তের নিকট লিখিত পত্রে তাঁর উল্লেখ আছে।৪৪ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ননীগোপাল মজুমদার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণে কালিদাস দত্তের অবদান বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেন: "বাঙলার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইলে বাঙলার সমতল ভূমিকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত সুন্দরবনের বহুস্থানে যে সকল পুরাকীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশেও গুপ্ত ও পাল যুগের বহু গ্রামনগর বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলে রীতিমত অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাঙলার সমতলভূমিকে আমরা যতটা নবীন বলিয়া মনে করিতেছি উহা ততটা নবীন নহে এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মনে নবীন বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।" ৪৫ আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ-অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ সুন্দরবনের লুক্কায়িত সম্পদ প্রসঙ্গে বলেন: **"To Sri Kalidas Datta, Scholarly Zamindar of Mazilpur, we are indebted or the present state of our knowledge about the antiquity of the Sundarban. The result of the archaeological research personally conducted by him in Sundarban, which have illuminated a dark**

forgotten corner of Indian history, have been published in the Varendra Research Society's Monographs 3 4 and 5 as also some other periodicals. Some remarkable example of Indian sculpture or the early and late modieval period collected by him are now preserved in the Asutosh Museum"[৪৬] ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার কালিদাস দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর সংগ্রহশালা দেখে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর অবদান উল্লেখ করে লেখেন : "For more than 70 years he has lived in the building in the 24 Parganas, which can fittingly lay claim to its association with Bengal's cultural advance, and has spent half his life time constructing the historical background of South-West Bengal. Much of the history of the Southern areas of this district is still concealed and dedicated service is needed to collect material, study specimens and interpret them correctly."[৪৭]

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মিউজিয়াম গঠনে উদ্যোগী হন। তখন কালিদাস দত্ত বহু মূল্যবান পুরাবস্তু এই মিউজিয়ামে দান করেন। তাছাড়া তিনি ইণ্ডিয়ান (ন্যাশনাল) মিউজিয়াম ও সংস্কৃত কলেজ সংগ্রহশালায় কয়েকটি দুর্লভ জিনিষ দান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করেও তাঁর সংগ্রহশালায় প্রাচীনকালের অনেক দুর্লভ জিনিষ ছিল। কালিদাস দত্তের পরলোক গমনের পর তাঁর দুই পুত্র ডঃ বিমল কুমার দত্ত ও শ্রীঅমল কুমার দত্ত তাঁর সংগ্রহশালায় রক্ষিত সমস্ত পুরাবস্তুসমূহ, যার আনুমানিক মূল্য হবে ৫০,০০০ টাকা বা তারও বেশী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারিতে দান করেন।[৪৮] এই পুরাবস্তু সমূহ 'কালিদাস দত্ত সংগ্রহ' নামে পৃথকভাবে রক্ষিত আছে। কালিদাস দত্ত পুরাবস্তুসমূহ সংগ্রহ করে যেখানে রেখেছিলেন সেখানেই বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি

কালেক্টর থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস করতেন। এই বাড়ীতেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনা পরিসমাপ্ত করেন এবং 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেন।[১৭]

কালিদাস দত্তের বাসনা ছিল যে, একটি আঞ্চলিক প্রত্নতাত্ত্বিক গ্যালারি তৈরি করে গবেষকদের চব্বিশ পরগণার অতীত ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবেন। অর্ধ শতাব্দী ধরে এই সাধনায় তিনি মগ্ন ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। রামদাস বাবাজীর শিষ্যের কাছ থেকে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। আচার-সর্বস্ব ধর্মকে পরিহার করে আজীবন তিনি যুক্তি-নিষ্ঠ মনকে সযত্নে লালন করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কালিদাস দত্ত বহু মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে বিব্রত থাকলেও এবং দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে কষ্ট পেলেও ইতিহাস-চর্চা থেকে বিরত হননি। খুবই বেদনার কথা, যিনি দীর্ঘকাল ধরে একনিষ্ঠ সাধকের মত নিম্নবঙ্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করেছেন, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের ছাত্রদের কাছেও সুপরিচিত নন। এই আত্ম-বিস্মরণ কবে আমরা কাটিয়ে উঠব?

সূত্র নির্দেশ

১। The Statesman, June 24, 1966
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, 'প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত', বসুমতী (রবিবারের সাময়িকী), ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৮।

২। ঐ।

৩। Kalidas Datta, 'The Antiquities of Khari', Varendra Research Society, Appendices to Annual Report for 1928-29 (Monograph No. 3), Rajshahi, April 1929, PP 1-13;
Do. 'The Antiquities of the North-West Sundarban, Ibid, No. 4;
Do. The Antiquities of Sundarban', Ibid, No. 5.

৪। Ibid.

৫। পশ্চিমবঙ্গ (সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা). পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত, ২১শে জুন ১৯৬৮, পৃ: ৩২০।

৬। Kalidas Datta, 'Some Primitive Antiquities from the Sundarbans', Science and Culture, vol. 27, June 1961.

৭। Kalidas Datta, 'Some Early Archaeological Finds of the Sundarban', The Modern Review, July 1963, PP. 39-44.

৮। কালিদাস দত্ত, 'জটার দেউল', শারদীয় প্রবাসের দাবী, ১৩৭৪ সাল, (সচিত্র) পৃ: ২-৪।

৯। ঐ।

১০। ঐ।

১১। Kalidas Datta, 'Two Saura Images from the District of 24 Parganas,' The Indian Historical Quarterly, vol. IX, Calcutta, 1933, PP. 202-207.

১২। কালিদাস দত্ত, 'খাড়ী', বন্ধু (শারদীয় সংখ্যা) পৃ ৫-৬।

১৩। ঐ।

১৪। ঐ।

১৫। ঐ।

১৬। ঐ।

১৭। কালিদাস দত্ত, 'সরিষাদহ ও দক্ষিণ বারাসত,' ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৪, সচিত্র পৃ ২০০-২০৫।

১৮। ঐ।

১৯। ঐ।

২০। ঐ।

২১। কালিদাস দত্ত, 'জয়নগর', প্রজ্ঞা, তৃতীয় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ পৃ ৮-১৬।

২২। ঐ, পৃ ১৩।

২৩। ঐ, পৃ ১৪। জয়নগর থেকে খাড়ীর দূরত্ব আট মাইল।

২৪। ঐ, পৃ ১৫।

২৫। ঐ, পৃ ১৫-১৬।

২৬। ঐ, পৃ ৮।

২৭। The Statesman, June 24, 1966.

২৮। কালিদাস দত্ত, 'সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈনমূর্তি', পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩৩৯ (সচিত্র)।

২৯। কালিদাস দত্ত, 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান-ভুক্তি,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৪১, পৃ ১৯-২০।

৩০। ঐ, পৃ ২০।

৩১। ঐ।

৩২। ঐ পৃ ২১-২২।

৩৩। ঐ, পৃ ১৯।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ) নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'লক্ষ্মণ সেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ'' নামক প্রবন্ধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি ও বর্দ্ধমান-ভুক্তির সীমা নির্ধারণ করেন। এই অঞ্চল সম্পর্কে যোগেশ চন্দ্র রায় রচিত 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' নামক প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় (দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনের কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত সুরেশ চন্দ্র দত্ত রচিত প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' এই বিষয়ে আলোকপাত করে। কালিদাস দত্ত এই তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেন।

৩৪। ঐ, পৃ ২২।

৩৫। ঐ।

৩৬। ঐ, পৃ ২২-২৩।

৩৭। কালিদাস দত্ত, 'জয়নগর', প্রভা, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ন।

৩৮। কালিদাস দত্ত, 'বারা ঠাকুর', ভারতীয় লোকযান, পৃ ২৩-৩২।

৩৯। ঐ, পৃ ২৮।

৪০। ঐ, পৃ ৩০।

৪১। ঐ, পৃ ৩২।

৪২। কালিদাস দত্ত, 'পঞ্চানন্দের থান', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৪ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃ ৮১-৯১।

৪৩। ঐ, পৃ ৮২।

৪৪। সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ, 'বাঙলার প্রত্নতাত্ত্বিক', দৈনিক বসুমতী, ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৫৯৬।

৪৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই পৌষ ১৩৩৪।

৪৬। 'Hidden Treasures of Sundarban', Amrita Bazar Patrika, October 2, 1953,

৪৭। The Statesman, June 24, 1966.

৪৮। সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ, ২১শে জুন ১৯৬৮, পৃ ৮২০।

৪৯। The Statesman, Jun 24, 1966।

[**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কালিদাস দত্ত রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাতত্ত্ববিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী কালিদাস দত্ত লিখিত প্রবন্ধের একটি তালিকা আমাকে দেন। এই তালিকাটি কালিদাস দত্ত নিজে লিখে শ্রীচক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই তালিকায় কালিদাস দত্তের ২৯টি প্রবন্ধের উল্লেখ আছে।]

খৃষ্টপূর্ব ৩২০ সাল আন্দাজ চাউলের দর কত ছিল

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

আমাদের এই লেখাটি লিখিবার উদ্দেশ্য যে ইহাতে ভূলভ্রান্তি থাকা খুবই সম্ভব ; সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আমাদের ভুল ভ্রান্তিগুলি তাঁহারা দেখাইয়া দিবেন। ইহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত বদলাইতে হইলে আমরা কিছু মাত্র দুঃখিত হইব না। বরং ভবিষ্যতে লেখকদের কাজে আসিতে পারিবে মনে থাকিয়া আশান্বিত হইব। সংস্কৃতে আমাদের শিক্ষা উপক্রমণিকা অবধি ; এজন্য মূল সংস্কৃতে না গিয়া ইংরাজী অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াছি। এজন্য কিছুটা ভুল ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব।

চাণক্য বা কৌটিল্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি মৌর্য সম্রাট-চন্দ্রগুপ্তের সময় বর্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অর্থশাস্ত্রে তিনি শুক্র নীতিসার ও বৃহস্পতিনীতিশাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। এজন্য আমরা শুক্র-নীতিসার ঐ সময়ের আগের রচনা মনে করি। যদিও বর্তমান কালে যে শুক্র-নীতিসার পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বর্তমান কালে প্রাপ্ত মনুসংহিতা খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত হইলেও ইহাতে তৎপূর্ব কালের, বহুকাল পূর্বের কথা লিপিবদ্ধ আছে, তেমনি বর্তমানে প্রাপ্ত শুক্রনীতিসারে বহুকাল পূর্বের কথা লিপিবদ্ধ আছে ও থাকা সম্ভব। ইহাতে মুদ্রা হিসাবে পণ ও কর্ষার কথা আছে। এজন্য আমরা উহা চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আমাদের এ বিষয়ে সীমিত জ্ঞানের জন্য কিছুটা ভুল ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব।

শুক্রনীতি অনুসারে গ্রামের পরিসীমা এক ক্রোশ ; যাহার

উৎপন্নের মূল্য ১০০০ রৌপ্য কর্ষা ; গ্রামের অর্দ্ধেক হইতেছে পল্লী ; পল্লীর অর্দ্ধেক কুস্ত।

ক্রোশের পরিমাপ প্রজাপতির (ব্রহ্মা) মতে ৫,০০০ হাত ; মনুর মতে ৪০০০ হাত।

(১ম অধ্যায় ৩৮১-৩৮৮ লাইন, বিনয় কুমার সরকারের অনুবাদে)

প্রজাপতির গ্রাম হইতেছে $\frac{৫০০০}{৮০} \times \frac{৫০০০}{৮০} = ৩৯০৬$ বিঘার কিছু বেশী। আর মনুর গ্রাম হইতেছে $\frac{৪০০০}{৮০} \times \frac{৪০০০}{৮০} = ২৫০০$ বিঘা বা ইং একরে ৮২৬·৪ একর। পূর্বে গ্রামের চারিদিকে গোচারণের জন্য ও জ্বালানি কাঠের জন্য কিছু জমি রাখিয়া দেওয়া হইত। আমাদের মনে হয় মনুর গ্রামের চারিদিকে ১৪০০ বিঘা জমি ঐ উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া রাখা হইত।

বেঙ্গল প্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনের রিপোর্টের ১ম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় আছে যে অখণ্ড বঙ্গের গড়ে প্রতি একরে ১৮·৮ মন ধান বা ইহার ২।৩ অংশ ধরিয়া ১২·৫৩ মন চাউল পাওয়া যায়। এমতে ৮২৬·৪ একরে মোট চাউলের পরিমান ১০,৩২৪·৮ বা ১০৩২৫ মন চাউল।

পূর্বের গড়ের সহিত বর্তমানের গড় সমান ধরিয়া এই হিসাব করিতেছি। ইহাতে কিছু ভুল-চুক হওয়া সম্ভব।

ক্যানিংহামের Ancient Coins of India অনুসারে ১ রৌপ্য কর্ষা = ১৬ তাম্র কর্ষা বা পণ। এই হিসাবে ১০,৩৪ মন চাউলের দাম যদি ২০০০ রৌপ্য কর্ষা বা ১৬,০০০ তাম্র পণ হয় তাহা হইলে চাউলের দাম মন প্রতি ১.৫৪ পণ দাঁড়ায়।

আমরা গ্রামের সমস্ত জমি চাষ হইয়াছে ধরিয়া ঐ হিসাব করিয়াছি। কিছুটা জমি চাষীদের বসবাসের জন্য, পুকুর জলাশয়, পথ ঘাটের জন্য নিশ্চয়ই ছিল। এই পরিমাণ জমি বাদ দিতে হইবে। পূর্বে বন্য জন্তুর আক্রমণ, চোর ডাকাতের উপদ্রব, উপজাতিদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে 'কোটে' বাস করিত—আর খুব ঘেঁষাঘেঁষি বাস করিত। বাসস্থানের চারিদিকে মানুষ সমান উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়া

ঘেরা থাকিত। এই জন্য প্রবাদ আছে যে নিজের কোটে পাইলে মানুষ সব করিতে পারে।

পাঞ্জাবে এখনও গ্রামের চারিদিকে মাটির প্রাচীর দিয়া লোকে বসবাস করে। বাঙলায় বর্ধমানের গ্রামে লোকে খুব ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে; যদিও গ্রামের চতুর্দিকে মাটির প্রাচীর নাই। স্থানে স্থানে পূর্বে যে মাটির প্রাচীর ছিল তাহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসাহক রিপোর্টের তথ্যাদি অনুসারে গ্রামের রাস্তা ঘাট পুকুর জলাশয় মন্দিরাদির ও বসবাসের বাটির জন্য প্রায় শতকরা ১০ ভাগ ভূমি যায়। পূর্ববঙ্গে আন্দাজ শতকরা ৪ভাগ জমি এই উদ্দেশ্যে যায়।

উপরোক্ত কারণে শুক্রনীতির সময়েও গ্রামের শতকরা ১০ ভাগ জমি ছিল ধরিয়া লইলে চাউলের দর মন প্রতি ১.৫৪ পণ + ১।৯ × ১.৫৪ পণ = ১.৭১ পণ দাঁড়ায়।

পণ—তামার পণের ওজন ১৪৪ গ্রেন; আর ইংরাজ আমলের পয়সা হইতেছে ১০০ গ্রেন তামা। পয়সায় ১ মন চাউলের দর হইতেছে ১.৭১ × ১৪৪।১০০ = ২.৪৬ পয়সা। টাকায় তখন ২৬ মন চাউল পাওয়া যাইত।

আমরা শুক্রনীতিসারের তথ্যাদি বাংলার সম্বন্ধে প্রয়োজ্য ধরিয়া লইয়াছি; সম্ভবতঃ ইহা উত্তর ভারতে রচিত; তাহা হইলে ইহাতে উত্তর ভারতের তথ্যাদি থাকাই সম্ভব। এমতে ইহার দরুন কিছুটা ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে। এ বিষয়ে সুধীগণ দৃষ্টি দিলে ভাল হয়।

কর্ণসুবর্ণ

সুধীর রঞ্জন দাস

(৬১)

সম্ভবতঃ শশাঙ্ক কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ ও অন্তঃস্থ জলপথ সংরক্ষণের ও সংযোগের নিমিত্ত বহু সরোবর, পয়ঃপ্রণালী, খাত প্রভৃতি খনন করাইয়াছিলেন। বহু সরোবর ও পয়ঃপ্রণালী অদ্যাপি কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা নামে অভিহিত। বর্তমান হুগলী জিলায় কানসোনা নামধেয় বহু পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান। অধিকাংশ পয়ঃপ্রণালী বর্তমানে শুষ্ক। পূর্বে এ সকল পয়ঃপ্রণালী যে জলপথের ও কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ অবধি দামুদা নদীও কানসোনা নামে পরিচিত ছিল। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী বর্তমান কানসোনা খাল পূর্বতন দামোদরেরই নদীগর্ভ। মেদিনীপুর জিলায় দাঁতনের নিকটবর্তী শশাঙ্ক দীঘি নামে একটি সরোবর অদ্যাপি পরিচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, পূর্বোক্ত মেদিনীপুর তাম্রলিপিদ্বয় দাঁতন অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। উড়িষ্যায় বৈতরণী নদীর অনতিদূরবর্তী বেনু সাগর শশাঙ্ক নামের সহিত সংযুক্ত। মনে হয়, এই সকল পয়ঃপ্রণালী, দীঘি, সরোবর প্রভৃতি শশাঙ্কই খনন করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শশাঙ্ক অনেক গ্রাম, নগর, বসতি স্থাপনপূর্বক স্বীয় নামাঙ্কিত করিয়াছিলেন। কতিপয় অধিবাস বা গ্রাম রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বা রক্তমৃত্তিকা আখ্যায় নামাঙ্কিত করা হইয়াছিল। বর্ধমান জিলায় কাঞ্চননগরের সন্নিকটে দামুদা নদীতীরবর্তী রাঙামাটি নামক একটি গ্রাম অদ্যাপি বর্তমান। কতিপয় গ্রাম শশাঙ্ক গ্রাম নামেও খ্যাত। উড়িষ্যাতেও অনেক গ্রাম সোনাপোসি ও রাঙামাটি নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত শশাঙ্ক বা কর্ণসুবর্ণ বা রাঙামাটি নামাঙ্কিত সরোবর গ্রাম প্রভৃতির বিদ্যমানতা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সকল অঞ্চল শশাঙ্কের

সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং স্থল ও জলপথে রাজধানীর সহিত সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

(৬২)

ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অধিকতর প্রসার ও জনপ্রিয়তা অনুমেয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের লোকপ্রীতিও কম ছিল না। চীন-পরিব্রাজকের ভ্রমণ বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান বুদ্ধ বাঙলা দেশে ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক বুদ্ধদেবের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের নির্দেশ ও বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্ধনে বুদ্ধদেব তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। অধিকন্তু খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থান-সমূহে স্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণে এবং উহার উপকণ্ঠে চীন-পরিব্রাজক একাধিক অশোকস্তূপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে একটি স্তূপ রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহারের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনেও পো-সি-পো সংঘারামের সন্নিকটস্থ একটি অশোকস্তূপের অবস্থান বর্ণিত আছে। সমতটে এবং তাম্রলিপ্তিতে চীন-পরিব্রাজক রাজধানী—মহানগরীদ্বয়ের সন্নিকটস্থ অশোক স্তূপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন সম্পর্কিত জনশ্রুতি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বাঙলা দেশে কর্ণসুবর্ণেই সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন অসম্ভব নহে। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙের পরিভ্রমণের পূর্বেও চীন-পরিব্রাজকগণ কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই অনুমান পূর্বোক্ত শ্রীগুপ্ত কর্তৃক চীন-মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত। ফা-হিয়েন কর্ণসুবর্ণ পরিদর্শন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিবরণীতে তাম্রলিপ্তিতে অনেক বৌদ্ধ সংঘারাম ও বিহারের বর্ণনা বর্তমান। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, বাঙলাদেশে তৎসময়ে কর্ণসুবর্ণই বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। চীন-পরিব্রাজকের বিবরণী-নির্ধারিত নিম্ন-লিখিত নির্ঘণ্ট হইতে তৎকালীন বাঙলার বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দির ও উহাদের আবাসিক সন্ন্যাসিগণের এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রসার ও জনপ্রিয়তার মান নির্ণয় সম্ভবপর।

নির্ঘণ্ট

রাজধানী	বৌদ্ধ বিহার-সংখ্যা	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংখ্যা	অশোক-স্তূপ	হিন্দু মন্দির	জৈনধর্ম সম্প্রদায়	বিবিধ মন্দির
পুণ্ড্রবর্ধন	১। ২০ ২। প্রসিদ্ধ পো-চি-পো বিহার	হীনযান এবং মহাযান	১। ৩০০০ অধিক ২। পো-চি-পো বিহারে ৭০০ অধিক	পি-চি-পোর নিকটবর্তী একটি	বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ১০০ মন্দির	বহু সংখ্যক দিগম্বর এবং নির্গ্রন্থ	কৃষ্ণান স্থ্য-দেব পুত্র মূর্তি-সহ মন্দির
কর্ণসুবর্ণ	১। ১০ অধিক ২। প্রখ্যাত রক্ত-মৃত্তিকা বিহার ৩। দেবদত্তের ৩ বিহার	১। সম্মতীয় ২। দেবদত্তের অনুচরগণ	২০০০ অধিক	কতিপয় স্তূপ— ১। রক্তমৃত্তিকার নিকটবর্তী ২। বুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থান-সমূহ	বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৫০ মন্দির	—	—
সমতট	১। ৩০ অধিক ২। ১ বুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানে	স্থবির শ্রেণী	২০০০ অধিক	রাজধানীর সন্নিকটে একটি	বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ১০০ মন্দির	বহু সংখ্যক দিগম্বর এবং নির্গ্রন্থ	—
তাম্রলিপ্তি	১০ অধিক	—	১০০০	রাজধানীর পার্শ্বে একটি	৫০ অধিক	—	—

হিউয়েন-সাঙের পরিভ্রমণ সময়ে ন্যূনপক্ষে ৭৩ (দেবগুপ্ত সম্প্রদায়ের তিনটি সমেত) বৌদ্ধ সংঘারাম ও বিহার বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত চীন-পরিব্রাজকের বিবরণীতে কর্ণসুবর্ণে, পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে তিনটি প্রখ্যাত সংঘারামের বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান। পুণ্ড্রবর্ধনে পো-চি-পো সংঘারামই বিখ্যাত ছিল। উহার উচ্চতলা বিশিষ্ট আকর্ষণীয় কক্ষশ্রেণী এবং সুবৃহৎ সভাগৃহ উল্লেখযোগ্য। সমতটে বুদ্ধদেবের সঞ্চালন-স্থানের নিকটস্থ একটি গরীয়ান সংঘারামের বর্ণনাও উল্লেখনীয়। এই সংঘারামের মন্দিরাভ্যন্তরে গাঢ় কৃষ্ণাভ-নীল বর্ণের প্রস্তর-নির্মিত ৮ ফুট উচ্চ সুদর্শন বুদ্ধ মূর্তি সংরক্ষিত ছিল। উক্ত বুদ্ধমূর্তির অলৌকিক শক্তি সম্পর্কিত অনেক জনশ্রুতিমূলক কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তৎকালীন বাঙলায় কর্ণসুবর্ণের সন্নিকটস্থ রক্তমৃত্তিকা সংঘারামই সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ছিল। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, কর্ণসুবর্ণের কোন এক নৃপতি উক্ত সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে দেবদত্ত সম্প্রদায়েরও তিনটি সংঘারাম অবস্থিত ছিল।

(৬৩)

সপ্তম শতাব্দীতে বাঙলার বৌদ্ধ সংঘারামের বা বিহারের আবাসিক সন্ন্যাসীদিগের পরিসংখ্যা ৮০০০-এর অধিক ছিল। পো-চি-পো সংঘারামের ৭০০ সন্ন্যাসী যুক্ত হইলে, মোট সংখ্যা ৮৭০০ হইবে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমতটে ২০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ইৎ-সিঙ্ এর ভ্রমণ বিবরণীতে লিখিত আছে যে, সমতটে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের সংখ্য ন্যূনপক্ষে ৪০০০ ছিল। কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ সম্মত্তীয় (হীনযান) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে ৩০০০ সন্ন্যাসী হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পো-চি-পো বিহারের ৭০০ সন্ন্যাসী মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাম্রলিপ্তিতে ১০০০ বৌদ্ধসন্ন্যাসীর

উল্লেখ বর্তমান। কিন্তু উহাদিগের সম্প্রদায় উল্লেখিত হয় নাই। ইৎ-সিঙের পরিভ্রমণ সময়ে তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধগণ সর্বাস্তিবাদী শ্রেণীভুক্ত ছিল। মনে হয় যে, হিউয়েন-সাঙের সময়ও তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধগণ উক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত হিউয়েন-সাঙ কর্ণসুবর্ণে দেবদত্ত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের অবস্থানের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু দেবদত্তের মতাবলম্বীদিগের পরিসংখ্যা উক্ত হয় নাই। হিউয়েন-সাঙ বলিয়াছেন যে, দেবদত্তর অনুচরগণ দুগ্ধজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন না। ইৎ-সিঙ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মহাযানিদিগের নিকট দুগ্ধজাত দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং মনে হয়, দেবদত্তের অনুচরগণ মহাযান সম্প্রদায়েরই কোন এক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। পরিসংখ্যার বিচারে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণের সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত।

নির্ধারিত নির্ঘণ্ট হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের পরিসংখ্যা নিশ্চয়ই ন্যূন ছিল না। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ সাধারণ গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসকদিগের কোন পরিসংখ্যা প্রদান করেন নাই। কেবল মাত্র তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, জনসাধারণ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মনে হয়, অন্য রাজ্যেও গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসকদিগের সংখ্যা অত্যল্প ছিল না। বৌদ্ধ সংঘারাম মঠ প্রভৃতি এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের জীবনযাত্রা সংলগ্ন অঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থের আনুকূল্যের ও পৃষ্ঠপোষকতার উপরই নির্ভরশীল ছিল। প্রতিকূল আঞ্চলিক জনসাধারণের বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং মনে হয় যে, সপ্তম শতাব্দীর বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা কম ছিল না।

(৬৪)

বৌদ্ধধর্ম ব্যতিরেকে জৈনধর্ম সম্বন্ধেও হিউয়েন-সাঙ সাধারণ নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনে পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে বহুসংখ্যক দিগম্বর—

নির্গ্রন্থদিগের উল্লেখ বর্তমান। কিন্তু কর্ণসুবর্ণে ও তাম্রলিপ্তিতে জৈনধর্মাবলম্বী-দিগের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। অতএব বাঙলাদেশে তৎসময়ে মাত্র দুইটি কেন্দ্রেই জৈনধর্মাবলম্বীগণের অবস্থান অনুমেয়। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ বহু-সংখ্যক জৈন সন্ন্যাসীদিগের কোন পরিসংখ্যা প্রদান করেন নাই। জৈনধর্ম সম্বন্ধেও কোন বিস্তারিত বর্ণন লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে হিউয়েন-সাঙের জৈনধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং তিনি জৈন ধর্মাবলম্বীগণের সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ প্রদান করেন নাই।

(৬৫)

সপ্তম শতাব্দীর বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা হিউয়েন-সাঙের বিবরণীদ্বারাও প্রমাণিত। চীন পরিব্রাজকের বর্ণনায় তৎসময়ে বাঙলাদেশে ৩০০ দেবমন্দিরের অধিষ্ঠান ছিল—পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতটে ২০০ (প্রতিরাজ্যে ১০০) এবং কর্ণসুবর্ণে ও তাম্রলিপ্তিতে ১০০ (প্রতিস্থানে ৫০টি)। হিউয়েন-সাঙ হিন্দু মন্দিরের আবাসিক পুরোহিত বা সন্ন্যাসীদিগের পরিসংখ্যা প্রদান করেন নাই। এমন কি বিবরণে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর নামোল্লেখও অবর্তমান। মনে হয়, হিউয়েন-সাঙের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবের ও জনপ্রিয়তার বর্ণনানুল্লেখ ইচ্ছাকৃত। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতিই চীন-পরিব্রাজকের একনাত্র আকর্ষণ ছিল। সুতরাং তাঁহার ভ্রমণ বিবরণও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির বর্ণনেই সীমাবদ্ধ। উপরন্তু হিউয়েন-সাঙ অপর মন্দিরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন নাই। বিবরণে পুণ্ড্রবর্ধনের একটি মন্দিরে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সর্বজনপূজিত কুয়ান-স্যু-যাই-পু-স মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শৈব এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের প্রভাব সমতুল্য ছিল। শশাঙ্ক স্বয়ং শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কর্ণসুবর্ণাধিপতি জয়নাগ বৈষ্ণব ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণী পাঠে মনে হয় যে, সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের অধিক অগ্রগতি ও প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল।

এই প্রসঙ্গে হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক বিবৃত কামরূপে প্রচলিত ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান প্রয়োজন। সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপে বৌদ্ধধর্মের কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রভাব ছিল না। কতিপয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতীব সন্তর্পনে ও সংকোচের সহিত স্বীয় ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিত। কামরূপের জনসাধারণ দেব উপাসক ছিল এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহাদিগের কোন বিশ্বাস ছিল না। কামরূপের অধিপতিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধশ্রমণগণের প্রতি সম্ভ্রমসূচক আচরণ করিতেন। হিউয়েন-সাঙের পরবর্তী সময়ে কামরূপে বৌদ্ধধর্ম কিয়ৎ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

(৬৬)

হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে তৎসময়ে বাঙলা দেশে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাঁহার বর্ণনে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার এবং আলোড়ন বা উপদ্রবের কোন প্রকার নির্দেশ অবর্তমান। সর্বত্রই বৌদ্ধশ্রেণীদ্বয়ভুক্ত সন্ন্যাসিগণ একই অঞ্চলে বসবাস করিতেন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবমন্দির এবং বৌদ্ধ সংঘারাম ও বিহারসমূহের পাশাপাশি অবস্থান উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন-সাঙ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে কোন প্রকারের সংঘাত বা মানসিক উত্তেজনার নির্দেশ প্রদান করেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদিগের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর কোন অত্যাচারের ও উৎপীড়নের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর বাঙলায় ব্যক্তিগত ধর্মমত পোষণের স্বাধীনতা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের একই অঞ্চলে অধিষ্ঠান ও স্বীয় ধর্মানুষ্ঠান প্রতিপালন ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রকৃত ভিত্তি ছিল।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, হিউয়েন-সাঙের বিবরণে বাঙলা দেশে শশাঙ্কর বৌদ্ধবিদ্বেষী ও বৌদ্ধ বিধ্বংসী নীতির প্রবর্তন এবং উহার বাস্তব-রূপায়ণের প্রচেষ্টার কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরিব্রাজক স্বয়ং কোন্ বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ধ্বংসের বাস্তব নিদর্শন পরিদর্শন করেন নাই। পক্ষান্তরে শশাঙ্ক ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৌদ্ধগণের প্রতি উদারপরায়ণ নীতি অনুসরণ না করিলে বাঙালা দেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব চিরতরে তিরোহিত হইত। অন্যথায় হিউয়েন-সাঙ কেবলমাত্র বৌদ্ধমঠ ও বিহারের

ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিতেন। সুতরাং শশাঙ্কর ধর্মনিরপেক্ষ নীতি হিউয়েন-সাঙের আংশিক বর্ণনা দ্বারাও সমর্থিত। শশাঙ্কর ধর্মান্ধতা ও বৌদ্ধধর্মবিরোধী কার্যকলাপ কাহিনী হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক বৌদ্ধগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ও জনশ্রুতিমূলক। চীন-পরিব্রাজকের শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহার বৃত্তান্তে বর্ণিত বাস্তব নিদর্শন দ্বারা অসমর্থিত। বাঙলা সম্পর্কে চীন-পরিব্রাজকের তথ্য বিবরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপরন্তু হিউয়েন-সাঙের বিবরণে বিভিন্ন সম্প্রদায় শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। হিউয়েন-সাঙের বিবরণী সপ্তম শতাব্দীর বাঙালীর ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারতার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ।

(৬৭)

পরবর্তীকালে চৈনিক পরিব্রাজকগণের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, বাঙলা দেশে, বিশেষতঃ সমতটে, বৌদ্ধধর্ম অধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। শশাঙ্কের পরবর্তী সময় সমতটের খড়্গবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সেঙ-চির বিবরণে লিখিত আছে যে, খড়্গ নৃপতিগণের অধীনে বৌদ্ধধর্ম অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংখ্যা ২০০০ হইতে ৪০০০ এ বর্ধিত হইয়াছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে সমতটে বৌদ্ধধর্মের লোকপ্রীতির আধিক্য বিস্ময়কর। এই সময় হইতে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অপ্রতিহত ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাল নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম অধিকতর ব্যাপৃত হইয়াছিল। প্রথমে হীনযান সম্প্রদায়ের আধিক্য ছিল, কিন্তু ক্রমে মহাযান সম্প্রদায় লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করে। পাল নৃপতিগণও মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

(৬৮)

সপ্তম শতাব্দীর বাঙলাদেশে বৌদ্ধ সংঘারাম ও বিহারসমূহই জ্ঞানান্বেষণের ও বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে বিংশতি সংঘারাম-অধিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সূত্র অনুলিপনে এবং

চিত্রাঙ্কনে তাম্রলিপ্তির বিহারে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউয়েন-সাঙের সময়ে তাম্রলিপ্তিতে মাত্র দশটি সংঘারাম ছিল। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ বিহারসমূহে জ্ঞানার্জনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চীন-পরিব্রাজকের বিবরণীতে কেবল মাত্র পুণ্ড্রবর্ধন এবং কর্ণসুবর্ণের প্রখ্যাত সংঘারামদ্বয় বিদ্যার্জনের ও জ্ঞানান্বেষণের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর সন্নিকটস্থ পো-চি-পো সংঘারামে পূর্ব-ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণিজন সমেত ৭০০ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত মঠধারী বাস করিতেন। বগুড়া জিলার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ে উৎখননের ফলে ভাসুবিহারের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হইয়াছে। এই ভাসুবিহারেই সম্ভবতঃ হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত পো-চি-পো সংঘারাম। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাঙলাদেশে কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর সন্নিকটে অবস্থিত রক্তমৃত্তিকা সংঘারামই জ্ঞানান্বেষণের সর্বাপেক্ষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং বৃহত্তম পীঠস্থান ছিল। প্রশস্ত কক্ষ এবং বুরুজ এই সংঘারামের বৈশিষ্ট্য ছিল। কর্ণসুবর্ণ-মহানগরীর অধিবাসিগণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং জ্ঞানার্জনের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে লিখিত আছে যে, রক্তমৃত্তিকা সংঘারামই পুণ্যশ্লোক এবং প্রখ্যাত সন্ন্যাসিগণের শরণাশ্রয় ছিল। রক্তমৃত্তিকা-সংঘারামে জ্ঞানী গুণী ও বিদ্যার্থিগণ সমবেত হইয়া ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জিলায় রাজবাড়ীডাঙা নামক প্রত্নস্থল উৎখননে বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দির ও সৌধের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত উৎখননে বহু লেখসম্বলিত পোড়ামাটির শীলমোহরও উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, শীলমোহরের লেখ হইতেই উক্ত উৎখনিত প্রত্নস্থলে প্রখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের অবস্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে। এতদ্‌বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষপর্যায়ে রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহার জ্ঞানপীঠের গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাম্রলিপ্তির বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারও বিদ্যার্জনের কেন্দ্র ছিল। ইৎ-সিঙ তাম্রলিপ্তির একটি বিহারে সংস্কৃত এবং শব্দবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তা-চেঙ্-তাঙ্ তাম্রলিপ্তিতে দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়া সংস্কৃত এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

করিয়াছিলেন। তাউ-উন্ তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর জ্ঞানান্বেষণে লিপ্ত ছিলেন। পরে তিনি সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তির পো-লো-হো (বরাহ) বিহারে তা-চেঙ্ তাঙের সহিত ইৎ-সিঙের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তা-চেঙ্-তাঙ্ একখানি সংস্কৃত পুস্তকও চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

(৬৯)

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্তী সময়ে পাল নৃপতিবর্গের সৌজন্যে বিদ্যার্জনের প্রধান পীঠস্থানসমূহ পশ্চিমবঙ্গ হইতে উত্তরবঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পালরাজগণ সোমপুরী মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাহাড়পুর (উত্তর বঙ্গ) উৎখননে উদ্ধৃত পোড়ামাটির সীলমোহরের লেখ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সোমপুরী মহাবিহার দ্বিতীয় পাল-নৃপতি ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত বা পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। পাহাড়পুর উৎখননে অনাবৃত অতিকায় মনোরম সৌধ সম্ভবতঃ সোমপুরী মহাবিহারেরই ধ্বংসাবশেষ। বিক্রমশীলা মহাবিহারও ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৎকালে বিক্রমশীলা মহাবিদ্যানিকেতন বৌদ্ধ সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম-চর্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি কুমিল্লার (পূর্ববঙ্গ) নিকটবর্তী ময়নামতী—লালমাই পর্বতপৃষ্ঠে অনেক বৌদ্ধ সৌধের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু সংখ্যক বৌদ্ধস্মৃতিসম্বলিত প্রত্নস্থলের মধ্যে শালবন বিহার কুটিল মুর এবং চারপত্র মুর উল্লেখযোগ্য। সপ্তম—অষ্টম শতাব্দীর একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ সংঘারাম, বৌদ্ধস্তূপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত অঞ্চলের বৌদ্ধ মহাবিহারেও বিদ্যানিকেতন অধিষ্ঠিত ছিল।

(৭০)

সপ্তম শতাব্দীর বাঙলায় অনেক গুণী ও জ্ঞানীজনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সম্পর্কে সমতটের ব্রাহ্মণবংশজাত শীলভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন-সাঙ শীলভদ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান

করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে শীলভদ্র বিভিন্ন বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ববিষয়ে পারদর্শী এবং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের পরিভ্রমণ সময়ে শীলভদ্র নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চীন-পরিব্রাজক স্বয়ং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। শিষ্য গুরুর পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার বিস্তারিত পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শীলভদ্রের বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্পর্কিত পাণ্ডিত্য অপরিমেয় ছিল। তাঁহার জ্ঞানের প্রতিভা দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত ছিল। একদা এক দক্ষিণভারতীয় উদ্ধত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্মপালের সহিত শাস্ত্র আলোচনার্থে মগধে আগমন করিয়াছিলেন। তৎসময়ে ধর্মপালের ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক শিষ্য শীলভদ্র উক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উদ্ধত পণ্ডিতপ্রবর তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইলেন। রাজা স্বয়ং শীলভদ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া তাহাকে একটি নগরের রাজস্ব অর্পণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত শীলভদ্র রাজার উক্ত অভিলাষ সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দক্ষিণভারত পরিভ্রমণের সময় হিউয়েন-সাঙ সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার অভিলাষ সিংহলীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সিংহলীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছিলেন যে, চীন পরিব্রাজকের উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সিংহল গমন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারাই বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্বসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানে কৃতবিদ্য। কিন্তু পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র আলোচনান্তে হিউয়েন-সাঙ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, শীলভদ্রের নিকট হইতে অর্জিত জ্ঞানের পরিধির বাহিরে সিংহলীয় পণ্ডিতগণ কোন আলোক সম্পাত করিতে সক্ষম হন নাই। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ পাঠে প্রমাণিত হয় যে, তৎসময়ে ভারতবর্ষে বাঙালী পণ্ডিতপ্রবর শীলভদ্রের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। শীলভদ্র বৌদ্ধদর্শন ও শাস্ত্র বিষয়ক অনেক পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বোধিভদ্রও নালন্দা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। পরবর্তী শতাব্দীতেও বাঙলায় অনেক জ্ঞানী ও গুণী জনের আবির্ভাব হইয়াছিল।

(৭১)

কলাকৌশল ও শিল্পক্ষেত্রেও সপ্তম শতাব্দীর বাঙালীর অবদান ন্যূন নহে। শিল্পে, চিত্রাঙ্কনে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে এবং ললিতকলায় উৎকর্ষ সাধন ও কলানিপুণতা উল্লেখনীয়। শশাঙ্কের সমসাময়িক কলাশিল্প নিদর্শনের বাস্তব প্রমাণ বর্তমানে বিরল। কিন্তু প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের প্রত্নস্থল ও অন্যত্র হইতে সংগৃহীত কতিপয় নিদর্শন ষষ্ঠ-অষ্টম শতাব্দীর বাঙলার কলা নিপুণতার ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে বহু হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির, স্তূপ প্রভৃতির বর্ণনা বর্তমান। কতিপয় মন্দির ও বিহার যে শশাঙ্কর সময়ে নির্মিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি ঐ সকল নিদর্শনের বাস্তব সত্তা ও প্রকৃত পরিচয় অবিদিত। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতী এবং অধুনা রাজবাড়ীডাঙা প্রত্নস্থলসমূহে উৎখননের ফলে ইষ্টক নির্মিত মনোরম সৌধের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাস্থানগড়ে হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক বর্ণিত পুণ্ড্রবর্ধনের বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষও অনাবৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত সৌধের মধ্যে কতিপয় বাস্তু-নিদর্শন সম্ভবতঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। ময়নামতী উৎখননেও সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বৃহত্তর বৌদ্ধ বিহার, মঠাঙ্ক প্রভৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধুনা রাজবাড়ীডাঙা প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে একাধিক বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হইয়াছে। এতদ্‌বিষয় পরবর্তী উৎখনন পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। প্রতিটি মন্দির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন এবং চতুষ্কোণে চতুষ্টয় সমচতুষ্কারের ক্ষুদ্রায়তন মন্দির সদৃশ সৌধ, কেন্দ্রস্থ প্রধান মন্দির প্রভৃতির আবিষ্কার উল্লেখ্য। সাদৃশ মন্দিরসমূহের মধ্যে সম্যক অনাবৃত পঞ্চায়তন মন্দিরের আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রস্থ ত্রিরথ মন্দির এবং উহার গর্ভগৃহের নির্মাণ কৌশল প্রশংসনীয়। ইষ্টক নির্মিত বেষ্টনী দেয়ালের বহিরাংশের মনোরম প্রতিমাধার পংক্তি সর্বাধিক আকর্ষণীয়। সৌধ নির্মাণে দেয়ালে কৌণিক, অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও অলংকৃত ইষ্টক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু দেওয়ালসমূহ চুনের পলস্তরা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং প্রতি আধারের স্টাকো-মূর্তি সন্নিবেশিত থাকিত। অপর একটি মন্দিরের চুন পলস্তরা

আবৃত প্রাঙ্গন সিঁড়ি এবং অর্ধ চন্দ্রাকার প্রবেশপথ উল্লেখনীয়। এতাদৃশ সৌধশ্রেণীর মধ্যে অপর একটি মন্দিরের প্রাঙ্গণ, সিঁড়ি এবং পার্শ্বদ্বারা সংলগ্ন গোলাকার স্তূপভিত সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় আবিষ্কার। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক মন্দির ও সৌধশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল সৌধশ্রেণী চুন পলস্তরা দ্বারা আবৃত এবং রক্তমৃত্তিকার রঙদ্বারা প্রলেপিত ছিল। উক্ত সৌধশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য কয়েকটি নিশ্চয়ই শশাঙ্কর সময় নির্মিত বা পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। হর্ম্যাদির শিল্প-কৌশল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বাঙলার স্থপতি বিদ্যার উৎকর্ষের প্রকৃত প্রমাণ।

(৭২)

সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ-সাধন উল্লেখ্য। সংগৃহীত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি শিল্প-নিদর্শন সাধারণতঃ পরবর্তী যুগভুক্ত। রাক্সীডাঙ্গা ও রাজবাড়ীডাঙ্গা উৎখননে অতীব মনোরম ভাস্কর্য নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যে বুদ্ধের স্টাকো মুণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্টাকো মুণ্ডর গঠন প্রণালী ও লাবণ্য হৃদয়গ্রাহী। উক্ত স্টাকো মুণ্ডগুলিকে শিল্পনৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্যের বিচারে সাধারণতঃ চতুর্থ—পঞ্চম—ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে আরোপ করা যায়। গঠন প্রণালীর সূক্ষ্ম বিচারে একটি স্টাকোমুণ্ড প্রাক্‌গুপ্তযুগে আরোপনীয়। অধিকন্তু সৌধশ্রেণীর ভূষণ বিশেষ অলংকৃত স্টাকো পলস্তরার ভগ্নাংশের আবিষ্কারও উল্লেখ্য প্রাক্‌গুপ্ত ও পরবর্তী গুপ্ত যুগের কতিপয় পোড়া মাটির মূর্তি বিশেষ আকর্ষণীয়। চিত্তাকর্ষক তিনটি ব্রঞ্জ মূর্তির (দুইটি বুদ্ধের ও একটি গণেশের) আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। গঠন প্রণালীর বিচারে উক্ত মূর্তিত্রয় অষ্টম শতাব্দীতে আরোপ করা যায়। রাজবাড়ীডাঙ্গা উৎখননে বহু লিপি সম্বলিত পোড়ামাটির শিলমোহর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রত্নবস্তু। শিলমোহরের ধর্মচক্রের পার্শ্বদ্বয়ে হরিণ যুগল, গো ও স্তন্যপায়ী গোবৎস,

বিহংগ, বৃক্ষ প্রভৃতির চমকপ্রদ প্রতিকৃতির রূপায়ণ শিল্প নিপুণতার ও কলা কৌশলের উৎকর্ষের পরিচায়ক। পরবর্তী পরিচ্ছেদে উৎখনন-উদ্ধৃত বাস্তব নিদর্শনরাজির বিস্তারিত আলোচনা হইতে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বাঙলার সংস্কৃতির বিকাশের এবং শিল্পোন্নতির মান নির্ধারণ সম্ভবপর হইবে।

(৭৩)

উপাদান-তথ্যের ও বাস্তব নিদর্শনের স্বল্পতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শশাঙ্কাধীনে বাঙালীর অবদান অনস্বীকার্য। সপ্তম শতাব্দীর বাঙলার রাজনৈতিক সংহতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ধর্মীয় সম্প্রীতি, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে নিপুণতা, ললিতকলার উৎকর্ষ, জ্ঞাননিকেতন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্করই সম্পাদিত কর্ম। শশাঙ্কর মৃত্যুর পরে প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত হইলেও বাঙলার সাংস্কৃতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল নৃপতিবর্গের অভ্যুদয়ে বাঙলায় সমৃদ্ধিযুগের অবতারণা হইয়াছিল। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা হইতে বিমুক্ত হইয়া শশাঙ্ক-সংস্থাপিত ভিত্তির উপরই সুবৃহৎ সাংস্কৃতিক সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাল যুগেই বাঙলার সংস্কৃতি গৌরবের উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়াছিল। কর্ণসুবর্ণাধিপতি মহারাজা শশাঙ্কই বাঙালার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রথম পথিকৃৎ। দেশাত্মবোধ-চেতনা উদ্দীপনে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো সংস্থাপনে এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের যাত্রাপথ প্রশস্তকরণে মহীয়ান কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কই সর্বপ্রথম বাঙালীকে দীক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া বাঙলার তথা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁর চোখে ভারত

অনুবাদক : অনিরুদ্ধ রায়

[লেখাটির রচয়িতা ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ (Francois Martin) তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে একেবারে নীরব। তাঁর নিজের রোজনামচা শুরু হয়েছে ১৬৬৫ সাল থেকে। অন্য সূত্রে জানা যায় যে ফ্রাঁসোয়ার জন্ম হয় প্যারিসে ১৬৩৪ সালে। তাঁর পিতার নাম ছিল জিয় মার্তাঁ (Gilles Martin)। ফ্রাঁসোয়া অল্পবয়স থেকেই প্যারিসের একটি বন্দরের দোকানে ফাইফরমাস খাটার কাজ করতেন। এরকম অবস্থায় বেশ কিছুদিন থাকার পর তিনি বিবাহ করেন ও তারপর তাঁর চাকুরী চলে যায়। অতঃপর কিছুকাল বেকার অবস্থায় কাটিয়ে ১৬৬৪ সালের গ্রীষ্মে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই ও তাঁর মন্ত্রী কোলবেয়ার স্থাপিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে সামান্য কাজে যোগ দেন। স্ত্রী ও দুই পুত্রকে প্যারিসে রেখে ১৬৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রাঁসোয়া কোম্পানীর কাজে মাদাগাস্কার অভিমুখে রওনা হন। ১৬৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মার্চ মার্তাঁ মাদাগাস্কার থেকে সুরাটে আসেন। ১৬৭০ সালে কোম্পানীর কাজে মার্তাঁর অভাবনীয় উন্নতি হয়। অনেকের মতে এই উন্নতির মূলে ছিল মার্তাঁর বহু প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধবদের অকুণ্ঠ সাহায্য। ১৬৭৪ সালে মার্তাঁ ভারতের পূর্ব উপকূলে গঙ্গাবিজিত ভূখণ্ডে পণ্ডিচেরী শহরের প্রতিষ্ঠা করেন ও ঐ শহরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

১৬৬৫ থেকে ১৬৯৫ সাল অবধি লেখা মার্তাঁর রোজনামচা প্যারিস থেকে ১৯৩১ সালে ফরাসী ভাষায় তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৬৯৫ সালের পর আরও কিছুকাল উনি ভারতবর্ষ থেকে ফরাসী সরকারকে নিয়মিত চিঠি ও "মেময়ার" পাঠাতে থাকেন। নীচের লেখাটি ঐ ধরনের একটি "মেময়ার"। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, "মেময়ার" ও চিঠির মধ্যে বেশ তফাৎ আছে। মেময়ারগুলিতে সাধারণতঃ রাজনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির একটা সামগ্রিক ছবি থাকে ; অপরপক্ষে, চিঠিগুলিতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

লেখাটি ছাপা হয় ফরাসী পত্রিকা Revue d'Histoire Coloniale Francaise-এ (আগষ্ট, ১৮৬১)। হাতে লেখা পুঁথিটি রয়েছে প্যারিসের জাতীয় মহাফেজখানায় (Archives Nationales et Coloniales, C²65)।

এখানে হাতে লেখা পুঁথিটি থেকে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল। এই সঙ্গে সামান্য কিছু পাদটীকা যোগ করা হয়েছে।

মার্তাঁর লেখার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে এর লেখা প্রামাণ্য বলে মেনেছেন। এছাড়া, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনও মার্তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করে গিয়েছেন। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক পল কেপলাঁ তাঁর অমর গ্রন্থ La Compagnie Des Indes Orientales (Paris. 1908), প্রধানতঃ মার্তাঁর উপর নির্ভর করেই লিখেছিলেন। আরো অনেক পত্রপত্রিকায় মার্তাঁর লেখার উল্লেখ পাওয়া যায়।]

পণ্ডিচেরী থেকে ফ্রাঁসোয়া মার্তাঁ
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭০০

সুরাট

এখানে বহু ধনবান হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী বাস করে। কেবলমাত্র স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই ঐ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত তা নয়, মোগল দরবারের বহু অভিজাত ব্যক্তি, পদস্থ কর্মচারী ও রাজ্যের অন্যান্য সহরের ব্যবসায়ীরাও এই অঞ্চলে তাদের নিজেদের প্রতিনিধি রাখে। তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নী করে এবং এই সব লোকেরা সে টাকা ব্যবসায়ে খাটায় অথবা নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুদে ধার দেয়।

ইউরোপে রপ্তানী করার মত বিভিন্ন ধরনের পণ্য এখানে প্রচুর পরিমাণে আসে। প্রধান আমদানীর জিনিষগুলি যা আমার চোখে পড়েছে, তা হোলো সোনা, রূপো, সেকা১, চামড়ার মুদ্রা, পারস্যের মুদ্রা 'আবাসি', কখনো ফ্রান্সের একু২। কি পরিমাণ সোনা ও রূপো এখানকার শুল্ক বিভাগের মাধ্যমে আমদানী হয়েছে, সেটা আমার সুরাটে থাকার সময় মনে আছে। টাকার অঙ্ক প্রায় দশ লাখের কাছে পৌঁছেছিল এবং ব্যবসায়ীদের কাছে আরো যা ছিলো তা তখনো কর নির্ণয়ের জন্যে শুল্ক বিভাগের সামনে আনা হয়নি।

সুরাটের বণিকদের গুঁড়ো সোনার ব্যবসা বেশ বড় রকমের।

বাংলা দেশ

সুবৃহৎ বাংলা অঞ্চলে এমন অনেক উৎকৃষ্ট পণ্য আছে যা ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য অংশে রপ্তানী হয়। এখানে জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য আছে এবং তা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ খাজনা ওঠে। তা সত্ত্বেও লোকেরা এখানে সাধারণতঃ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। মুদ্রার বিরলতা চোখে পড়বার মত। এই দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হিসাবে বলা হয় যে মোগল দরবারের বহু প্রধান অভিজাত তাঁদের রাজস্বের অল্প অংশে সৈন্য-মজুত রাজার জন্যে এখানকার রাজস্বের একটি বড় অংশ ব্যয় করতে বাধ্য হন। উক্ত অভিজাত ব্যক্তিরা এই অঞ্চলের খাজনা তুলে নিয়ে যাবার জন্যে নায়েব নিযুক্ত করেন, যারা তাদের প্রভুদের ঐ খাজনা পাঠাবার দায়িত্ব নেয়[৩]। খাজনার উদ্বৃত্ত অংশ যায় মোগল রাজকোষে। রাজ্যের প্রধান কর্মচারীদের রাজধানী থেকে দূরের প্রদেশে জায়গীর দেবার নীতি রাজার কূটবুদ্ধির পরিচয় দেয় কেননা এইভাবে প্রাদেশিক শাসনকর্তার মাধ্যমে কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ[৪]।

বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাইরে চলে যাওয়ার ফলে যে মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে সুদের হার শতকরা বারো টাকা। এ মুল্লুকে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা কম বলে টাকা জোগাড় করা রীতিমত শক্ত ব্যাপার[৫]।

অরাজকতা

এই বিশাল রাজ্যে অনেক রাজা এবং রাজাগুলির বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান এদের রীতিমত শক্তিশালী করে তুলেছে। এরা সহজেই নিজরাজ্যে আত্মগোপন করে এবং সেখান থেকে নানারকম দৌরাত্ম্য করে থাকে—যেমন দলবদ্ধ পথচারীদের উপর আক্রমণ, ব্যবসায়ীদের পণ্য লুণ্ঠন ইত্যাদি। এইসব উপদ্রবকারীরা প্রধান প্রধান শহরের প্রাকার পর্যন্ত হাঙ্গামা করতে দ্বিধা করে না। সুরাটে এর দুটি উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। এখানে

গ্রাতিয়ারাও (এরা দিউ'র চারপাশের হিন্দু) এই শহরের শহরতলীর যে সমস্ত লোক টাকা দিতে অস্বীকার করেছিলো তাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো। সমস্ত সমতলভূমিই এখন ওদের বশ্যতা স্বীকার করে। সব থেকে জনবহুল, বড় ও সম্পদশালী শহরগুলি এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম।

এই অরাজকতা একেবারে আগ্রা অবধি পৌঁছেছে। সেখানে রাজধানীর চারপাশের লোকেরা একবার প্রত্যক্ষ দিবালোকে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো। মোগল সম্রাট তখন শহরে ছিলেন।৭ আক্রমণকারীরা ইচ্ছামত লুটতরাজ করে চলে যায়। কোনো কোনো অঞ্চলের বাসিন্দাদের অথবা বলতে গেলে এই বিশাল দেশের সব লোককেই জাতে চোর বলে মনে হয়। আমি এর বহু উদাহরণ দিতে পারি। যে সব লোকেরা এদেশে নানারকম উপদ্রব করছে তাদের মধ্যে সব থেকে বেশী অরাজকতার সৃষ্টি করেছে মারাঠারা। এরা সব পরলোকগত শিবাজী রাজার প্রজা। গোয়ার চারপাশ ঘিরে এদের দেশ। শোনা যায় যে এরা প্রয়োজন হ'লে ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য হাজির করতে পারে ৮ এবং যাঁরা এদের ভালো করে জানেন তাঁদের মতে এদের সৈন্যবল আরো বহুগুণ বেশী। ওদের সঙ্গে তাতারদের তুলনা করা চলে। এরা মালপত্র ছাড়াই চলাচল করে। অনেক সময় শুধু চাল আর ময়দার মিষ্টি খেয়েই এরা সারাদিন চলতে পারে এবং এ ধরনের কষ্ট স্বীকারে এরা অভ্যস্ত বলেই অতর্কিত আক্রমণে শত্রুকে চমকে দিতে পারে। এরা সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে, যথা বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে, অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়। যারা এদের টাকা দিতে অস্বীকার করে তাদের সর্বস্ব এরা লুট করে নেয় ৯। মোগলরা জিঞ্জি অধিকার করার পর, ১০ এরা শিবাজী রাজার ছেলে রামরাজাকে রাজা হিসাবে স্বীকার করে (রামরাজাই শিবাজীর উত্তরাধিকারী হয়েছেন)। অনেকের ধারণা যে মোগল সম্রাটের মৃত্যুর পর এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মোগল দরবারের প্রধান অভিজাতরা মারাঠাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রামরাজার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে ১১।

আওরংজেবের ধর্ম

প্রতিবেশী রাজ্য বলে ও ধর্মের পার্থক্যহেতু, পারস্য সম্রাট ও মোগল সম্রাট পরস্পরের শত্রু। এরা দুজনেই মহম্মদকে অনুসরণ করে, কিন্তু পরস্পরকে বিদ্রোহী বলে মনে করে।

আওরংজেব বিভিন্ন প্রদেশের সব লোকজনদের উপর (মুসলমান বাদে) জিজিয়া কর[১২] চাপিয়েছেন বলে খাজনা বহু গুণে বেড়ে গিয়েছে। এই বিরাট দেশে বহুলোক বাস করে বলে ঐ করের দরুণ প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে। এদের মধ্যে অবশ্য মুসলমানরা নেহাতই সংখ্যালঘিষ্ঠ...।

মোগলরাজ তার ধর্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং অনেকের ধারণা যে শুধু অকুণ্ঠ ভক্তি ছাড়া এর মধ্যে কোন কূট অভিসন্ধিও আছে। উনি খ্রীষ্টান ও হিন্দুদের শত্রু এবং এই বিশাল রাজ্যের সর্বত্রই হিন্দুদের মন্দিরগুলি ধ্বংস করেছেন।

অর্থের অভাব

আমি আগেই বলেছি যে দেশটি যুদ্ধ ও অন্যান্য অত্যাচারের ফলে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এর ফলে ঐ সম্রাট (আওরংজেব) সময় সময় অর্থের অভাব অনুভব করেন। বিজাপুর যুদ্ধের আরম্ভের সময় আমি সুরাটে ছিলাম[১৩]। এখানকার কোষাগারের একদল কর্মকারকে যুদ্ধশিবিরে পাঠানো হয়েছিল। তারা বলেছে যে সম্রাট ওখানে সৈন্যদের বেতন দেবার মতন যথেষ্ট অর্থ না পেয়ে ওঁর নিজের হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির সাজ থেকে সোনা, রূপো (লাগাম, জিন ইত্যাদি) খুলে নিয়ে সুরাটের কর্মকারদের সাহায্যে মুদ্রা তৈরি করিয়ে নেন। অবশ্য এর পরই উনি দুটি বড় উত্তরাধিকার লাভ করেন—একটি ওঁর নিজের ভগ্নীর[১৪] ও অপরটি গুজরাট ও আমেদাবাদের মুসলমান শাসক আমি-কামের[১৫]। এরা উভয়েই বিপুল সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন।

টীকা

১। সেকীা (Sequin) : ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও ইটালিতে চালু একধরনের সোনার মুদ্রা। ইটালিতে একে Zecchino বলা হোত। ভেনিসে ভের শতকের শেষে তৈরী হয়; আরবদের কাছ থেকে এসেছে বলে অনেকে অনুমান করেন। শেক্সপীয়ারের "Merchant of Venice"এ এই মুদ্রার উল্লেখ আছে।

২। একু (Ecu) : রূপোর প্রাচীন মুদ্রা; ফরাসী ছয় লিভর (livre) থেকে তিন লিভর (livre) পর্যন্ত আছে। প্রবাদ আছে যে সেন্ট লুই প্রথম একু চালু করেন। সাধারণতঃ এক টাকার আনুপাতিক মূল্য ফরাসী দুই থেকে আড়াই লিভর।

৩। জায়গীরদাররা প্রায়ই জায়গীরে থাকতেন না বলে তাঁরা বিভিন্ন রকম বন্দোবস্ত করতেন। এর মধ্যে প্রধান একটা হোলো একজন গোমস্তা বা নায়েব রাখা যারা জায়গীরটা দেখাশোনা করতেন। এদের সাধারণতঃ বলা হোতো "আমিল" বা "শিকদার"। বিশদ বিবরণের জন্য আথার আলির The Mughal Nobility under Aurangzeb, Asia Publishing House, 1966 পৃঃ ৮০ দ্রষ্টব্য।

৪। সম্রাট আওরংজেব চাইতেন যে নিজেদের প্রদেশের কাছাকাছি জায়গীর দেওয়া হোক।

৫। বাংলাদেশে টাকার অভাব সম্পর্কে সমসাময়িক সব ভ্রমণকারীরই মত এক।

৬। "গ্রীক্তিয়ানদের" সাধারণতঃ "খ্রীসিয়া" বলা হয় (যেমন যদুনাথ সরকারের History of Aurangzeb, Calcutta, 1952, 2nd ed., পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১-২ ও তদানীন্তন ভ্রমণকারী আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের A New Account of East Indies, Edinburg, 1727,2 vols., প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য)। "খ্রাসিয়া" শব্দটি "গ্রাস" থেকে এসেছে অর্থাৎ যারা গ্রাসাচ্ছাদন পেতে পারে। কর্ণেল টডএর অনন্য গ্রন্থ Annals and Antiquities of Rajasthan, London, 1914, 2nd ed., 2 vols., এর প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে (পৃঃ ১৯১)। তাঁর মতে 'গ্রাস' বা "গিরাস" হচ্ছে এক ধরনের কর বা টাকা বা জমি দিয়ে দেওয়া হোতো এবং না দিলে বলপ্রয়োগ করা হোত বলে জানা যায়। ইরফান হাবিবের

Agrarian System of Mughal India, Asia Publishing House, 1963, পৃ: ১৪৭এ এর উল্লেখ আছে।

৭। যদুনাথ সরকারের History of Aurangzeb, Calcutta, 1928, 3rd ed., এর তৃতীয় খণ্ড থেকে জানতে পারা যায় যে সম্রাট আওরংজেব ১৬৬১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৬৬৭ সালের অক্টোবর অবধি এবং ১৬৬৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৬৭৩ সালের অক্টোবর অবধি আগ্রায় ছিলেন (পৃ: ৩৯১-৩৯৩)।

৮। কবিন্দ্র পরমানন্দ সভাসদের মতে শিবাজীর ৪৫,০০০ অশ্বারোহী ও দশ হাজার মাওয়ালী পদাতিক সৈন্য ছিল। কিন্তু এ সংখ্যায় সন্দেহ আছে। সব থেকে বেশী সংখ্যক সৈন্য শিবাজীর ছিল ১৬৭৮ সালে পনের হাজার অশ্বারোহী ও বিশ হাজার পদাতিক। আসলে, পদাতিকের সংখ্যা মারাঠা পেশবাদের আমলে আগে বেশী থাকত। যেমন, ১৭০৭ সালে ধনজী যাদবের সৈন্যসংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার পদাতিক ও পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী। পেশবাদের আমল থেকে এটা বদলে যায় (বিশদ বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য : সুরেন্দ্রনাথ সেন : Military System of the Marathas, Calcutta, 1958, পৃ: ৬৩-৬৪।

৯। ইরফান হাবিব এই মতের সমর্থক (দ্রষ্টব্য পৃ: ৩৪৬-৩৭০)। হাবিব এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ভীমসেন বারহানপুরীর "নুস্খাই দিলখুশা" থেকে এর প্রমাণ দিয়েছেন।)

১০। ১৬৯৮ সালে জিঞ্জির সর্বশেষ দুর্গের পতন হয় (দ্রষ্টব্য যদুনাথ সরকার History of Aurangzeb পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৮১-৯০)। মার্তাঁ এখানে তারিখ সম্পর্কে ভুল বলছেন। ১৬৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শম্ভুজী মোগলদের হাতে ধরা পড়েন। প্রায় তখনই (৮ই ফেব্রুয়ারী) রাজারামকে মারাঠা মন্ত্রীরা রায়গড়ে রাজা বলে অভিষিক্ত করেন (যদুনাথ সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৮১)। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে মার্তাঁর রোজনামচায় ১৬৮৯ সালের মার্চ মাসে শম্ভুজীর মৃত্যুর ও ঐ সালের এপ্রিলে মাসে রাজারামের অভিষেকের খবর আছে। (তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৩ ও ৩৯)। শম্ভুজীর বন্দী হবার কারণ সম্পর্কে মার্তাঁ বলেছেন যে তাঁর প্রধান ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেন (পৃ: ৩৩)।

১১। এ মতের সমর্থনে প্রচুর নজীর আছে (যদুনাথ সরকার ছাড়া দ্রষ্টব্য : জিনকিশোর : Tara Bai & Her Times, Lucknow, 1963)।

১২। ১৬৭৯ সালে সম্রাট আওরংজেব জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন। সাধারণ লোকের কাছে এটা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ বলে ইরফান হাবিব মত প্রকাশ করেছেন (পৃঃ ২৪৫-৬) ; যদিও এ সম্পর্কে অন্যমত অনেকে পোষণ করেন।

১৩। ১৬৬৩ সালের বিশে মার্চ রাজা জয়সিংহ বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা শুরু করেন।

১৪। আওরংজেবের বোন জাহানারার মৃত্যু হয় ১৬৮১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর।

১৫। আমিন খান গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন (উল্লেখযোগ্য যে মার্চ। গুজরাটের সঙ্গে আমেদাবাদ যোগ করেছেন)। ওঁর মৃত্যু হয় খুব সম্ভবতঃ ১৬৮২ সালে (দ্রষ্টব্য : যদুনাথ সরকার, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২)।

সংবাদ ও মতামত

ভারত-নেপাল যোগাযোগ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপকরণ ::

১৯৬৪ সালের ২১ এপ্রিল কার্শিয়াং বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক বক্তৃতায় ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার নেপালকে "ভারতীয় সভ্যতার সংগ্রহশালা" রূপে অভিহিত করেছিলেন। নিছক সভ্যতার আদান প্রদানেই নয়, আরো বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ভারত-নেপাল যোগাযোগসূত্র প্রসারিত। উনিশ শতকে সর্বপ্রথম ব্রায়ান হাউটন হজসন (১৮০০-১৮৯৪) নেপালে যে অপরিমেয় ঐতিহাসিক উপকরণ ছড়িয়ে আছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের গোচরে আনেন। হজসনের জীবনীলেখক উইলিয়ম উইলসন হান্টার হজসনের সংগৃহীত তথ্যাদির একটি বিশদ তালিকা প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষ ও বর্তমান শতকের প্রথম দিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বেন্ডাল ও লেভী এই দুই দেশের যোগাযোগ কাহিনীর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি নেপালের ইতিহাস ও ভারত-নেপাল সম্পর্ক বিষয়ে উপকরণাদি তালিকাভুক্ত করে নানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

১। মার্গারেট ফিশার : এ সিলেক্টেড্ বিবলিওগ্রাফি অব সোর্স মেটিরিয়ালস্ ফর নেপাল। বার্কলে, কালিফোর্নিয়া। ১৯৫৮।

২। হিউ উড : নেপাল বিবলিওগ্রাফি। কাঠমাণ্ডু। ১৯৫৯।

৩। ডাঃ আবসাদ হোসেন : নেপাল বিবলিওগ্রাফি—হিস্টোরিক্যাল এণ্ড পলিটিক্যাল। নেপাল সরকার প্রকাশিত। জুলাই, ১৯৬৬।

৪। কামবার তাৎস্থ : নেপাল বিবলিওগ্রাফি। কেন্ব্রিজ, হেফার এণ্ড সন্স্ লিমিটেড। ১৯৫৯।

অধিকন্তু, ভারত-নেপাল যোগাযোগ বা নেপাল ইতিহাসের আধুনিক পর্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত গবেষণা গ্রন্থেও মূল্যবান তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

১। কে. সি. চৌধুরি : এ্যাংলো নেপালিজ রিলেসন্স্। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-১২। ১৯৬০, পৃঃ ১৭৪-৭৮।

২। সতীশ কুমার : রাণা পলিটি ইন্ নেপাল। এশিয়া পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৭। পৃ: ১৭১-৮৩।

৩। রামকান্ত : ইন্ডো-নেপালিজ রিলেশন্‌স্। এস. চাঁদ এণ্ড কোং। ১৯৬৮। পৃ: ৩৭৮-৮৩।

ড: কাঞ্চন বসুমদারের দুটি গবেষণা গ্রন্থ "ইন্ডো-নেপালিজ রিলেশন্‌স্ ১৮৩৭-১৮৭৭" এবং পলিটিক্যাল রিলেশন্‌স্ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল ১৮৭৭-১৯২৩" এখনো অপ্রকাশিত। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও নেপালে প্রাপ্ত যে সমুদয় উপাদানের সাহায্য তিনি নিয়েছেন, ঐ দুটি গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। বি. ডি. সানওয়াল লিখিত "নেপাল এণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" (এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৫। পৃ: ২৫-২৯) গ্রন্থেও উপজীব্য বিষয়ে প্রভূত উপাদানের তালিকা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। নিম্নলিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধেও প্রচুর উপকরণের উল্লেখ আছে।

১। কে. পি. চট্টোপাধ্যায় : এ্যান এসে অন দি হিষ্টরি অব্ নেপার কালচার। দি জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। ১০ নং (১৯২৩) পৃ: ৪৩৫-৫১০।

২। ডি. আর. রেগমী : সোরসেস্ ফর এ হিষ্ট্রি অব নেপাল। (৮৮০-১৬৮০ এ. ডি.)। জার্ণাল অব বিহার এণ্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি। ২৮ (১৯৪২), পৃ: ২৪-৪২।

৩। সি. জে. মরিস্ : এ বিবলিওগ্রাফি অব্ নেপাল। জার্ণাল অব রয়াল সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি। লণ্ডন ১৮ (১৯৩১), পৃ: ৫৭৭-৫৯।

৪। বিবলিওগ্রাফি অব ইণ্ডিয়া, নেপাল, টিবেট, সিকিম এণ্ড ভুটান। দি জার্ণাল অব্ এশিয়ান ষ্টাডিজ্। ৫নং, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

এই সমস্ত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে উল্লিখিত উপকরণগুলি সুবিদিত ও সহজলভ্য। আলোচ্য বিষয়ে নেপালে যে সমস্ত উপকরণ সন্ধান আহৃত হচ্ছে, তার বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নেই। যতটুকু জানা গেছে, তার যৎসামান্য বিবরণ উল্লেখ করছি।

নেপালের রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগার একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কেন্দ্র। অসংখ্য সংস্কৃত, তিব্বতী ও চীনা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি এখানে রক্ষিত আছে। তাছাড়া কাঠমাণ্ডুর বীর পুস্তকালয়ের মূল্যবান সংগ্রহ এখানে স্থানান্তরিত

করা হয়েছে। ৯০০ বছরের পুরাতন যবন জাতক, প্রজ্ঞাপারমিতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, ৭০০ বছরের পুরাতন সুমতিতন্ত্র, ২০০ বছরের পুরাতন বনপর্ব, দ্রোণপর্ব এবং বাংলা অক্ষরে লিখিত নৈষধীয় চরিতম এই অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে। শক সংবৎ ২৩৪ সালে লিচ্ছবিলিপিতে লিখিত স্কন্দ পুরাণের অম্বিকাখণ্ড এখানকার একটি দুর্লভ সংগ্রহ। পৃথিবীর আর কোথাও এই গ্রন্থটির কোন প্রতিলিপি পাওয়া যায় নি। বীর পুস্তকালয় প্রকাশিত দেবতাচিত্র সংগ্রহ, মুদ্রাচিত্র সংগ্রহ, ভক্তপুরশিলালেখ সংগ্রহ, লিচ্ছবিলিপি সংগ্রহ, সেন বংশাবলী, পুরাপত্র সংগ্রহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী শীর্ষক পুরাতত্ত্ব গ্রন্থমালা গবেষকদের কাছে মূল্যবান আকর গ্রন্থ।

নেপাল রাজকীয় প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠান জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় অনেক তথ্য সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করেছে। সূর্য বিক্রম প্রজ্ঞাবলী লিখিত "নেপাল উপত্যকাকো মধ্যকালীন ইতিহাস" এবং জনকলাল শর্মা রচিত "ঢোসখনী সন্ত-পরম্পরা র সাহিত্য" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি উচ্চমানের গবেষণা গ্রন্থরূপে শেষোক্ত পুস্তকটি অক্ষয় চন্দ্র দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত "অব্স্কিওর রিলিজিয়াস কাল্ট্স অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়।

নানা ব্যক্তির কাছে যে অসংখ্য উপাদান ও নানা অঞ্চলে যে সব কাহিনী কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে সেগুলি যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ সুরু করেছে। নেপাল সাংস্কৃতিক পরিষদ প্রকাশিত "ঐতিহাসিক পত্র সংগ্রহ", ইতিহাস সংশোধন মণ্ডল প্রকাশিত পত্রিকা "পুর্णिमा" এবং নেপালী ভাষা প্রকাশিনী সমিতি প্রকাশিত "নেপালী ঐতিহাসিক কথাসংগ্রহ" এবং "ইতিহাস সহায়ক" ইত্যাদি নেপালে ইতিহাস চর্চাক্ষেত্রে অতি মূল্যবান সংকলন।

এককভাবে কয়েকজন মনীষীও উপকরণ সংগ্রহের সাধনায় লিপ্ত আছেন। নেপালের প্রবীণ ঐতিহাসিক বাবুরাম আচার্যের গ্রন্থাদি, প্রবন্ধমালা ও সংগৃহীত উপকরণাদি গবেষকদের কাছে অনন্ত প্রেরণার উৎস। কেশর শমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণার নিজস্ব গ্রন্থাগারে অমূল্য সম্পদ সংরক্ষিত আছে। কিছুদিন আগে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে তাঁর গ্রন্থাগারটি ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে পারে। দার্জিলিঙের মাউণ্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারে কয়েক বছর আগে কেশর শমশের স্বয়ং অনেক দুষ্প্রাপ্য

গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। ইনষ্টীটিউট অব এশিয়ান ষ্টাডিজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডঃ ডি. আর রেগমীর কাছেও বহু মূল্যবান দলিল পত্রাদি আছে। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু ডঃ রেগমী স্বয়ং ঐ সমস্ত দলিল পত্রাদির ভিত্তিতে তাঁর "এনসেন্ট নেপাল" ও "মিডাইভাল নেপাল" পুস্তকে (এই বইগুলির গ্রন্থপঞ্জীও খুবই মূল্যবান) ভারত-নেপাল সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ধারণা ও অনুমানের বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত করেছেন। বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সমষ্টি মোটামুটিভাবে সর্বজন-গ্রাহ্য। কিন্তু এই দুই দেশের পৌরাণিক পর্ব থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক যোগাযোগের প্রকৃত স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "হিষ্টরি অব্ বেঙ্গল" ও ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত "হিষ্ট্রি এণ্ড কালচার অব ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল" পুস্তকের বিভিন্ন খণ্ডে পরিবেশিত কিছু তথ্য ও সিদ্ধান্ত ডঃ রেগমীর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য এবং হয়ত সংশোধ্য। নেপালে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নেবারী কবি শ্রীচিত্তধর হৃদয়ের গৃহে নেবারী ভাষায় লিখিত বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দলিলপত্র, কাব্য, ইতিহাস আমি দেখেছি। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের "কিরাতজন-কৃতি" পুস্তিকায় এই কবির রচনার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। নেবারী কবি সিদ্ধিদাসের (১৮৯৭-১৯২৯) বহু অপ্রকাশিত রচনা তাঁর গৃহে সংরক্ষিত আছে। কবি সিদ্ধিদাস কর্মসূত্রে মাঝে মাঝে কলকাতা ও কাশীতে আসতেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ চিন্তানায়কের রচনা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। সমসাময়িক ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। এই কারণে কবি সিদ্ধিদাসের প্রকাশিত এবং বিশেষতঃ অপ্রকাশিত রচনাগুলির মূল্য ঐতিহাসিক উপকরণ হিসাবে অপরিসীম।

নেপালের রাণাশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এবং উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে রাজা ত্রিভুবনের রাজত্বকাল অবধি নেপালী সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার ইতিহাসে ভারত-নেপাল যোগাযোগের অন্তরঙ্গ পরিচয় সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে ভারত ও নেপালে নানা উপকরণ ছড়িয়ে আছে। এই সব উপকরণের সাহায্যে নেপালের দৃষ্টিকোণ থেকে নেপালী ভাষায় শ্রীশ বাহাদুর দেবকোটা লিখিত দু'খানি গ্রন্থ "নেপালকো রাজনৈতিক দর্পন" এবং "নেপালকো ছাপাখানা র পত্রপত্রিকাকো ইতিহাস" ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে নিঃসন্দেহে আকরগ্রন্থরূপে সমাদৃত হবে। সাম্প্রতিক নেপালের অতীত-চর্চার প্রবণতা লক্ষ্য করে একথা সুনিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে, বর্তমান নেপালের ইতিহাস-বুভুক্ষা রাণা আমলের তুলনায় অনেক বেশী তীব্র।

জহর সেন

পুস্তক পরিচয়

খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস—অমলেন্দু দে। জ্ঞানান্বেষণ, ২।৫৬ আজাদগড়, কলিকাতা-৪০। মূল্য : ৬·০০।

আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়, তাঁদের সমস্যা এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে বহু রচনা প্রকাশিত হলেও খাকসার আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি। শ্রীগোপাল শেঠের "The Khaksar Movement under searchlight and the life story of its leader Allama Mashriqi (1943)" এবং ডাঃ কে এন ইসলামের "আলীর আল্লামা মশরেকী এণ্ড খাকসার আন্দোলন" (১৯৪৪) গ্রন্থ দুইটিতে খাকসারদের সম্বন্ধে বহু তথ্য থাকলেও নতুন তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খাকসারদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের তাগিদে গ্রন্থকার খাকসারদের ইতিহাস লিখেছেন। গ্রন্থটির সাতটি অধ্যায়ে লেখক আল্লামা মশরেকী বা ইনায়াতুল্লা খানের পরিচয়, খাকসার মতবাদ ও আন্দোলনের সূত্রপাত, দল গঠন পদ্ধতি, শিয়া-সুন্নী বিরোধে খাকসারদের ভূমিকা এবং পরিশেষে আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

খাকসার আন্দোলন সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক দোষদুষ্ট বলে একটি ধারণার প্রচলন আছে। গ্রন্থকারের মতে এরকম ধারণা বা অভিযোগ সম্বন্ধে নতুন করে বিচার করা প্রয়োজন। ভারতে পুনরায় ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই যে খাকসারদের উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ঐন্নানিক রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের অধিকার রক্ষার বিষয়েও ইনায়াতুল্লা বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি সহনশীলতার নীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি মুসলিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িকতারও বিরোধিতা করেছিলেন। এই আন্দোলনকে গ্রন্থকার "ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলন" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। খাকসার আন্দোলনের আদর্শ ও কর্মধারার মূল বৈশিষ্ট্য এবং স্ব-বিরোধের রূপটি লেখক সহজ ভাষায় এই গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন।

নিমাই সাধন বসু

Reform And Regeneration In Bengal (1774-1823) Dr. Amitabha Mukherjee, Rabindra Bharati University, Calcutta, 1968 ; Price Rs 16·50 ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের নবজাগরণের বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হলেও এই জাগরণের প্রস্তুতি-পর্ব সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক আলোচনা বিশেষ হয় নি। ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে সেই গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি মোচন করেছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থের ভূমিকায় ইহাকে যথার্থই "a study of the prelude to the Renaissance in Bengal" বলে অভিহিত করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকেই বাংলা দেশে নব জাগরণের সূচনা হয়েছিল। ১৭৭৪ সালে গভর্ণর জেনারেল রূপে ওয়ারেন হেস্টিংসের কোম্পানীর শাসন ভার গ্রহণ করার পর থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত—এই পঞ্চাশ বৎসরে নানাবিধ শাসন বিধি প্রবর্তন ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে—বিদ্যা-চর্চা, ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ—যে বিপুল পরিবর্তন এবং মানুষের মনে যে সংস্কারমুক্তি সাধিত হয়েছিল গ্রন্থকার তা অতি নিপুণভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ধর্মনেতা হিসাবে রামমোহনের অবদান এবং হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত তর্ক সাপেক্ষ হলেও ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। ধৈর্য্য ও নিষ্ঠাসহকারে বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা ও গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত ঐতিহাসিক উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যরাশির সাহায্যে লেখা এই গ্রন্থখানি বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে ইতিহাসের ছাত্র ছাড়াও সাধারণ পাঠকদের নিকট সমাদৃত বলে আমাদের বিশ্বাস।

জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুরের গণবিক্ষোভ (১৭৬০-১৮০৫)—ডঃ বিনোদ শঙ্কর দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর। মূল্য তিন টাকা। পৃঃ ৫৪।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ১৭৬০ হইতে ১৮০৫ পর্যন্ত গণবিক্ষোভগুলির কারণ এবং পটভূমিকা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি পরিচালিত

ইতিহাস বিষয়ক বাংলা পত্রিকা

ইতিহাস

সংশোধিত নিয়মাবলী

১। ১৩৭৬ সাল হইতে ইতিহাস তিনবার বৈশাখ-শ্রাবণ, ভাদ্র-অগ্রহায়ন ও ও পৌষ-চৈত্র সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে।

২। ইতিহাসের প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩·০০ টাকা, বাৎসরিক চাঁদা ৮·০০ টাকা। যদিও পত্রিকার প্রতি সংখ্যা সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং রাখিয়া পাঠানো হয়, তবু যাহা রেজেষ্ট্রী-ডাকে কাগজ পাইতে ইচ্ছুক তাদের রেজেষ্টি ডাকমাশুল বাবদ অতিরিক্ত ২·০০ টাকা, মোট ১০·০০ পাঠাইতে অনুরোধ করি।

বার্ষিক চাঁদার হার (সাধারণ)-৮·০০ টাকা

বার্ষিক চাঁদার হার (রেজেষ্টি ডাক যোগে) ১০·০০ টাকা

৩। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাহকগণ পূর্বাহ্নে জানাইলে পত্রিকাটি ইতিহাস পত্রিকার কার্যালয় কাশিমবাজার হাউস, ৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে যাহাতে সংগ্রহ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। পত্রিকা ভি: পিতে পাঠানো সম্ভব নয়।

৫। বার্ষিক চাঁদা (বৈশাখ—চৈত্র) ৮·০০ টাকা (রেজেষ্টি ডাকে প্রেরণের নির্দেশ থাকিলে ১০·০০ টাকা) মনি অর্ডার যোগে ইতিহাস কার্যালয় অথবা ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির দপ্তরে প্রেরিতব্য।

৬। দাসগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং (পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২) এর কাছে ইতিহাস নগদ মূল্যে পাওয়া যায়।

৭। প্রবন্ধাদি অথবা সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, 'ইতিহাস' ৫/৩ ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ৩৩।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯—ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

With best compliments of :

★

UNITED MERCANTILE CORPORATION

GENERAL MERCHANT

&

COMMISSION AGENT.

55, BIPLABI RASH BEHARI BASU ROAD
(CANNING STREET)
'F' BLOCK-SECOND FLOOR
C A L C U T T A - 1.

PHONE 34-2750

With best compliments of :

Calcutta Historical Society Publications

33/1, AMHARST STREET.
CACUTTA-9

AUTO-PRINT
the house
for
quality printing
to your choice

AUTO-PRINT & PUBLICITY HOUSE
অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
The Leading House for Printing at your service
for 25 years.

49, BALDEOPARA ROAD,
(MANICKTOLA)
CALCUTTA-6.

PHONE 35-2959

With Compliments of

EAST INDIA RUBBER WORKS (P) LTD.

161, CHITTARANJAN AVENUE

CALCUTTA-7

DAS GUPTA & CO.

PRIVATE LIMITED

BOOKSELLERS SINCE 1886

54 3, College Street, Calcutta-12

PHONE :- 343875 & 346547

STUDENTS BOOK SUPPLY

15, COLLEGE SQUARE,

CALCUTTA-12

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত সংশোধিত সিলেবাস No. Sy 11-PN/2/08 dated 9.5.08 অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি আপনার মনোনয়ন প্রার্থী।

1. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ১ম ভাগ—ডঃ এন, এন, রায় for VI
2. সাধারণ বিজ্ঞান পরিচয় ৪র্থ ভাগ—ডঃ এন, এন, রায় for IX-X
3. ভারত কথা—অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় for H.S. and or S.F.
4. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X or XI. (H.S.)
5. প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ for IX, X(S.F.)
6. বাণিজ্যিক অর্থশাস্ত্র ও পৌর বিজ্ঞান—ডঃ এস, ঘোষ অধ্যাপক ভবেশ ভট্টাচার্য্য (H.S. Com.)
7. অর্থনৈতিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী H.S.Com.)
8. বাণিজ্যিক ভূগোলের ভূমিকা—অধ্যাপক ডি, এন, মুখার্জী (S.F. Com)

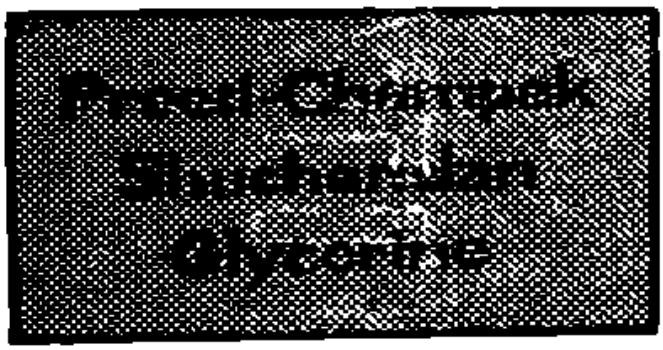

BANGALUXMI

TOILET SOAPS

PILOT NEEM

YIELD BOTH PLEASURE AND PROFIT

It pays to use Bangaluxmi products

BANGALUXMI SOAP WORKS (P) LTD.

7, Chowringhee Road, Calcutta - 13

With best compliments of :

MAHARAJA COSSIMBAZAR CHINA CLAY MINES P. LTD

138, CANNING STREET,
CALCUTTA-1

Post Box No. 353

Gram Coscolmin Phone 22-4418

With Compliments from :

UNIVERSAL EMPORIUM

KHAGOL - PATNA

(LEADING DEPARTMENTAL STORE)

ইতিহাস

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

১।	সংবাদ পত্রের নাম	ইতিহাস
২।	যে ভাষায় প্রকাশিত হইবে	বাংলা
৩।	প্রকাশের সময় ব্যবধান	ত্রৈমাসিক, বৈশাখ হইতে আরম্ভ।
৪।	খুচরা বিক্রয় মূল্য	প্রতি সংখ্যা ২·০০
৫।	প্রকাশক	শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী (ভারতীয়)। ঠিকানা : ৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯
৬।	প্রকাশকের স্থান	৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯
৭।	মুদ্রক	শ্রীনলিন রায় (ভারতীয়)
৮।	যে প্রেসে ছাপা হইবে তাহার নাম ঠিকানা	অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস ৪৯ বলদেও পাড়া রোড। কলিকাতা-৬
৯।	সম্পাদক	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (ভারতীয়) ৪ বিপিন পাল রোড কলিকাতা-২৬। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ (ভারতীয়) ৮৫ এ, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। অমলেশ ত্রিপাঠী (ভারতীয়) গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেট। গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
১০।	সত্বাধিকারী	ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি ঠিকানা : ৩৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট. কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

স্বা: শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী
প্রকাশক, ইতিহাস ত্রৈমাসিক পত্রিকা।